সাকিন সুতানুটি

বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়

সাহিত্যশ্রী
৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা—৯

Sakin Sutanuti

Baidyanath Mukhopadhyay

প্রথম প্রকাশ
শ্রাবণ ১৩৭২

প্রকাশক :
শ্রীতপনকুমার ঘোষ
সাহিত্যশ্রী
৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা—৭০০ ০০৯

প্রচ্ছদ :
শ্রীআলোকময়

মুদ্রাকর :
শ্রীগোবিন্দলাল চৌধুরী
স্যাঙ্গুইন প্রিন্টার্স
২, ছিদাম মুদী লেন
কলিকাতা—৭০০ ০০৬

॥ এক ॥

ভাদুরে মেঘে আকাশটা এলোমেলো হয়ে গেল। হয়ে গেল যেন কেলে হাঁড়ি।

অথচ একটু আগেও আকাশটা এমন ছিল না। ঝাঁ ঝাঁ রোদ্দুরে চারদিক ঝলমল করছিল। আলো ঝলসাচ্ছিলো ঢেউয়ের মাথায় মাথায়। আরও পাঁচ দশটা সালতি নৌকো নদীর বুকে ভেসে বেড়াচ্ছিল ইতিউতি। ঢেউয়ের মাথায় মাথায় নেচে বেড়াচ্ছিল। নদীতীরের গ্রামগুলি সরে সরে যাচ্ছিল।

হঠাৎ পরিবেশটা বদলে গেল। ভেতরের ওদিক থেকে ধোঁয়ার মতন কালো কালো মিশমিশে একরাশ মেঘ এসে গোটা আকাশটাকে এলোমেলো করে দিলে। ফৌজদারের সেপাইয়ের মতন ঘিরে ফেলল চারদিক। এখন আর একফালি আশমানও চোখে পড়ে না। এক রত্তি আলো না। গোটা আশমানটা এখন যেন হাঁড়ির মতন। নিচে জলের অবস্থাটা পাল্লা দিয়ে আরও খারাপ হয়ে গেল। আলো ঝলসানো গিরিমাটি জলটা হয়ে দাঁড়িয়েছে কষকষে কালো। শুধু কি তাই! কেমন যেন ফোঁস্ ফোঁস্ করছে। মা মনসার ফণা চারদিকে নেচে নেচে বেড়াচ্ছে। বাতাস উঠেছে শোঁ শোঁ। হাজার হাজার ফণা সালতিটাকে মাথায় তুলে নাচতে আরম্ভ করেছে। কেবল নাচ? ছোবলও আছে। সালতি টলোমলো। স্রোতের টানে অসহায়ভাবে নাচতে নাচতে ভেসে চলেছে সালতি নৌকো। কোথায় যেতে কোথায় যায়? টালমাটাল অবস্থা। দাঁড় ধরে বসেছিল যে ছোড়াটা তার মুখ শুকিয়ে আমসি। গলুয়ের ভেতর জল উঠছে ছলাৎ ছলাৎ করে। বড় মিঞা হালটা শক্ত হাতে ধরে বাঁ হাতের আঙুল দিয়ে দাড়ি চুলকোতে চুলকোতে বলল: 'ভয় পাবেন না, কর্তারা। ভয়ের কিছু নাই। নাও আমাদের বশেই আছে। এক ঘড়ির ভেতরেই আমরা সাকিনে পেঁছে যাব। কর্তারা ঘাবড়াবেন না।'

বড় মিঞার এই অভয়বাণী সত্ত্বেও কর্তারা ভয়ে কেমন যেন সিঁটকে থাকল। ছোট্ট নৌকো, সাল্তি। লোকজন বেশি নয়। তা বাচ্চা কাচ্চা ধরলে সওয়ার জনা পনেরো হবে। এর ভেতর আবার আধাআধি মেয়ে। তিনটে শিশু। শিশুরা মাকে আঁকড়ে ধরে বসে আছে। সালতি টাল খাচ্ছে। একটু আগেই দূরে দূরে যেসব নৌকো দেখা যাচ্ছিল, তাদের আর দেখা যায় না। সেগুলো ডুবে গেল কিনা, কে জানে? গায়ে কাঁটা দিচ্ছে!

মেয়েদের ভেতর সব থেকে ছোট হল, বাতাসি। বছর বারোর বেশি বয়স নয়। তা সেকালে বারো বছর বয়সটাও তেমন হেলাফেলার নয়। ষোড়শীর মতন ষোলো আনা না হোক, দ্বাদশীও সেকালে যুবতী। তবে নওল যুবতী। বুকে ঠেলে উঠ্ছে এক জোড়া নওল শ্রীফল।

একটা ডুরে কাপড় পরেছিল বাতাসি। আঁটসাঁট করে কাপড়-পরা। আঁচলটা বুকের ওপর দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে এসে কোমরে আঁটা। বাতাসির মাথায় এক ঢল চুল। সে চুল এলো খোঁপা করে তুলে বাঁধা। বাতাসির চোখ দুটি কালো। ডাগর। রং তেমন ফর্সা নয়। মাজা মাজা। তা রং যেমন-তেমন হোক-না কেন, বাতাসিকে কোনও রকমেই অ-সুন্দরী বলা যায় না। তার সারা শরীর জুড়ে আশ্চর্য এক আলগা শ্রী। সতেজ লাউ ডগার মত তার দেহে জড়িয়ে রয়েছে সবুজ সজীবতা। ঢলঢল লাবণি। এ লাবণি আঠার মতন। পুরুষের চোখ এ আঠায় চট্ করে আটকে যায়।

শোঁ শোঁ বাতাস। নৌকো টলোমলো। এখনই আকাশটা বৃষ্টিতে ফেটে পড়বে। যাত্রীদের চোখে মুখে উদ্‌বেগের ছায়া। এ সালতিখান যদি নদীর বুকে পালট খায়, তাহলে কারোরই রেহাই মিলবে না। ডুবে মরতে হবে। ফাগুলালও খুব উদ্‌বিগ্ন। বাতাসির মুখের দিকে সে একবার তাকিয়ে দেখল। বাতাসি কতখানি ভয় পেয়েছে, তা ওর মুখ দেখে জরিপ করতে চেষ্টা করল। ফাগুলাল ঠিক ঠাহর করতে পারল না।

বাতাসি কিন্তু বেবাক উদাসীন। তার মন উচাটন। তার চোখ-মুখের কোথাও কোনও আতঙ্কের ছায়া নেই। সে যেন আলাদা কিছু ভাবছে। সেই আলাদা ভাবনায় বিভোর। এলানো খোঁপা থেকে খানিকটা চুল বেরিয়ে এসেছে। হাওয়ায় উড়ছে। উড়তে উড়তে থেকে থেকে চোখ দুটিকে ঢেকে ফেলছে। তবু বাতাসির খেয়াল নেই।

'তোমার কি খুব ভয় করছে বাতাসি?' কানের কাছে মুখটা এনে ফিস্‌ফিস্ করে বলল ফাগুলাল।

সাজোয়ান ফাগুলাল যেন সব ভয় কাটিয়ে দিতে পারে, এরকম একটা ভারিক্কিভাব।

বাত্যসি রা কাড়ল না। কেননা, সে রা কাড়ার প্রয়োজন বোধ করল না।

'যদি এ নাওটা পালট্ খায়? তোমার ভয় করছে না, বাতাসি?'

বাতাসি নীরব। ফাগুলালের কোনও কথা শুনতে পেয়েছে বলে মনে হল না।

'তোমার সাঁতার জানা আছে বাতাসি? কী! তাও জান না? তা সাঁতার জেনেই বা এ মাঝগঙ্গায় কি বাঁচা যাবে? এ দরিয়া কায়োকে রেহাই দেবে না।'

বাতাসি একটি কথাও বলল না। সে উদাস। উচাটন। তার মন পড়ে আছে পিছনের দিকে। সামনেটা অনিশ্চিত। এক ঝোঁকের মাথায় সে অনিশ্চিত সামনের দিকে এগিয়ে এসেছে। এটাই তার বিধিলিপি। নইলে এতক্ষণ পিছনের গ্রাম পীরপুকুরেই তার থাকার কথা। বাতাসির পিসির বাড়ি পীরপুকুরে। পীরপুকুরেই তার জন্ম। পীরপুকুরেই সে মানুষ। আর পীরপুকুরকেই সে কিনা চিরকালের জন্য ছেড়ে চলে এল! শেষ রাত্তিরে সে বেরিয়ে এসেছে। চারদিক তখন ঘুট্‌ঘুটে অন্ধকার। তিথিটা বোধহয় অমাবস্যা। আজ নিশিপালন। বাতের যন্ত্রণায় পিসি ছট্‌ফট্ করছে। অমাবস্যা-পূর্ণিমায় বাতের ব্যথা বাড়ে। বাতাসিকে এ সময় ঘর-সংসারের কাজ করতে হয়। গরম তেল দিয়ে মালিশ করতে হয় পিসির

হাড়-পাঁজরের গাঁট। কয়েক বছর ধরেই এ অবস্থা চলছে। তা শেষরাতে বেরিয়ে আসবার সময় পিসি একবার পাশ ফিরেছিল। বেতো শরীরে পাশ ফিরতেও কষ্ট। আর কষ্ট হলেই পিসি ডাকে, 'কই, কোথায় গেলিরে বাতাসি! এদিক পানে একটু আয় না মা!' শেষ রাতে পাশ ফিরতে ফিরতেও পিসি ডেকেছিল, 'অ বাতাসি! একটু দেখ্ না মা!' বাতাসি ততক্ষণে ঘরে শেকল তুলে দিয়ে বেরিয়ে এসেছে বাইরে! বাইরে ফাগুলাল অপেক্ষা করছে। ফাগুলালের দিকেই টানটা সে সময় প্রবল। পিসিকে ফেলে রেখে চলে এল সে ফাগুলালের সঙ্গে। বোসবাগানে চাঁপাগাছের মাথায় একটি তারা তখন কেবল জ্বলজ্বল্ করছে। গাছপালার সোঁদা সোঁদা গন্ধ! রাস্তায় প্যাঁচপেচে কাদা। এই রকম রাস্তায় হাঁটতে হয়েছে পাকা দু'ক্রোশ পথ। পথেতেই আঁধার কেটেছে, পথেই সূর্যোদয় হয়েছে।

বাতাসি বামুনের ঘরের মেয়ে। শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ। কুলীন। বাপু কুলদাপ্রসাদ ছিলেন চালচুলোহীন। বাউণ্ডুলে। তবে তাঁর পেটে কিছু সংস্কৃত বিদ্যে ছিল, ঐ পর্যন্ত। যে বিদ্যেয় ধান থেকে চাল হয়, সে বিদ্যে কুলদাপ্রসাদের জানা ছিল না। আমলটাও ছিল বড় গোলমেলে। চারদিকে অরাজক অবস্থা। কেউ কোথাও থিতু হতে পারছিল না। মুঘল-পাঠানের গোলমাল ত ছিলই। তা ছাড়া ছিল ফৌজদার, ডিহিদারদের অত্যাচার। সম্পন্ন গৃহস্থরাও উচ্ছন্নে যাচ্ছিল, তা তুচ্ছ টুলোপণ্ডিত কুলদা-প্রসাদ! তার পৈতৃক ভদ্রাসন যেটুকু ছিল, তা কবে যে টুপ্ করে পাকা ফলের মতন খসে পড়ে গেল, তা দীর্ঘদিন তিনি টের পাননি। কুলদাপ্রসাদ একবার তীর্থ করতে বেরিয়েছিলেন। গিয়েছিলেন কাশী। কাশীতে কিছুদিন থেকে চলে গেলেন বৃন্দাবন-মথুরা। আরও পরে ঘুরতে ঘুরতে তিনি এলেন গয়াধামে। সেখানে পিতৃপুরুষদের পিণ্ডদান করে ফিরে এলেন নিজের ভিটেতে। তা এই তীর্থে তীর্থে ঘুরতে তাঁর সময় লেগে গিয়েছিল মাস ছয়। এই মাস ছয়ের পরে ভিটের ফিরে এসে দেখলেন, তাঁর পৈতৃক ভদ্রাসনটি কে যেন চষে দিয়ে এক শৌখিন বাগানে রূপান্তরিত করতে চলেছে। ভিটেয় মেলা গাছ। কুলদাপ্রদাদের ছিল মাটির ঘর। সামনে একটি দাওয়া। সেই দাওয়ার কোনও চিহ্ন দেখা গেল না।

পুকুরের ওপারে কুলদাপ্রসাদের এক ঘর যজমান ছিল। সেখানে গিয়ে উঠলেন কুলদাপ্রসাদ। যজমানরা তো তাঁকে দেখে অবাক! বাড়ির কর্তা তাঁকে বসবার পিঁড়ি এগিয়ে দিল। এগিয়ে দিল পা-ধোয়ার জল। সবিনয়ে বলল: 'ঠাকুর, এতদিন কোথায় ছিলেন?'

'তীর্থে তীর্থে ঘুরেছি। দেখেছি বিস্তর। তা বাবা, আমার ভিটেটা অমন বেদখল হয়ে গেল কেন?'

'আজ্ঞে, কেন এমন হল, তাতো বলতে পারব না। তবে জায়গাটার দখল নিয়েছে যে, সে হল, আক্রাম খাঁ।'

'আক্রাম খাঁ!' নামটা শুনে কুলদাপ্রসাদ বিরক্ত হলেন। কপাল কুঞ্চিত হল। বললেন, 'সেই অনজ্ঞানের এ কাজ? ঐ অনজ্ঞানকে আমি সমুচিত শিক্ষা দেব।'

'না, ঠাকুর, আপনি ও কাজ করতে যাবেন না! লোকটা ভারি দাঙ্গাবাজ! ডিহিদারের সঙ্গে তলে তলে তার যোগ-সাজশ রয়েছে, আপনি আপনার ভিটের আশা ত্যাগ করুন। আপনি ব্রাহ্মণ ঠাকুর। ভালো মানুষ। আপনি কি ওদের সঙ্গে দাঙ্গা করতে পারবেন ?'

'তা পারব না। তবে আমি যে নপুংসক নই, তা তাকে জানিয়ে দেওয়া দরকার। যবনের স্পর্শ করা ভূমি আমি আর গ্রহণ করব না। তবে ঐ অনস্তানটা জানবে, কার জমি সে স্পর্শ করেছে। নইলে আমরা মানুষ কিসের ?'

কুলদাপ্রসাদ তাঁর জন্মভূমির গ্রামে তার পরের দিনটাও ছিলেন। তৃতীয় দিন প্রত্যুষে গ্রাম ত্যাগ করে রাজধানী ঢাকা শহরের দিকে পা বাড়ালেন। রাজমহলের পর ঢাকাই তখন সুবে বাংলার রাজধানী। শায়েস্তা খাঁ তখন বাংলার নবাব। ১৬৬৩ সনে মীরজুমলার মৃত্যুর পরে বাদশা ঔরঙ্গজেবের নির্দেশে খাঁ সাহেব আসেন এই বাংলার সুবাদার হয়ে। সম্পর্কে ইনি ছিলেন বাদশার মামা। তা মামা হোন, আর যাই হোন, খাঁ সাহেবের তখন বয়স হয়েছে। বুড়ো হলেও বিলাসিতা কমেনি। সরকারি রাজস্ব বাদশাহী তোশাখানায় পাঠিয়ে দেবার পর বাকি টাকা তিনি নিজের জন্য রাখতেন। আর ওই টাকায় তিনি বিলাসিতা করতেন। কিংবদন্তী আছে, শায়েস্তা খাঁয়ের এভাবে নিজস্ব দৈনিক রোজগার ছিল লাখ টাকার মতো। এই লাখ টাকার ভেতর তাঁর দৈনিক খরচও ছিল পঞ্চাশ হাজার। তা পঞ্চাশ হাজারের মতন খরচ করেও আরও পঞ্চাশ হাজার থেকে যেত তাঁর সঞ্চয়ের জন্য। এ অঞ্চলে সাধারণ মানুষেরা ছিলেন কপর্দকশূন্য, অতিশয় গরিব। চাল-ডাল কেনারও পয়সা তাঁদের জুটত না। অথচ বাজারে আট মন চাল মিলত তখন এক টাকায়। কিন্তু এই একটা টাকা জোগাড় করতেই লোকের কালঘাম ছুটে যেত। সেই ভয়ঙ্কর সর্বনাশা দিনে কুলদাপ্রসাদ এসে হাজির হলেন ঢাকায়। শায়েস্তা খাঁর সেরেস্তায়।

নবাব শায়েস্তা খাঁ নিজে যেমন বিলাসী ছিলেন, তাঁর দরবারি লোকেরাও ছিলেন তেমনি। সুতরাং তাঁদেরও টাকার খাঁক্‌তি ছিল। ভেট, নজরানা ইত্যাদি পাওনার মাধ্যমে তাঁরা দু'হাতে টাকা লুঠতেন। এঁরা প্রত্যেকেই আবার ছিলেন উচ্চাকাঙ্ক্ষী। অতি তুচ্ছ কর্মচারীও ফৌজদার আর বড় বড় দরবারি আমির হবার স্বপ্ন দেখতেন। এ জন্য এঁরা জ্যোতিষে বিশ্বাসী ছিলেন। কুলদাপ্রসাদ বেশ ভালরকম জ্যোতিষ জানতেন। তিনি জ্যোতিষ বিদ্যার জোরে শায়েস্তা খাঁর সেরেস্তার এক বিশেষ ইমানদার খাঁ সাহেবের শ্রদ্ধাভাজন হয়েছিলেন।

কুলদাপ্রসাদ সেই ইমানদার খাঁ সাহেবের কাছে গিয়ে তাঁর ফরিয়াদ পেশ করলেন। সব শুনে খাঁ সাহেব বললেন, 'আপনি দেশে ফিরে যান। নবাবের সেরেস্তা থেকে ফতোয়া যাবে। ইবলিস্ আক্রাম তার উপযুক্ত শাস্তি পাবে। ব্যাটা ছুছুন্দরকে কেউ বাঁচাতে পারবে না। ফতোয়া গেলেই মরবে।'

তা সত্যিসত্যিই ফতোয়া গেল। কুলদাপ্রসাদও সেদিন সন্ধ্যায় গিয়ে তাঁর পৈতৃক গ্রামে পেঁাচেছেন। গ্রামে ঢোকার মুখে দেখলেন, আতঙ্কিত কিছু কিছু লোক রাতের

আঁধারে এদিক ওদিক দৌড়োদৌড়ি করছে। আরেকটু এগিয়ে যা দেখলেন, তা আরও ভয়ঙ্কর। পুকুরধারে তাঁর যজমানের বাড়িটা আগুনে দাঁড়িয়ে দাউ দাউ করে জ্বলছে। অন্ধকারের বুকে সে এক বীভৎস দৃশ্য। লোকজন দৌড়ুচ্ছে। তাদের একজনকে দাঁড় করিয়ে কুলদাপ্রসাদ জিজ্ঞাসা করলেন, 'এমন সর্বনাশ কী করে হল ভাই? কী করে ঐ বাড়িতে আগুন লাগল?'

'কী করে আবার লাগবে?' লোকটা খেঁকিয়ে উঠল, 'আক্রাম খাঁয়ের ছেলেরা এ আগুন লাগিয়ে দিয়েছে।'

'আগুন লাগিয়ে দিয়েছে? তা বাড়িঅলার অপরাধ?'

'আক্রাম খাঁকে নবাবের ফৌজ এসে বেঁধে নিয়ে গেছে। তাই।'

'তা আক্রামকে বাঁধার সঙ্গে ঐ নিরীহ বাড়িঅলার কী সম্পর্ক?'

'আছে বৈকি, আছে!' অন্ধকারেও বোঝা গেল যে লোকটা, রহস্যময় হাসি হাসল। তারপর ফিস্‌ফিস্ করে বলল: 'ঠাকুর কুলদাপ্রসাদ্ এর ভেতর আছেন। আর তিনি দিন কুড়ি আগে ওঁর বাড়িতে এসে উঠেছিলেন কিনা, তাই। আক্রামের ছেলেদের ধারণা, ঠাকুরকে উনি 'কুপরামর্শ' দিয়েছেন।'

লোকটি অন্ধকারের ভেতর হাওয়া হয়ে গেল। কুলদাপ্রসাদ বুঝতে পারলেন যে, আক্রামকে জব্দ করতে গিয়ে তিনি নিজের যজমানের ভয়ঙ্কর ক্ষতি করে ফেলেছেন। তাছাড়া কুলদাপ্রসাদের একান্ত গোপনীয় ফরিয়াদের কথা আক্রামের দল জানল কী করে? কুলদাপ্রসাদ অনুমান করলেন, এ বিষয়ে তাঁর যজমান হয়ত কোনও দুর্বল মুহূর্তে কোনও খল লোককে কুলদাপ্রসাদের কথা বলেছে, আর তার ফলেই বিপত্তি।

কুলদাপ্রসাদ সে রাতে আর গ্রামে প্রবেশ করলেন না। তিনি আবার তীর্থ পরিক্রমায় বের হলেন। বছর আট-দশ ধরে নানান তীর্থে তীর্থে তিনি পর্যটন করলেন। কখওন তিনি কাশীতে বাস করেন, কখনও হরিদ্বারে। পাকাপাকিভাবে কোনও বিশেষ জায়গায় থাকতে তাঁর মন কোন সময়েই প্রস্তুত ছিল না। তিনি থাকলেনও না। সেবার পৌষ সংক্রান্তিতে তিনি এলেন সাগরে স্নান করতে। স্নান সেরে ফেরার পথে তিনি শ্রীক্ষেত্র যাবার মতলব করেছিলেন। পথে হঠাৎ তাঁর পীরপুকুরের ভগিনীর কথা মনে পড়ে গেল। তা খুঁজে খুঁজে তিনি সঠিক ঠিকানায় এসে পেঁৗছে গেলেন।

'আরে, এটা দামিনী বামনির বাড়ি না?'

দামিনী নিঃসন্তান। বিধবা। সকালবেলায় উঠে উঠোনে গোবর-ছড়া দিচ্ছিল। এই সকালে কোন্ সাধু-সন্ন্যাসী এল আবার তার বাড়িতে। তাড়াতাড়ি মাথার ঘোমটাটা টেনে দিয়ে দামিনী একটু পাশে সরে গেল।

'তুই আমাকে চিনতে পারলি না, দামিনী? আমি তোর দাদা কুলদাপ্রসাদ।'

দামিনী গোবরের কলসি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলল; 'ছি ছি, কী লজ্জা! নিজের দাদাকে চিনতে পারলাম না!'

কুলদাপ্রসাদ সেই যে পীরপুকুরে এলেন, আর এ গ্রাম ছেড়ে বেরোতে পারলেন না। দামিনীই তাকে আটকে দিল। কেবল আটকাল না, দাদাকে সংসারী করল দামিনী।

নোলক-পরা ছোট্ট একটি মেয়েকে নিয়ে এল 'বৌ-ঠান' করে। দামিনী দাদাকে বলল : 'তোমার কোন অভাব হবে না, দাদা! আমার সামান্য যা জমি-জিরেৎ আছে, তাতে সারা বছরের খোরাক হয়ে যাবে। যজমান আছে দু'চারঘর, শিষ্য আছে; প্রজা-বিলি জমিতে বার্ষিক আদায় আছে। সংসারে অভাব হবে না দাদা। দিব্যি সংসার চলে যাবে।'

কুলদাপ্রসাদ বুদ্ধিমান লোক। নিজের কুষ্ঠি গণনা করে দেখলেন যে, এ সংসার-যাত্রা তাঁর বিধি নির্দিষ্ট। তাঁকে এই অবস্থা স্বীকার করতেই হবে। সুতরাং তিনি দামিনীর দেওয়া সব বিধানই মেনে নিলেন। ভবঘুরে কুলদাপ্রসাদ পীরপুকুরে এসে গৃহী হলেন। অচিরে তাঁর একটি কন্যাও জন্মগ্রহণ করল। সেই কন্যাই হল বাতাসি। দামিনীর নিঃসঙ্গতা কেটে গিয়ে এবার সংসারটি বেশ জমজমাট হয়ে উঠল। কুলদাপ্রসাদও থিতু হলেন। কিন্তু বিধাতার নির্দেশ ছিল বুঝি আলাদা ধরনের।

বাতাসির জন্মের পর বছর খানেক গড়াতে-না-গড়াতে হঠাৎ সন্ন্যাস রোগে কুলদাপ্রসাদ দেহ রাখলেন। দামিনীর সাজানো সংসারে সেই হল প্রথম অশনিপাত। বজ্রাঘাতে মানুষ মারা যায়, দামিনীরও মারা যাবার কথা। কিন্তু সে মরল না। মরার বাড়া হয়ে সে বেঁচে রইল। অবলম্বন হিসেবে রইল বৌঠান, আর ছোট্ট ভাই-ঝি বাতাসি। কিন্তু বিধাতাপুরুষের বোধহয় এটুকুও সহ্য হল না। বছর দুয়েক পরে ওলাউঠা রোগে বৌঠানও চলে গেল। দামিনী দারুভূত হয়ে গেল। বেচারি কাঁদতে ভুলে গেল। বিধাতাপুরুষ যে তাকে এভাবে বিপর্যস্ত করবেন, তা সে স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি। মাঝে মাঝে সে নিজের চুল ছিঁড়ে বিধাতাপুরুষকে গালাগাল দিতে থাকল। আর এই বিপর্যয়ের জন্য সব রাগটা গিয়ে পড়ল শিশু বাতাসির ওপর। দামিনীর মনে হল, এই আবাগীর জন্যেই তার দাদা মরেছেন। কুলদাপ্রসাদের বয়স হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু মরার বয়স হয়নি। আর সন্ন্যাসরোগ এমনই রোগ, যে কবিরাজ ডাকবার ফুরসত পর্যন্ত পাওয়া গেল না। চিকিৎসা করা গেল না। দামিনী এ আক্ষেপ রাখবে কোথায়?

দামিনী দীর্ঘদিন একা একা কাটিয়েছে। স্বামীর মৃত্যুর শোক সে ভুলে গিয়েছিল। কিন্তু দাদা কুলদাপ্রসাদের মৃত্যুর শোক তাকে পাগল করে দিল। বাতাসিকে তাই তার বাপ-খাগী মা-খাগী মেয়ে বলে মনে হল। সুতরাং শিশু বাতাসিকে যথাসম্ভব সে অবহেলা করে দূরে সরিয়ে রাখল। দামিনীর বাড়ির পাশে ছিল গয়লাদের বাড়ি। গয়লাদের বৌরা এসে টেনে কোলে তুলে নিল বাতাসিকে। নতুবা বাতাসি বাঁচত না।

ছোট্ট বাতাসি দেখতে দেখতে বছর ছয়েক হল। ছ'বছরের বাতাসিকে দেখে দামিনীর মনে আবার নতুন ভাবের উদয় হল। মনে হল, দাদার এই মেয়েকে তার অবহেলা করা কি ঠিক হচ্ছে? দাদা বেঁচে থাকলে দামিনীর এই পাগলামি কি তিনি কখনও সহ্য করতেন? আহা, দাদার এই স্মৃতিটুকুকে সে কতই না অবহেলা করেছে! কতই না দূরে ঠেলে দিয়েছে! এইভাবে দামিনীর মনে অনুশোচনা হতে থাকল। অনুশোচনার আবেগে বাতাসিকে বুকে জড়িয়ে ধরে নতুন করে আবার ভালবাসতে আরম্ভ করল দামিনী। এই

আবেগের আতিশয্য বেশ কিছুদিন চলল। তারপর হঠাৎ তার ভালবাসা নতুন বাঁক নিল। দামিনীর মনে হল, এই বাতাসিও বাঁচবে না। বাঁচতে পারে না। তাকে কিছুদিনের জন্য ছলনায় ভুলিয়ে সুযোগ বুঝে এক সময় কেটে পড়বে। বিধাতা-পুরুষের এইরকমই হয়ত বিধান। ভাবতে ভাবতে দামিনী আবার পাগল হল।

বিধাতার ইচ্ছেটাকে বানচাল করে দেবার জন্য পাগলিনী দামিনী একটা নতুন মতলব ভাঁজল। সে শুনেছিল মেয়েদের গোত্রান্তর করে দিতে পারলে তার কোষ্ঠী বদলে যায়। সুতরাং ছ' বছরের মেয়েটার একটা বিয়ে দিয়ে দিলে কেমন হয়! দামিনীর মাথায় এই ভাবনাটা দিন কয়েক পোকার মতন কুরে কুরে খেতে থাকল। আর মনে মনে উপযুক্ত একটা পাত্র খোঁজাও শুরু হয়ে গেল।

সে বছর পীরপুকুর গ্রামে বিন্টু অধিকারীর দল এসেছিল কৃষ্ণযাত্রার পালা গান নিয়ে। এক তরুণ যুবা কৃষ্ণের ভূমিকায় গান গেয়ে দর্শকদের কাছ থেকে দু'হাতে প্রশংসা কুড়োতে থাকল। বাড়ি বাড়ি তার নিমন্ত্রণ জুটতে দেরি হয় না। দামিনীও একদিন কৃষ্ণ ঠাকুরকে নিমন্ত্রণ করল।

'কী নাম তোমার বাছা?'

কৃষ্ণঠাকুর সপ্রতিভ। নিঃসংকোচে জবাব দিল, 'আমার নাম সনাতন ঘোষাল।'

'বাঃ খাসা নাম তো তোমার! তা বাড়িতে তোমার কে কে আছে সনাতন?'

'কেউ তেমন নেই পিসিমা! নইলে কি যাত্রা দলে ঘুরে বেড়াই?'

'তা বটে!' দামিনী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলেন, 'তা তোমার পৈতৃক ভিটেটা কোথায়? কোন্ দেশে?'

'আঁজ্ঞে, আমাদের পৈতৃক ভদ্রাসন আছে হাতিদহে। গ্রাম সুতানুটি থেকে উত্তরদিকে খাড়া তিন ক্রোশ।'

'সেখানে কে থাকেন?'

'আমার বৈমাত্র ভায়েরা। তবে বর্ষার সময়ে যখন যাত্রা বন্ধ থাকে, তখন আমিও থাকি। একটা আলাদা কুটুরি আমার জন্য রাখা আছে।'

'তোমরা কুলীন?'

'কুলীন, তবে ভঙ্গ।'

'সংসার করেছ?

'আঁজ্ঞে না।'

'একটাও না?'

'না।'

'করনি কেন?'

'আঁজ্ঞে তেমন কোনও অবকাশ হয়নি। তাছাড়া আমার এমন কোন অভিভাবক নেই, যিনি দাঁড়িয়ে থেকে আমার বিবাহ দেন।'

'তা বাছা, আমি যদি তোমার বিবাহ দিই।'

'আপনি ?'—সনাতন ঘোষাল সবিস্ময়ে তাকাল দামিনী ঠাকরুণের মুখের দিকে। 'আপনার কি কোন মেয়ে আছে ?'

'না বাছা, আমার মেয়ে নেই। তবে যে আছে, সে আমার মেয়ের মতনই। ভাইঝি। ওর বিশ্বসংসারে কেউ নেই। ঠিক তোমারই মতন। তবে আমার সম্পত্তির সবটাই ও পাবে। তুমি যদি বাছা এখানে এসে থাক, তোমার অন্নকষ্ট হবে না। সুখে-স্বচ্ছন্দেই সংসার চলবে। যাত্রায় গান গাওয়ার দরকার হবে না।'

'আচ্ছা, ভেবে দেখি।'

'হ্যাঁ, ভাল করে ভেবে দেখো। আজ গোটা দিন আর রাতটা ভেবে আমাকে কাল সকালে জানালেই হবে। আমি তাহলে দিন দশেক পরেই এ বিয়ে লাগিয়ে দিতে পারি। আমার কোন অসুবিধা নেই।'

সেদিন এ পর্যন্তই কথা হয়েছিল। সনাতন ঘোষাল যাত্রার দলে গান গেয়ে বেড়ায়। ঘুরে ঘুরে সে ক্লান্ত। কেবল ক্লান্তি নয়। বিরক্তিও তার অপরিসীম। জল-জঙ্গলের রাস্তা। হেঁটে হেঁটে গ্রামে গ্রামে ঘুরতে হয়। কোনদিন কোথায় থাকা, তার কোনও পাকা ব্যবস্থা নেই। খাবার ব্যাপারও খুব গোলমেলে। কখনও কখনও গব্যঘৃত সংযোগে দাদখানি বা গোবিন্দভোগ চালের অন্ন জোটে, জোটে দই চিড়ে সন্দেশ, আবার কখনও একেবারেই অষ্টরম্ভা। ফক্কিকার। দু'ঘটি জল খেয়ে পেটে কিল মেরে পড়ে থাকা! এ ধরনের ভাসমান অনিশ্চিত জীবন কে পছন্দ করে? সনাতন ঘোষালও পছন্দ করে না। কিন্তু সনাতন নিরুপায়। এই জীবনটাকে সে বিধি-নির্দিষ্ট বলেই মেনে নিয়েছে। কিন্তু আজ হঠাৎ দামিনী ঠাকরুণের প্রস্তাব তাকে ভাবিয়ে তুলল। গ্রাম পীরপুকুরের পরিবেশটা তার খারাপ লাগল না। পরের দিন প্রত্যুষেই সে স্থির করল, দামিনী ঠাকরুণের প্রস্তাব সে মেনে নেবে। এদিকে দামিনী ঠকরুণও ভেতরে ভেতরে চর লাগালেন সনাতন ঘোষালের সম্পর্কে আরও তথ্য জানবার জন্য। বিষ্টু অধিকারীর কাছেই জানা গেল, সনাতন ঘোষাল যথার্থই ভাল ব্রাহ্মণ ঘরের ছেলে। নেশা ভাঙ করে না। তবে তার আর বিবাহ আছে কিনা, সে কথা সঠিকভাবে কেউ বলতে পারল না। বলতে পারল না, গ্রাম হাতিদহের সঠিক অবস্থিতি। সুতানুটি গ্রামের খবর সকলেই জানে, কিন্তু হাতিদহের রাস্তা কারও জানা নেই।

অতীতের এই দিনগুলির স্মৃতি বালিকা বাতাসির কাছে একেবারেই ঝাপসা। খুবই অস্পষ্ট। পীরপুকুরে ঘোষ-বোদের কোলে কোলে ঘুরে বেড়াত। তার ছোটখাট দু'একটি ছবি ভেসে ওঠে। কিন্তু বিষ্ণু অধিকারীর যাত্রাদলের কথা একেবারেই মনে নেই। তবে তার বিয়ের দিনের স্মৃতিটা কিছু মনে পড়ে। তাকে ভারি সুন্দর ঝকঝকে একটা শাড়ি পরানো হয়েছিল। তার সারা মুখে এঁকে দেওয়া হয়েছিল চন্দনের নকসা। গলায় পরিয়ে দেওয়া হয়েছিল মোটা ফুলের মালা। আর তাকে কারা যেন কোলে তুলে ধরে বলেছিল, 'অ বাতাসি, হ্যা দে তোর বর।'

তা বর দেখেছিল বাতাসি। ভারি মিষ্টি একটা মুখ। তবে মুখটা তেমন কচি

নয়, কেমন যেন ভাসানো। নাকটা বেজায় খাড়া। ভুরু দুটি জোড়া, আর মোটা। চুলের খুব বাহার আছে। কালো চুলে কালো দিঘির ঢেউ।

'কী বাতাসি তোর বর পছন্দ হয়েছে ?'

বাতাসি লজ্জায় কুঁকড়ে গিয়েছিল। ঐ ছোট্ট মেয়ে, তার তেমন কোনও অনুভূতিই ছিল না। কিন্তু কী আশ্চর্যভাবেই না সে কথায় লজ্জায় শিহরিত হয়েছিল। বাতাসির নতুন বর সনাতন ঘোষাল বিয়ের পরেও সাত আটদিন ছিল দামিনী ঠাকরুণের বাড়িতে। বাতাসি এই সাত আটদিন যথাসম্ভব দূরে দূরেই থেকেছিল। বরের সম্পর্কে তার কৌতূহল ছিল, কিন্তু অপরিসীম লজ্জা তাকে বরের কাছে পৌঁছুতে দেয়নি। বর একবার দূর থেকে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'কী ছোট বউ, তোমার সঙ্গে আমার ভাব হবে তো ?'

বাতাসি কোনও রা কাড়েনি। কেবল ঘন ঘন ঘাড় দুলিয়ে জানিয়েছিল, 'না।'

বর বলেছিল, 'তুমি অমার রাই কিশোরী।' এরপর রাইকে নিয়ে সে গুনগুন করে গান ধরেছিল। বাতাসি দৌড়ে চলে গিয়েছিল ঘোষেদের বাড়ি। মনে হয়েছিল বরটা ভারি অসভ্য। বড় পাকা।

সাত-আটদিন থাকবার পর সেই যে বাতাসির বর চলে গিয়েছিল, আর ফেরেনি। অথচ সে দামিনী ঠাকরুণকে বলে গিয়েছিল যে, সে এবারের বর্ষায় এসে পীরপুকুরে থাকবে। পীরপুকুর জায়গাটা তার খুব পছন্দ হয়েছিল। পছন্দ হয়েছিল গাঁয়ের লোকজনও। গাঁয়ের চণ্ডীমণ্ডপে গিয়ে সে বুড়োদের সঙ্গে দু'সন্ধে দাবা খেলে এসেছিল। ও পাড়ার বোস-গিন্নি বলে গিয়েছিল, 'অ দামিনী বামনি, তোমার ভাইঝি জামাই বেশ খাসা হয়েছে বাপু। আমাদের বড় কত্তা ছেলেটির খুব প্রশংসা করছিল। বেশ সপ্রতিভ। বেশ চটপটে। তা বাতাসির এখন কপাল। ঠাকুর কুলদাপ্রসাদের মেয়ে ত, খারাপই বা হবে কেন ?'

সব ঠিকই ছিল। কোথাও এক রত্তি গোল ছিল না। তবু গোল বেধে গেল। সেই যে, বাতাসির বর সনাতন ঘোষাল পীরপুকুর থেকে হাওয়া হয়ে গেল, আর সে কখনও পীরপুকুরে ফিরল না। বর্ষা এল। বর্ষা চলেও গেল। দামিনী ঠাকরুণের চিত্ত অধীর প্রতীক্ষায় দিন গণনা করতে থাকল, কিন্তু প্রতীক্ষার আর শেষ হল না। বর্ষার পরে দু-একজনকে দামিনী খরচ-পত্তর দিয়ে গ্রাম হাতিদহে খোঁজ করতে পাঠালেন। তারা বিনি-সংবাদে ফিরে এল। তারা জানাল গ্রাম হাতিদহ বলে কোনও জায়গা ভু-ভারতে নেই। কেউ কেউ বলল, 'হয়ত থাকতে পারে। কিন্তু গ্রাম সুতানুটির পরে বড় জঙ্গল। বাঘ-ভালুকের বড় উৎপাত। যেতে ভরসা হয় না।' সেবার শীতে নতুন একটা যাত্রার দল এল। কানু অধিকারীর দল। তারা বিদ্যাসুন্দরের পালাগান গাইল। কানু অধিকারীর কাছে দামিনীর লোক গেল। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল, তিনি বিষ্ণু অধিকারী দলের কোনও খবর রাখেন কিনা! কানু থেলো হুঁকোয় মৌজ করে তামাক খাচ্ছিলেন। তিনি হুঁকোতে বার কয়েক ঘন ঘন টান দিয়ে নাক-মুখ দিয়ে একরাশ ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললেন, 'বিষ্ণু অধিকারী! সব ব্যাটাই আজকাল অধিকারী সেজে যাত্রার দল

খুলেছে। অধিকারী আর অধিকারীর ছয়লাপ! তা কত আর চিনব বাপু! আমি বিষ্ণু অধিকারী বলে কাউকে চিনি না। আর তার কোনও ও-নামে দল ছিল বলেও শুনিনি।'

কেবল একটা বর্ষা নয়, বর্ষার পর বর্ষা কাটতে থাকল সনাতন ঘোষাল আর এল না। ভাবনায়-চিন্তায় দামিনী রাতারাতি বুড়ী হয়ে গেলেন। চুল হয়ে গেল সাদা। শনের নুড়ি। চামড়া শিথিল হয়ে গেল। চোখে-মুখে দেখা দিল অজস্র কুঞ্চিত রেখা। গাঁটে গাঁটে ধরল বাত। বুঝতে বাকি রইল না যে, তিনি সাংঘাতিকভাবে প্রতারিত হয়েছেন। ক্ষোভ ও দুঃখের সঙ্গে দামীনি বামনির মনে দেখা দিল ক্রোধ। সেই ক্রোধে তিনি বাতাসির মাথার সিঁদুর ঘষে তুলে দিলেন। হুঙ্কার ছেড়ে বলতে থাকলেন, 'আমি আবার তোর বিয়ে দেব। শাস্তর-ফাস্তর আমি মানি না।' তবে হুংকর ছাড়লেও বিয়ে তিনি দিলেন না। উলটে তিনি বাতাসিকে দেখে 'হতভাগী', 'পোড়া কপালি' বলে গাল পাড়তে থাকলেন। আর বাতের যন্ত্রণায় 'উহু উহু' করতে থাকলেন।

বিষয়টি গুরুতরভাবে দামিনী পিসিকে নাড়া দিলেও, বাতাসিকে নাড়া দিল না তেমনভাবে। কেননা, বিয়ের ব্যাপার-স্যাপার বোঝার বয়স তখনও তার হয়নি। ঘোষেদের আরও পাঁচটা ছেলেমেয়ের সঙ্গে সে আগের মতই নেচে-কুঁদে বেড়াতে থাকল। বাবা কুলদাপ্রসাদের কোনও স্মৃতিই তার মনে নেই। কেবল পিসিমার মুখের ঐ গাল-গল্প ছাড়া। মাকেও তার মনে পড়ে না। সম্বলের মধ্যে তার চোখের সামনে দপ্ দপ্ জ্বলছে পিসি দামিনী ঠাকরুণ। পিসির দাপটে বাতাসি অস্থির, মাঝে মাঝে রাগও হয়। রাগ করে ঘোষেদের ঢেঁকিশালায় গিয়ে বসে থাকে। নয়ত বোসেদের দিঘির ধারে নির্জন বাগানে। তা রাগ করলেও বাতাসির রাগ টেঁকে না। তার রাগ-অভিমান বাতাসে ভেসে যায়। বাতাসি এখন বুঝেছে যে, পিসি তাকে ভালবাসে। আর ভালবাসে বলেই পিসি অমন দুর্মুখ।

বছর খানেক হল, বাতাসি যৌবনের আঁচ পেয়েছে। ভেতর থেকে হঠাৎ হঠাৎ খুশি কুড়কুড়ি কেটে ওঠে। তার সাজতে ইচ্ছে করে। মাঝে মাঝে সে চোখে কাজল পরেছে। ঘোষেদের নতুন বিয়ে হওয়া একটি মেয়ে তাকে তার বরের গল্প বলেছে। বর নাকি খুব আদর করে। চুমু খায়। ঐ গল্প শোনার পর থেকে বাতাসির মাঝে মাঝেই বরের কথা মনে পড়ে। সেই জোড়া ঘন ভুরু। খাড়াই নাক। আর মিষ্টি দুটি চোখ।

বোসেদের বাগানে কাঁঠালি-চাঁপা ফুল খুঁজতে গিয়েছিল বাতাসি। এই ফুলটা তার ভারি ভাল লাগে। সেদিন বাতাসি একসঙ্গে তিন তিনটে ফুল পেয়েছিল। দুটো সে চুলে গুঁজেছিল, আর একটি ছিল হাতে। দীঘির ধারের বাগান-পথ দিয়ে সে একা একা আসছিল। নির্জন পথ। গাছের মাথায় এক দঙ্গল টিয়াপাখি ট্যা-ট্যা করে ঝগড়া করছিল।

সেই নির্জন পথে হঠাৎ ফাগুলালের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। বোসেদের ছোট তরফের ছোট কর্তার ছেলে। ফাগুলালের গায়ে ফতুয়ার মতো একটি জামা। মাথায়

পাগড়ি। হাতে ছোট একটা পুঁটলি। পায়ে নাগরা জুতো। তাকে দেখে বাতাসি থমকে দাঁড়াল।

'কী, বাতাসি না কি রে?' ফাগুলালের চোখ আটকে গেল সদ্যযুবতী বাতাসির বাড়ন্ত চেহারায়।

'হ্যাঁ, আমি ফাগুদাদা। তা তুমি কোথা থেকে আসছ?'

'আমি আসছি সুতানুটি থেকে। সেখানেই আজকাল থাকি। বাবুদের কুঠিতে কাজ করি।'

'সুতানুটি?'

'হ্যাঁ। তা তুই সেখানে কখনও গেছিস না কি?'

'না। তা তুমি হাতিদহ চেন।'

'হাতিদহ?' ফাগুলাল একটু ভাবতে চেষ্টা করল। 'না বাপু, হাতিদহ তো চিনি না। তবে শেয়ালদহ চিনি। হয়ত ওরই কাছাকাছি কোনও জায়গায় হবে। ওদিকে অনেকগুলো দহ আছে বলে শুনেছি।'

বাতাসি কেমন যেন ব্যাকুলতা বোধ করল নিজের মধ্যে। বলল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওখানেই কোথাও হবে, তা জায়গাটা তুমি একটু দেখো তো খোঁজ করে।'

'কেন, সেখানে তোর দরকার আছে নাকি? যাবি বুঝি?'

'তা যেতে পারি। তবে তার আগে তুমি জায়গাটা বের করো ত!'

'আচ্ছা, জায়গাটা আমি খুঁজে বের করব। পরের বার এসে তোকে খবর দেব।'

'হ্যাঁ, খবরটা তুমি আমাকে দিও। পিসিমাকে যেন কিছু বোলো না।'

ফাগুলাল একটু রহস্যের গন্ধ পেল। বলল 'না।'

কালো মেঘে আকাশ ঢাকা। বাতাসে শোঁ শোঁ শব্দ। ছোট্ট সালতিটা ভীষণ দুলছে। এখনই বুঝি পালটে খায়। যাত্রীদের চোখে-মুখে উদ্বেগ। বড় মিঞা হালটা খুবই শক্ত করে ধরে আছে। এ অবস্থায় যাত্রীদের নড়াচড়া নিষেধ। ভয় পেয়ে লাফালাফি করলে, নৌকো টাল খায়। বাতাসির একগুচ্ছ চুল হাওয়ায় উড়ছে। চোখ দুটি উদাস। ফাগুলাল বাতাসিকে ইদানিং সমীহ করে। প্রথম দেখায় যে তুই-তোকারি করেছিল, তা করে না। তুমি বলে। ফাগুলাল এই মুহূর্তে বাতাসির মুখের দিকে তাকিয়ে কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করতে থাকল। এই অস্বস্তি কাটানোর জন্যই বলল: 'বাতাসি, তোমার কি ভয় করছে?'

'না।'

'তবে কথা বলছ না কেন?'

'এমনি। ভাল লাগছে না।'

'তোমার কি ফিরে যেতে ইচ্ছে করছে? পীরপুকুরে পিসির কাছে ফিরে যাবে?'

নৌকোটা টাল খেল। বাতাসি বড় বড় বিস্ফারিত দুটি চোখে ফাগুলালের দিকে

তাকিয়ে বলল : 'ফিরে যাব বলে আমি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসিনি। আমি পিসির কাছে জীবনে ফিরব না। তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক চুকে-বুকে গেছে।'

ফাগুলালের মুখে এই মুহূর্তে আর কোনও কথা যোগাল না। সুতরাং সে নীরব হয়ে রইল।

বেশিদিন নয়, মাস দুয়েক পরে বোস বাগানের নির্জন রাস্তায় আবার ফাগুলালের সঙ্গে দেখা হয়েছিল বাতাসির। হঠাৎ দেখা। অপ্রত্যাশিত। ইতিমধ্যে ফাগুলালের সুতানুটি আসা একবার হয়ে গিয়েছে। অন্ততঃ সেই রকমই সে কবুল করেছিল বাতাসির কাছে। সময়টা ছিল বিকেল। পিসির জন্য বাতের মালিশ আনতে বাতাসি গিয়েছিল সন কবিরাজের কাছে। হাতে মালিশের কৌটো। শাড়ির আঁচলটা হাওয়ায় উড়ছে তার। অপরাহ্ণের হলুদ আলোয় ভারি মিষ্টি লাগছিল বাতাসিকে। তাকে দেখে ফাগুলালের চোখ দুটো দপ্‌দপিয়ে উঠল। তার শিরায় শিরায় কামনার আগুন জ্বলে উঠল।

'তুমি আবার কবে এলে ফাগুদা? কই, আমাকে যে হাতিদহের খোঁজ দেবে বলেছিলে? সে খোঁজ কই?'

ফাগুলাল রহস্যভরা হাসি হাসল। বলল, 'হাতিদহের কথা বলব বলেই তো তোমাকে খুঁজছি, বাতাসি। তা তুমি বলেছিলে যে, পিসিমা যেন জানতে না পারে, তাই হাতিদহের কথা জানাতে তোমাদের বাড়ি যাইনি। নইলে বাড়ি গিয়ে বলে আসতাম। দু'দিন হল সুতানুটি থেকে এসেছি। আর আসা তক্ তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি।' ফাগুলালের কথায় সেদিন আবেগ ছিল। আর ফাগুলাল এদিন থেকেই বাতাসিকে 'তুমি' বলে একান্ত নিজের লোকের মতো সম্বোধন করতে আরম্ভ করল।

'তা আমাকে আর খুঁজতে হবে না। কোন খবর থাকলে চট্‌পট্ বলে ফেল। হাতিদহের খোঁজ পেলে?'

'তা একরকম পেয়েছি। কেবল নামটা পেয়েছি। কিন্তু কীভাবে সেখানে পৌঁছতে হয়, তা জানি না।'

বাতাসির চোখ দুটো অপরাহ্ণের হলুদ আলোয় ভারি সুন্দর দেখাল। কী সহজ সরল মেয়ে বাতাসি। চোখের পাতা দুটি কী নিবিড় কালো! ফাগুলাল বেচারি তড়িদাহত হল। সেই তড়িদাহত ফাগুলালকে ঠেসে ধরল বাতাসি। হঠাৎ ফাগুলালের একটি হাত ব্যাকুল হয়ে ধরে বলল : 'সত্যি পেয়েছো? আমাকে সেখানে তুমি নিয়ে যাবে?'

'সেখানে? মানে সেই হাতিদহে? সেখানে তুমি যাবে?'

'হ্যাঁ, যাব। সেখানে যে ঘোষালদের বাড়ি আছে না? সেইখানে।'

'তারা তোমার কে হয়? আত্মীয়?'

বাতাসি হঠাৎ যেন খানিকটা সংবিত ফিরে পেল। ফাগুলালের হাতটা ছেড়ে দিল। উড়ন্ত আঁচলটা ভাল করে গায়ে জড়িয়ে নিয়ে বলল : 'না, কেউ হয় না। আত্মীয়-টাত্মীয় নয়। তবু তাদের বাড়ি আমি যাব। ফাগুদা, তুমি এবার যাবার পথটা ঠিক করে এস। আমি তোমার সঙ্গেই সেখানে যেতে চাই।'

ফাগুলাল এরকম একটা মওকা খুঁজছিল। ভুলিয়ে-ভালিয়ে সুতানুটিতে বাতাসিকে একবার নিয়ে যেতে পারলে, তার ইচ্ছেটা ষোলো আনা পূর্ণ হয়। সুতানুটিতে সমাজ নেই। জাতপাতের কোনও ঝামেলা নেই। উট্কো আর হাটুরে লোকে গ্রামটা ভরতি। তেমন করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কেউ কারও খবর রাখে না। এক জনের বউ আরেক জনের সঙ্গে রাত কাটায়। তা নিয়ে কারও কোনও মাথাব্যথা নেই। কেউ কখনও কৈফিয়ত করে না। ঐ সুতানুটিতে যেভাবেই হোক বাতাসিকে নিয়ে যেতেই হবে। তারপর যা করবার, তা ফাগুলাল করবে। অমন একটা ডবকা ছুঁড়িকে সে কোনও রকমেই হাতছাড়া করতে পারে না। আজ এই বাতাসিই কিনা তার সঙ্গে সুতানুটি যাবার প্রস্তাব দিচ্ছে? ভেতরে ভেতরে ফাগুলাল রসিয়ে উঠল। তবে বাইরে তার একটুও জানান দিল না। বরং সে প্রায় নিরুত্তাপ নীরস গলায় বলল: 'তা আমি তোমাকে নিয়ে যেতে পারি বাতাসি। দরকার হলে কালই। কিন্তু তুমি যে এইভাবে যাবে, তাতে দামিনী পিসি রাগ করবেন না তো!'

'রাগ করলে, করুক। তাতে আমি কী করব?' ঈষৎ উত্তেজিতভাবে বলল বাতাসি। তবে পরমুহূর্তেই সে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল: 'না, পিসির কাছে আমি কিছু কবুল করব না। পিসিকে না-জানিয়ে আমি গোপনে তোমার সঙ্গে চলে যাব। তুমি একটা গো-যান ঠিক করে রেখ, সেই গো-যানে করে আমরা বেতরে ঘাটে চলে যাব। সেখান থেকে নৌকো করে সুতানুটি।'

বাতাসির এই প্রস্তাব আর পরিকল্পনা শুনে আনন্দে ফাগুলালের ভেতরটা গরো গরো করে উঠল। তবে সঙ্গে সঙ্গে সে এও বুঝল যে, বাতাসি যা কিছু বলে চলেছে, তা সরলভাবেই বলে চলেছে। ফাগুলালের ভেতরে ক্ষুধার্ত পশুটাকে সে দেখতে পায়নি। পেলে সে এমন প্রস্তাব কখনও দিত না। বাতাসির মনে এখন দুরন্ত জেদ চেপেছে। সে যেভাবেই হোক হাতিদহে পৌঁছুতে চায়। ফাগুলাল তার বাহন মাত্র। তা ফাগুলাল রাজি। তার ভেতরের বাঘটা যথাসময়ে বাতাসিকে গিলে খাবে। তবে তা চট্ করে নয়। সুযোগ বুঝে। সুতরাং ফাগুলাল আরও কয়েক মাস ধরে বাতাসির মন নিয়ে পরীক্ষা করল।

নৌকোটা আরেকবার টাল খেল। বেশ খানিকটা জল এক ঝলকেই উঠে এল গলুয়ের কাছে। এমনভাবে নৌকোটা কাত হয়ে গেল যে, নৌ-যাত্রীরা সকলেই বিশ্রীভাবে হেলে গিয়ে এ ওর ঘাড়ে পড়ল। একজন যাত্রী হঠাৎ চিৎকার করে বলে উঠল, 'ঐরে, আবার এসে গেছে। ফিরিঙ্গিরা বোধহয় সুতানুটিতেই যাবে। নিজেদের আস্তানায়।'

বাতাসি জানে না, ফিরিঙ্গি কাদের বলে। লোকটির উত্তেজনা দেখে কিঞ্চিৎ সে কৌতুহলী হল। লোকটির দৃষ্টি যে দিকে প্রসারিত ছিল, সেদিকে চোখ তুলে তাকাল বাতাসি। দেখল সত্যিই এক মজাদার দৃশ্য। পীরপুকুরের জমিদার যেভাবে বের হন, ঠিক সেই রকম কাণ্ড গঙ্গার বুকের ওপর হয়ে চলেছে। বাড়ির থেকেও বড় বিরাট একখানা জাহাজ পত্পত্ করে নিশান উড়িয়ে ধীরে ধীরে গ্রাম সুতানুটির দিকে

এগিয়ে চলেছে। তার আগে-পিছে ছোট ছোট অনেকগুলি নৌকো আর বজরা। ছিপ আর ভাউলিয়া।

বাতাসি অবাক করে ফ্যাল ফ্যাল করে ওদের দিকে তাকিয়ে রইল। দেখল জাহাজের বাইরের পাটাতনে দাঁড়িয়ে এক লালমুখো যবন ফিরিঙ্গি লম্বা একটি নল চোখের সামনে ঘুরিয়ে দু'ধারের গ্রামগুলোকে তাক্ করছে।

ফাগুলাল ফিস্‌ফিস্ করে বাতাসিকে বলল: 'ঐ লম্বা চোঙটা কী বল দিকিনি?'

বাতাসি বলল: 'কামান।'

'ধ্যেৎ! ওটা কামান নাকি? অত ছোট কামান হয়?'

'তা হলে? আর কামানই যদি না হবে, তা হলে গ্রামগুলো তাক্ করেছে কেন অমন করে?'

'কামান নয়, ওটা দূরবিন। ঐ যন্ত্র দিয়ে তাকালে দূরের জিনিসকে কাছে দেখা যায়। সাহেব ঐ যন্ত্র দিয়ে গ্রাম সুতানুটি খুঁজছেন।'

'ওঁরাও বুঝি সুতানুটি যাবেন?'

'হ্যাঁ।'

'কেন যাবেন?'

'ওখানে ওদের কুঠি আছে।'

'কুঠি কী?'

'ব্যবসার ঘাঁটি। মাল বেচা আর সওদা করার জন্য ওদের লোকজন আছে। অনেক চালাঘর আছে।'

'যবন সাহেব ব্যবসা করে? তার নাম কী?'

'নামটি খাসা। চার্ণক সাহেব। এ নাম কখনও শুনেছ?'

'না।'

কথা বলতে বলতে ফাগুলাল দেখল বাতাসি অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে আসছে। তার মনমরা ভাবটা ধীরে ধীরে কেটে যাচ্ছে। সুতরাং ফাগুলাল আরও উৎসাহিত হয়ে কথা বলতে চেষ্টা করল। কিন্তু ঠিক সেই সময়েই বড় মিঞা হাঁক দিল, 'আর ভয় নাই কর্তারা, আমরা সুতানুটির হাটখোলা ঘাটে নাও বাঁধতেছি। আপনারা ঠিক হয়ে বসেন। চুলবুল করবেন না।' এ কথা বলার কিছুক্ষণ পরেই বড় মিঞা নৌকো বেঁধে দিল। ফাগুলাল দেখল, বাতাসির সেই সহজ ভাবটা মুহূর্তে উবে গেল। কেমন যেন সে দুর্জ্ঞেয় হয়ে গেল। আবার রহস্যময়তার খোলস ঘিরে ধরল বাতাসিকে। বাতাসি উচাটন হল।

এদিকে নাও ছেড়ে পাড়ে ওঠবার সঙ্গে আকাশ ফুঁড়ে বৃষ্টি নামল। তুমুল বৃষ্টি।

বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে চারদিক কালো করে নেমে এল অন্ধকার। দিন-দুপুরে এমন অন্ধকার বাতাসি কখনও দেখেনি। নিজেকে সে বড় অসহায় বোধ করতে থাকল। সেই বৃষ্টিঝরা দিনে ফাগুলালের পিছু পিছু সুতানুটির জঙ্গলাকীর্ণ পথে সে ধীরে ধীরে হেঁটে চলল। ঘেঁটু আর কালকাসুন্দির জঙ্গল ভেঙে পায়ে পায়ে এগিয়ে চলল বাতাসি।

॥ দুই ॥

শরীরটা সুবিধের নয়। বর্ষার শুরু থেকেই গোলমাল। বদ্রীদাস বে-সামাল। খিদে নেই তার, বমি বমি ভাব। গা গুলোয়। অপরিসীম ক্লান্তি। কোনও ব্যাপারেই উৎসাহ নেই বদ্রীর। গা ঢিসঢিস। তা প্রতি বছরেই তার এরকম হয়। এটা বদ্রীর বচ্ছরান্তের ব্যাপার। বদ্রী তার এই অবস্থা দেখে আগে ঘাবড়ে যেত। এখন যায় না। সে বুঝেছে, সুতানুটির জলেতেই যত গড়বড়ি। এখানকার জলটা লোনা। বর্ষাকালে এই লোনা ভাবটা বেজায় বেড়ে যায়। খালবিল নদীনালা সব জলে থই থই। তাই এরকম হয়। গত ষোলো-আঠারো বছর বদ্রীদাস তার বিধবা মাকে নিয়ে এই গ্রাম সুতানুটিতে বসবাস করছে। ইমারত না-হোক, এক জোড়া চালাঘরও সে তুলেছে এই অস্বাস্থ্যকর জায়গাটিতে। এখানকার মাটির সঙ্গে তার সম্বন্ধ গড়ে উঠেছে। দিনের বেলায় আশে-পাশের গ্রাম আর হাটে হাটে ঘুরে বেড়ালেও, সুতানুটির বাইরে আজও রাত কাটায়নি বদ্রী। তবু এ গ্রামের জল-বাতাসের সঙ্গে তার সমঝোতা হল না। বর্ষা শুরু হলেই গোলমালটা বেজায় বেড়ে যায়। হোগলা আর আশু শেওড়ার জঙ্গল ফন্‌ফন্‌ করে বাড়তে থাকে, আর ঠিক সেই পরিমাণে বদ্রী কাবু হয়। গ্রাম সুতানুটির খালে-বিলে জল থই থই করে, আর তা দেখে বদ্রীদাসের কেবল গা গুলোয়।

বদ্রীদাস ব্রাহ্মণ সন্তান। গ্রাম সুতানুটিতে জাতের অবশ্য তেমন কদর নেই, তবু ব্রাহ্মণ বলে নিজের পরিচয় দিতে বদ্রীর দেমাক বোধহয়। এখানে ছাটুরে লোকদেরই দাপট। এদের আবার তেমন জাতের ঠিক নেই। এদের পিছনে পিছনে চলে আসছে নানা পেশার মানুষ। এদের কেউ শাঁখারি, কেউ কাঁসারি। কেউ মেছুয়া-জেলে, আবার কেউ বা কসাই-হাড়ি-ডোম। তেলি, মুদি, বেনে—সবাই ইদানীং সুতানুটিতে দৌড়ে আসছে। গড়ে উঠছে টোলা, পটি, পাড়া। কাঁসারি পটি, সোনা পটির সঙ্গে সঙ্গে গড়ে উঠছে, কসাইটোলা, ডোমটোলা, পটুয়াটোলা। ম্লেচ্ছ বিবিয়ানদের নিয়েও কোথাও কোথাও র‍্যালা শুরু হয়েছে। শোনা যাচ্ছে, আমড়াতলার ওদিকে তৈরি হচ্ছে 'জান বাজার'।

তা শরীর বেসামাল হলেও বদ্রীর পুজো-আহ্নিকে ফাঁকি পড়বার জো নেই। ওর শরিকী ভাইরা সাবর্ণদের বাঁধা পুরোহিত। ওখানে কালীপুজো করে। বদ্রী কারো পুরোহিত নয়। পুরোহিতদের পেশা তার পছন্দও নয়। তবে পুজো করতে সে ভালোবাসে। সে যা করে, ভালোবেসেই করে। অতি প্রত্যূষে উঠে প্রাতঃকৃত্য সেরে সে পুজোয় বসে। রক্তাম্বর পরে কপালে লাল ত্রিপুণ্ডক এঁকে প্রতিদিন সে মায়ের আরাধনা করে। মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে বদ্রী নিজের ভেতর বেশ খানিকটা বল খুঁজে পায়। সে টের পায় যে, তার কণ্ঠস্বর ক্রমে ক্রমে গমগমিয়ে

উঠছে। বদ্রী কোনও প্রতিমা পুজো করে না। ঘটপটও না। তার পুজোর জায়গায় একটা বেদি আছে। তাতে গাঁথা আছে একটি সিঁদুর মাখানো ত্রিশূল। এই ত্রিশূলই তার কাছে মহাশক্তি-মহাদেব। প্রতিদিন সকালে বদ্রী এই ত্রিশূলে জবাফুলের মালা চড়ায়। তেল সিঁদুর লেপে। পালা পার্বণে ঐ ত্রিশূলের ওপর একখণ্ড রক্তাম্বরও চাপায়।

পুজো-আহ্নিকের শেষে পাথরের গেলাস থেকে অনেকখানি মিছরি ভেজানো জল তার সেব্য। এরপর তার তামাক-খাওয়া। দাওয়ায় বসে বসে থেলো হুঁকোতে বদ্রী তামাক খায়। তামাক খেতে খেতে চারদিক তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। চারদিকে জঙ্গল। মাছি ভ্যান্ ভ্যান্। জঙ্গলের ভেতর দিয়ে সরু পায়ে চলা পথ।

'কই হে, মাথায় করে কী ফেরি করছ বল দেখি! আর যাও কোন দিকে? ওদিকে তো হোগল কুড়িয়ার জঙ্গল।

'আঁজ্ঞে, নতুন লোক কিনা। সব পথ ঠিক চিনি না।'

'তা মাথার ঝুড়িতে ওসব কী কী ফিরি করছ?'

'আঁজ্ঞে, খাড়ির মুখে অনেক ইলিশ ধরা পড়েছে, তাই ঝাঁকা নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

'বটে! তা দাম কেমন নিচ্ছে?' বদ্রী হুঁকোতে মৃদু মৃদু টান দিল।

'আঁজ্ঞে, এক 'ঢেপুয়া' যদি দেন, তাহলে পাঁচখানা দিতে পারি।'

বদ্রী থেলো হুঁকোতে ঘন ঘন টান দিল। ইতিমধ্যে ঝাঁকা নামিয়ে ফেলেছে মেছুয়া। রুপোলি ইলিশে ঝাঁকা ভর্তি। মাছগুলো বেশ তাজা। আকারও বড়। দেখলেই লোভ সকর্সাকিয়ে ওঠে। বমি বমি-ভাব আর গা গুলোলে কী হয়, বদ্রী ইলিশ দেখে লোভে পড়ে গেল। ভুলে গেল তার শরীরের গড়বড়ি। থেলো হুঁকোতে বার কয়েক টান দিয়ে বলল: 'তা ঢেপুয়া যে চাইছ, এক ঢেপুয়ায় কত কড়ি হয়, তা জান?'

'আঁজ্ঞে, তা আর জানিনে? বিশ গণ্ডা কড়ি।' মেছুয়া কাঁধের গামছাটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে হাওয়া খেতে থাকল।

'তা হলে এক একটা ইলিশ পিছু চার গণ্ডা কড়ি লাগবে? বলো কী হে মেছুয়া? এ যে গলাকাটা দর! এ কি তুমি আমাদের শেঠ-বসাকদের মতন বড়লোক ঠাউরেছ নাকি?'

'তা কত্তা, আপনি কত দেবেন, বলেন! আমি তো আমার দর বলেছি। এখন আপনি কী দামে নিতে পারবেন, তা বলুন।'

বদ্রীদাস একটু চিন্তা করল। আরও কয়েকবার হুঁকোতে টান দিল। তারপর নাক মুখ দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে ঈষৎ প্রসন্ন চিত্তে বলল: 'মেছুয়া, তোমাকে আমি চার গণ্ডা কড়িই দেব। কিন্তু তোমাকে দিতে হবে এক জোড়া ইলিশ। দ্যাখো, পারবে কিনা! পারলে দাও।'

মাথা চুলকে মেছুয়া বলল। 'আঁজ্ঞে, না পারলেও, আপনাদের জন্যি পারতে হবে। বউনির মুখে খদ্দের হাত ছাড়া করা চলে না। তা কত্তা, আপনাকে কিন্তু কড়ি দিয়েই

কিনতে হবে। ঢেপুয়া দিলে খুচরো কড়ি ফেরত দিতে পারব না। ইদানীং কড়ির বড়ো টানাটানি চলেছে।'

বদ্রীদাস নগদ চার গণ্ডা কড়ি দিয়েই এক জোড়া ইলিশ কিনে ফেলল। নিজের বাড়ির দাওয়ায় বসে এইভাবেই সে প্রতিদিন হাট করে। সবজি, মাছ এমনকি চাল ডালও সওদা করে। ইলিশ আর বড় বড় চ্যাংড়া মাছের ওপর বদ্রীর বরাবরের লোভ। মায়ের হেঁসেল আলাদা। সে হেঁসেলের নিরামিষ খাবারের সঙ্গে বদ্রীর এতটুকু লোভ নেই। গব্য ঘি বা দুধ-দই-ছানা ইত্যাদি তাকে অনুমাত্র টানে না। বদ্রীর যত দুর্বলতা এই ধরনের মাছের ওপর। একজোড়া ইলিশ সে এক বেলাতেই খেয়ে ফেলে। এ মাছের কিছুটা খায় ভেজে, কিছুটা ঝাল দিয়ে। তবে ইলিশের পাথুরিটা সে বেশি তৃপ্তি করে খায়। লাল দাঁড়ার বড় চ্যাংড়া মালাই বানিয়ে দিলে সে এক বেলাতে এক কুড়ি মাছ অনায়াসে এক সের চালের ভাতের সঙ্গে উড়িয়ে দিতে পারে। তবে সে এই বর্ষা এলে বড় বেহাল। কাবু। অঘ্রানে নবান্নের পর থেকেই সে চাঙ্গা হয়ে ওঠে। তখন তার ভোজন বাড়ে। ভোজ্যও নানা রকমের হয়।

রাত্তির বেলায় বদ্রীদাসের খাওয়া-দাওয়া একেবারে সাদাসিধে। গরম গরম ভাতের সঙ্গে এক বাটি গব্য ঘি, কৈ মাছ বা মৌরলা মাছের ঝোল হলেই তার চলে। মা কোন কোন দিন একো গুড় দিয়ে পায়েস বানিয়ে রাখেন। এই পায়েসটুকু সে বেশ আয়েস করে, তৃপ্তি করে খায়। এরপরে ঘরের দাওয়ায় বদ্রী মাদুর পেতে বসে। দাওয়ার খুঁটিতে ঠেস দিয়ে বসে তামাক খায়। এই অন্ধকারে দাওয়ায় বসে তামাক খাওয়া তার প্রতিদিনের অভ্যাস। তামাক খেতে খেতে বদ্রীদাস তার সারা দিনের কাজকর্মের হিসেব-নিকেশ করে। সঙ্গে সঙ্গে পরের দিনের কাজের ছকটাও সে তৈরি করে ফেলে। কেবল কাজ নয়, নিজের টাকা-পয়সার হিসেবটাও বদ্রী মাঝে মাঝে করে। বদ্রীদাস টের পায় যে, গ্রাম সুতানুটিতে টাকা-পয়সা ইদানীং উড়তে আরম্ভ করেছে। ঠিক মতো তক্কে তক্কে থাকতে পারলে রাতারাতি বরাত ফিরে যাবে। কিন্তু ঐ তক্কে তক্কে থাকাটাই শক্ত। চারদিক তাকিয়ে সমঝে চলতে হয়। তালুক-মুলুক নিয়ে বড়লোক হবার দিন চলে যাচ্ছে। এখন এসেছে ব্যবসা-পাতি করার দিন। এক টাকায় এক সিকি লাভ। হাটখোলার হাট দিনে দিনে ফেঁপে উঠছে। হাজার হাজার টাকার লেনদেন হচ্ছে। কিছুদিন আগে ফিরিঙ্গি ইংরেজরা যখন চালাঘর বানিয়ে এখানে এসে বসেছিল, তখন কেনা-বেচাটা চার-পাঁচগুণ বেড়ে গিয়েছিল।

ফিরিঙ্গি ইংরেজের দল প্রথম সুতানুটির হাটে পা দিয়েছিল বছর চারেক আগে। হুগলির ফৌজদারের তাড়া খেয়ে তারা পালিয়ে এসেছিল। সেবার শীতকাল। নুলো হাজরার কাঁচাগাছির ঘাটে নাওয়ের মাশুল মিটিয়ে দিয়ে বদ্রী গঙ্গার ওপর দিয়ে চলে আসছিল হাটখোলার দিকে। হঠাৎ বড় বড় জাহাজগুলো নিমতলার ওদিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সে থ'। এ আবার কারা এল ? লড়াই শুরু হল নাকি ? বেতড়ের হাটে পর্তুগিজরা আগে হামেশাই হামলা করত। মাঝে মাঝে লেগে যেত দাঙ্গা-লড়াই। এখানেও সে রকম আরম্ভ হবে নাকি ? হা-রে-রে করে এখনই না মারামারি লাগে !

বদ্রীদাস ঘাবড়ে গিয়েছিল। গা-ঢাকা দেবার মতলব আঁটছিল সে। কিন্তু সে সুযোগ তার মেলেনি।

'হুই, বাঙালি মহাশয়, ইধারে একটুকুন আইয়ে।'

ঐ অদ্ভুত ভাষায় ডাক শুনে বদ্রীদাস চোখ তুলে যা দেখেছিল, তাতে তার চোখ একেবারে ছানাবড়া। দেখেছিল দেহাতি বিহারীদের মতো কামিজ পরা এক ফিরিঙ্গি ঐ খিঁচুড়ি ভাষায় তাকে ডাকছে। তবে কামিজটা বিহারীদের মত হলেও, তার পরনে ছিল [illegible] পা-জামা। ঐ ফিরিঙ্গি কেবল একা ছিল না, সঙ্গে ছিল আরও পনেরো-বিশটা সাদা চামড়ার মানুষ। এদের দেখে বদ্রীদাসের গা হিম হয়ে গেল। এদের মাথায় টুপি। টুপির পাশে পাখির পালক। তা বদ্রীর গা-ঢাকা দেবার মতো ফুরসত আর মিলল না।

'আইয়ে মহাশয়, একটুকুন আইয়ে।'

পায়ে পায়ে বাধ্য হয়েই এগিয়ে গেল বদ্রীদাস। ঠিক বলিদানের ছাগের মতন। ভেতরে ভেতরে সর্বাংগ তার ঠাণ্ডা মেরে গেলেও, বাইরে বদ্রী তা কিছুতেই জানতে দিল না। বরং একটু তেড়ে ফুঁড়েই সে বলেছিল, 'তোমরা কি পর্তুগিজ? বোম্বেটে? তা যদি হও, তোমাদের ধারে কাছে আমি যাচ্ছি না।'

'না না, আমরা হার্মাদ নই। তোমার ডর নাই।'

'তা হলে তোমরা কারা?'

'আমরা ইংরাজ। আমরা সুতানুটিতে কুঠি বানাতে চাই। আমরা ব্যবসা করব। হাটে হাটে সওদা করব।'

এবার বদ্রীদাস সাহস পেল। বলল: 'তোমাদের এ জায়গার খোঁজ দিয়েছে কে?'

ফিরিঙ্গি সাহেব হা-হা করে হেসে উঠল। বলল: 'কে আবার খোঁজ দিবে? আপনাদের কাছে আমরা খোঁজ নেব। তা আপনার নাম কী?'

'আমার নাম বদ্রীদাস। আমার নাম দিয়ে আপনি কী করবেন?'

'বদ্‌লি দাস? বাঃ, খাসা নাম ত! আমি আপনাকে আমার 'সরকার' বানাইব। আপনি কি রাজি আছেন?' ফিরিঙ্গি আবার হা-হা করে হেসে উঠল।

ইংরেজ সদাগরের 'সরকার' হতে রাজি হয়েছিল বদ্রীদাস। এর আগে বদ্রী বসাকদের সুতোর কারবারে সামান্য এক কর্মচারী হিসেবে তাঁতিদের বাড়ি বাড়ি দাদন দিয়ে বেড়াত। কাঁচাগদির ঘাট হয়ে যে খাঁড়িটা গঙ্গায় এসে পড়েছে, সেই খাঁড়ি ধরে বরাবর সে ছই নৌকো করে চলে যেত পূর্বদিকে। ধর্মতলা হয়ে বেলেঘাটা-শেয়ালদা পেরিয়ে, খাঁড়িটা আরও পূর্বদিকে লবণ হ্রদের দিকে চলে গিয়েছিল। পূব বাংলার নদীনালার সঙ্গে এ খাঁড়িটার কেমন যেন যোগ হয়ে গিয়েছিল। কেননা এই খাঁড়ি ধরেই পূব বাংলা থেকে আসত বালাম চাল। আসত ঢাকাই মিহি মসলিন। আগে গঙ্গা পেরিয়ে বেতড়ের কোল দিয়ে প্রবাহিত বেতকাঁর খাল। সে খাল ধরে চলে যাওয়া যেত সোজা সপ্তগ্রাম। ইদানীং আর যাওয়া যায় না। খাল বুজে গেছে চড়া পড়ে পড়ে। নৌকো চলে না। সপ্তগ্রামের পড়ন্ত অবস্থার পরে বেশ কয়েক বছর নিয়মিত হাট বসত বেতড়ে।

সেখানেও জমজমাট হাট ছিল। হাজার হাজার টাকার কেনা-বেচা হত। হার্মাদদের হঠকারিতায় সেটাও বন্ধ হয়ে গেল। বদ্রী সে সব ইতিহাস অনেকবার শুনেছে। আজও শোনে।

ফিরিঙ্গি জাহাজি ইংরেজের নামটা থেকেই থেকেই আজকাল মনে পড়ে বদ্রীদাসের। ওঁর নামটা হল জোব চার্ণক। সকলে তাকে সাহেব চার্ণক বলেই ডাকত। তা বদ্রী কোনও দিন সাহেবকে নাম ধরে ডাকেনি। বলত বড় সাহেব। বড় সাহেব অনেকদিন পাটনায় ছিলেন। তাই গড়গড় করে হিন্দি বলতে পারতেন। কিন্তু বাংলা বলতে গেলেই খিঁচুড়ি পাকিয়ে ফেলতেন। একদিন সাহেব হঠাৎ বললেন, 'বদলি দাস, তুমি আমাকে একটা সাচ্ কথা বলবে?'

'সাচ্ কথা বলব সাহেব। মিছে বলে আমার কী হবে?'

'বেটড়ের হাটটা উঠে গেল কেন? ঐ তো গঙ্গার ওপারে খাঁড়ি দিয়ে খানিকটা ঢুকে গেলেই বেটড়। শালিখা-শিবপুর কাছেই। তা সুতানুটির হাট দিনে দিনে বেড়ে চলেছে, আর ওটা বেমালুম কেন হাওয়া হয়ে গেল?'

বদ্রীদাস সবিনয়ে বলেছিল, 'সাহেব ওটা ছিল হার্মাদদের হাট। তোমরা যাদেরকে পর্তুগিজ বল, তেনাদের। ওঁরা গোয়া থেকে বড় বড় জাহাজ সাগরে ভাসিয়ে এসে শালকে-শিবপুরের গঙ্গার কোলে নোঙ্গর গেড়ে বসতেন। জাহাজ ভরে আনতেন নানা ধরনের বিদেশি সওদা। যেমন তোমরা আন। ওদের আসবার পরে বেতড়ের চার-পাশের গ্রামে ঢোল সহরত করে জানিয়ে দেওয়া হত যে, বেতড়ে দু' তিন মাসের জন্য হাট বসবে। হাট বসাবার জন্য রাতারাতি তৈরি হত চালাঘর। খবর পেয়ে এ দেশের ব্যবসাদারেরা দলে দলে আসত। আসত তাদের নানা ধরনের সওদা সাজিয়ে। হার্মাদিরা এসব জিনিস এন্তার কিনত, আর তাদের মালপত্তর জাহাজ উজাড় করে বিক্রি করত।

'এ সব কাম্ তো সব সদাগরই করে, তাতে হাট উঠবে কেন? হাটের তো বাড়বাড়ন্ত হবে! হাট না-বাড়লে, ব্যবসা বাড়বে কেমন করে?'

'ঠিক বলেছেন সাহেব! যত হাট চলবে, তত ব্যবসা বাড়বে। কিন্তু চলতে যদি না দি?'

'তার মানে? হাটকে চলতে দেওয়া হবে না? তা কেন হবে? কে চলতে দেবে না।'

'আজ্ঞে, বেতড়ের হাট কিছুদিন চলবার পর হার্মাদেরাই আর চলতে দিত না।'

'কারণ?'

'কারণ খুবই পরিষ্কার। কেনা-কাটা করতে করতে একসময় তাদের জাহাজ কেনা সওদায় ভরতি হয়ে যেত। এদিকে যে সব মাল বেচবার জন্য নিয়ে আসত, সেগুলি বেচা হয়ে যেত। সুতরাং তাদের আর দরকার হত না হাট চালাবার। তাই তারা আগুন লাগিয়ে হাটের চালাঘরগুলো পুড়িয়ে দিয়ে যেত। এই চালাঘর সব যখন দাউ দাউ করে পুড়ত, তা গঙ্গার এ পার থেকে লাল আকাশ দেখে বোঝা যেত।'

'তা সুতানুটির হাটটাও তো একদিন এভাবে ওরা পুড়িয়ে দিতে পারে?'

'উহ্ন, তা পারে না। এ হাট পোড়াবার হক নেই হার্মাদদের। এটা শেঠ-বসাকদের হাট। মল্লিকদের হাট। ওনাদের নয়।'

'তা বেতড়ের হাট বছরে ক'বার বসত?'

'আঁজ্ঞে, ও হাটটা হার্মাদিরা বছরে বার তিনেক বসাত। আর এ হাট স্থায়ী হত দেড়-দু'মাসের বেশি নয়। বাকি সময়টা জঙ্গলে ভরে থাকত। সাত গাঁ থেকে চলে আসবার পর শেঠ-বসাকরা বেতড়কেই হাট-গঞ্জ হিসেবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু হার্মাদদের উৎপাতে তা তাঁরা পারেন নি। তাই অনেক ভাবনা-চিন্তা করে ওনারা সুতানুটির এখানে হাটের পত্তন করেছেন।'

বদ্রীদাসের কথাগুলি অবাক বিস্ময়ে শুনেছিল সাহেব। শেষে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'এ সুতানুটি গ্রামের মালিকানা কার? বদ্রিদাস, তুমি যাদের নাম বলিলে, তারা?'

'আঁজ্ঞে না সাহেব!' বদ্রীর মুখে একগাল হাসি, 'এখানকার গ্রামগুলির মালিক হলেন কালীঘাটের সাবর্ণ চৌধুরীরা।'

'হাটুয়ারা কোথায় থাকেন?'

'শেঠ-বসাকরা?'

'হ্যাঁ, তেনাদের কুঠি কোথায়? তেনারা নিশ্চই এখানে থাকেন?'

'না সাহবে, তাঁরা সুতানুটিতে থাকেন না। তেনারা থাকেন খাঁড়ির ওপারে গোবিন্দপুরে।'

যেমন হঠাৎ এসে হাজির হওয়া, তেমনি হঠাৎ আবার মিলিয়ে যাওয়া। এ যেন ভানুমতীর খেল। ভোজবাজি! তা কেনাকাটা তো বেশ ভালই শুরু করেছিল সাহেব। ষোলো মণ মিছরি, চার মণ লবঙ্গ একদিনেই কেনা হয়েছিল। তবে বেশি করে কেনা হয়েছিল সোরা। একশ বস্তা সোরা জাহাজের খোলে ভরে দেওয়া হয়েছিল। সাহেবের ইচ্ছে ছিল কিছু ভাল মসলিনও কেনেন। সাহেবদের দেশে ঢাকাই মসলিনের নাকি মেলা চাহিদা। সুতানুটির হাটে সেবার ভাল মসলিনের তেমন চালান ছিল না। বদ্রীদাসকে তাই যেতে হয়েছিল ঢাকার ব্যাপারিদের কাছে। কাঁচাগদির হাট থেকে নৌকো ভাড়া করে যেতে হয়েছিল গোবিন্দপুরের রঘুনাথ দাসের আড়তে। কাঁচাগদির ঘাট থেকে খাঁড়ির ভেতর দিয়ে পুবে নৌকো চালিয়ে ধর্মতলার দিকে খানিকটা এগোলেই দেখা যাবে খাঁড়ির একটা ভাগ দক্ষিণের দিকে বাঁক নিয়েছে। মূল খাঁড়ি থেকে আরেকটা খাঁড়ি বাদার ভেতর ঢুকে পড়েছে। চারদিকে সুন্দরী গাছের জঙ্গল। খাঁড়িটাও বেশ গভীর। এদিকের ডাঙায় বাঘের ভয় আছে। জলে রয়েছে কুমিরের উৎপাত। জঙ্গলের এই খাঁড়ি দিয়ে সহজে কেউ আসতে চায় না। গা ছমছম করে। তার ওপর এদিকে ডাকাতেরও খুব উৎপাত। অনেক বোম্বেটে ডাকাতও এদের ভেতর আছে। কোনও অচেনা আড়তদার যদি ভুলে এ পথে পাড়ি দেয়, তার বিপদ সুনিশ্চিত। কেবল আড়তদার নয়, কালীঘাটের তীর্থযাত্রীদের পক্ষেও জায়গাটা বিপজ্জনক। বেশিরভাগ সময়েই সর্বস্ব খুইয়ে এঁদের বাড়ি ফিরতে হয়।

তা বদ্রীদাসের এ পর্যন্ত তেমন কোনও বিপদ হয়নি। কেননা, এ বাদার ভেতর ঢুকে মাঝে মাঝেই সে মহর্ষি চৌরঙ্গির আশ্রমে এক টেপুয়ার পুজো দিয়ে যায়। আশ্রমের ভেতর পাঁচ দশ জন সাধু-সন্ন্যাসী সর্বদাই থাকেন; সাধুরা এদেশের নয়। মুখে দাড়ির জঙ্গল, ভারি ভারি বড় বড় চেহারা। বাঘের মতন জ্বলজ্বলে চোখ। আধা-নাঙ্গা। তা এই আখড়া থেকে খাঁড়ি ধরে আরও খানিকটা এগিয়ে গেলে গোবিন্দপুরে রঘুনাথদাসের আড়ত। গঙ্গা থেকে এদিকটা একটু দূর। তবে পূবদিকে আরও খানিকটা এগিয়ে গেলে শেঠ-বসাকদের ভদ্রাসন। তবে এ ভদ্রাসন এখনও পাকাপোক্ত করেননি। কেননা, এখনও সুতানুটির হাটের বিষয়ে ও'দের আস্থা আসেনি। তবে ইদানীং হাটের কেনা-বেচা জোরদার হওয়াতে ও'দের মুখে কিছু হাসি ফুটেছে। শোনা যায়, সুতো আর রেশমি কাপড়ের ব্যবসা শেঠেদের বংশে অনেকদিনের। দু'আড়াইশ বছর আগে গৌড়নগরেও ও'দের এ কাপড়ের ব্যবসা ছিল। গৌড়ের পত্তন হলে ও'রা চলে আসেন সুবর্ণগ্রামে। এই সোনার গাঁ থেকে পরে ঢাকায়। আরও পরে কাসিমবাজার-মুর্শিদাবাদ-সপ্তগ্রাম হয়ে হুগলিতে। তা ওঁরা এখন হুগলি জেলার হলুদপুরেই রয়েছেন। ওখানে রয়েছে ওঁদের পাকা ইমারত। দেবমন্দির। ঘাট বাঁধানো দিঘি। বিরাট বিরাট আমের বাগান। পরিবার-পরিজনের বেশিরভাগই থাকেন ওখানে। এই গোবিন্দপুরে থাকেন স্রেফ ব্যবসার খাতিরে।

ডিহি গোবিন্দপুরে শেঠেদের গায়ে গায়ে বাস করলেও বসাকরা কিন্তু এ অঞ্চলে এসেছে বেশ কয়েক বছর পরে। শেঠেরাই এখানে নিয়ে এসেছেন বসাকদের। তা বসাকরাও কম পয়সার মালিক নন। এ'রাও বেশ ধনী। শোনা যায়, এক সময়ে মুর্শিদাবাদে এ'রা কোরা সুতির আর রেশমি কাপড়ের ব্যবসা করতেন। আসলে এ'রাও তাঁতি। সুতো আর কাপড়ের ব্যবসা করে তিন পুরুষে ফুলে ওঠেন। আর ব্যবসার সূত্রেই শেঠেদের সঙ্গে হৃদ্যতা। মেলামেশা। দোস্তি। ডিহি সুতানটিতে ধীরে ধীরে এ'রাও জাঁকিয়ে বসছেন।

রঘুনাথ দাস ঢাকার লোক। ভাষাতেও ঢাকাই টান। খালি গায়েই বেশির ভাগ সময় থাকেন। তবে কাঁধে থাকে পাটকরা গামছা। হাতে থাকে থেলো-হুঁকো। রঘুনাথ বলল, 'কর্তা ভাল মসলিন তো এখন দিতে পারুম না। তবে যদি বনাত চান, ভাল বনাত দিতে পারি।'

'বনাত? মানে পশমি কাপড়?'

'আগ্যা হু, তবে মাল খুব খাসা হবে।'

বদ্রীদাসকে তেমন করে কথা বলবার কোনও সুযোগ না দিয়ে একটির পর একটি বনাত সেদিন খুলে ধরেছিল রঘুনাথ। নানা রঙের বনাত। কোনওটি লাল, কোনওটি সবুজ। আবার কোনওটি ছিল বেগুনি রঙের। প'য়তাল্লিশ হাত লাল বনাতের দাম হে'কেছিল একশো বিশ টাকা। সবুজ বনাতের দাম চেয়েছিল হাত পিছু সওয়া তিন টাকা। আর বেগুনি রঙের হাত তিরিশের একটি বনাতের দাম বলেছিল একশো নয় টাকা।

কথা বলবার এক ফাঁকে চলে এসেছিল তামাক। রঘু তাঁতির চাকর ঈশান কল্‌কেতে ফুঁ দিকে দিতে বামুনের হুঁকোটা এগিয়ে দিয়েছিল বদ্রীদাসকে। বদ্রী হুঁকোটা ধরবার সঙ্গে কল্‌কেটা মাথায় পরিয়ে দিয়েছিল ঈশান।

'তা রঘুভাই! এই বনাত তো আমার চলবে না। ফিরিঙ্গি ইংরেজরা আমাকে মসলিনের পয়সা দিয়েছে।'

'তা দিন, থেতি নেই। এ বনাতও তেনাদের লাগে। যদি লাগে, নিয়ে যাবেন।'

'তা নিয়ে যাব', তামাক খেতে খেতে বলেছিল বদ্রী। 'কিন্তু অ্যাতোটা দিতে পারব না। এ গলাকাটা দর। তাছাড়া আরও একটা কথা। এত টাকার মাল কিনলে, আমার দস্তুরি কেমন থাকবে, সেটা বললেন না তো?'

'দিমু দিমু। আপনাকে দস্তুরি দিমু। তা ট্যাকায় দু পেপুয়া দিমু।'

বদ্রী তামাক খেতে খেতে বলেছিল, 'বেশ। তাই দিও। তবে দেওয়া নেওয়াটা কিন্তু হাতেহাতে। বাকি-বাকেয়ায় চলবে না। আমি অনেক ঠকেছি।'

রঘুনাথ জিভ কেটে বলেছিল, 'কী যে কন। বামুনের ট্যাকা মেরে কি নরকে যাব?'

'কিন্তু মসলিনটা যে আমার এখনই দরকার। আপনার কাপড়ের চালান কবে আসবে?'

'তা শিগগিরই আসবে কর্তা, এলে খবর দিমু।'

যে পথ দিয়ে বদ্রীদাস গোবিন্দপুরে গিয়েছিল, সেই পথ দিয়ে ফিরল না। খাঁড়ি-নৌকোর পাওনা-গণ্ডা মিটিয়ে দিয়ে হাঁটাপথে চলে এল গঙ্গার দিকে। সেখান থেকে আলাদা একটা নৌকো করে হাটখোলার দিকে রওনা দিল। কিন্তু হাটখোলা পর্যন্ত তাকে আর আসতে হল না। দূর থেকেই সে টের পেল চিড়িয়া ভেসে গেছে। পালতোলা বড় বড় জাহাজগুলো বেবাক হাওয়া।

বদ্রীদাস অবাক হয়ে গিয়েছিল। এরকম ঘটনা যে কখনও ঘটতে পারে, তা সকালে পর্যন্ত সে এতটুকুও আঁচ করতে পারেনি। কিন্তু সাহেব হঠাৎ চলে গেলেন কেন? নিশ্চয় কিছু রহস্য আছে। কিন্তু কী সে রহস্য? অনেক চেষ্টা করেও জানতে পারেনি বদ্রী।

শীতের দুপুর। নদীর জল স্থির! গাছের পাতাগুলি অকম্পিত। তবে কোথা থেকে যেন শিরশিরে একটা ঠাণ্ডা বাতাস আসছিল। বদ্রীদাসের মনটা অকারণে উচাটন হয়ে পড়েছিল। সে দুপুরে বিষণ্ণচিত্তেই সে ফিরে এসেছিল নিজের বাড়িতে। রাত্তিরবেলা তামাক খেতে খেতে বদ্রীদাস হিসেব করে দেখেছিল, সাহেব খামোকা চলে গেলেও, তাকে ঠকিয়ে যায়নি। একদিনে তার ট্যাক ভালই ভরেছে। প্রায় পঞ্চাশ টাকা সে কামিয়েছে।

তা ন মাস পরে আবার অঘটন ঘটল। সেবায় আশ্বিন মাস। ডিহি কলকাতার উঁচু পগারের ওপর মেলা কাশ ফুল ফুটেছে। বাইরের চালাঘরের কোণে যে শিউলি গাছটা ছিল, সে গাছে আকাশের তারার মতো সাদা সাদা ফুল এসেছে ঝাঁকিয়ে।

খালে-বিলে হামেশাই কই মাগুর ধরা পড়ছে। কই-মাগুরের ঝোল বদ্রীদাসের বড় প্রিয়। চাঁদু কবরেজ তাকে অল্প ঝাল দিয়ে মাগুরের ঝোল খেতে পরামর্শ দিয়েছে। তা সেদিন এক হাঁড়ি জ্যান্ত মাগুর নিয়ে বটতলার মল্লিকদের আড়ত হয়ে ফিরছিল বদ্রী। পথে ঘনশ্যাম আর ফাগুলাল গিয়ে খবর দিল যে, ইংরেজ সাহেবরা আবার সুতানুটি এসেছে। বদ্রীর কপাল কুঞ্চিত হল। সত্যি ?

'হ্যাঁ গো, বড় ভাই! তেনারা আবার এসেছেন।'

'তোরা কী করে জানলি ? তোরা তো তাদের দেখিসনি ?'

'তা নাইবা দেখলাম। তোমার কাছে তেনাদের কথা শুনে, আমরাও চিনে ফেলেছি।' কথাটা বলল ফাগুলাল। ফাগুলাল মাস দুয়েক হল বদ্রীদাসের চালাঘরে আস্তানা গেড়েছে। ছোকরা চট্‌পটে। এলেম আছে। মল্লিকদের আড়তে নতুন কাজ পেয়েছে। ঘনশ্যামও তাই। তবে ঘনশ্যামের চাকরিটা পাকা নয়। মাঝে মাঝে বসিয়ে দেয়। ফাগুলালের সঙ্গে সেও থাকে বদ্রীর চালাঘরে। নিজেরাই রান্নাবান্না করে খায়। ওদের কাছে বদ্রী ভাড়া নেয় না। তবে কিছু কিছু ফাইফরমাস খাটতে হয় বিনা মজুরিতে।

ঘনশ্যাম বলল : 'সেই খ্যাপা সাহেবটাও এসেছে। তোমার খোঁজ করছিল।'

এক ঝাঁক টিয়াপাখি ট্যা ট্যা করতে করতে মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল। বদ্রীদাসের মনটাও ঐ টিয়াদের মত ট্যা ট্যা করে খুশিতে চিৎকার করে উঠতে চাইল। হাঁড়ি ভরা মাগুর নিয়ে সে নিজের আস্তানার দিকে দৌড়তে আরম্ভ করল। ঘনশ্যাম আর ফাগুলালের দিকে একবার পিছু ফিরেও তাকাল না। পোশাক বদল করে বদ্রী সোজা গিয়ে হাজির হল চার্ণক সাহেবের কাছে। বদ্রীকে হাতে পেয়ে চার্ণক সাহেবও বেজায় খুশি।

'সেবার কোথায় যে তুমি হাওয়া হয়ে গেলে সাহেব, একদম টের পেলাম না। তা এবার সেরকম আবার করবে নাকি ?'

সাহেব হা-হা করে হেসে উঠে বলল : 'পিছনে দুশমন আছে। তাই হাওয়া। এখন দুশমন নাই। হাওয়া কোভি নাই হোতা হু।'

'তা হলে এখানে থাকবে ?'

'থাকিব।'

আগের বার জাহাজের ভেতরেই ছিল সাহেবরা। ডাঙায় নামেনি। জরুরি কাজ না-থাকলে কেউই ডাঙায় নামত না। এবার কিন্তু সাহেবরা সত্যি সত্যিই ডাঙায় নামল। বলল : 'এ কার খাস্ জমিন বলো ত ? এ জমিনে আমরা আস্তানা বানাইব। যাহার জমিন্, তাহাকে খাজনা দিব।'

তা সাহেব ঠিক কথা বলেছিলেন। সুতানুটি তো আর অরাজক মুলুক নয়। আস্তানা তৈরি করতে হলে জমি কিনতে হয়। খাজনা দিতে হয়। বড়িশা-বেহালার সাবর্ণ চৌধুরীরা ছিলেন এ ভূ-সম্পত্তির মালিক। তেনারা বেহাজ নন। তাঁরাই বা ছাড়বেন কেন ? সাহেবকে নিয়ে তেনাদের কাছারিতে একদিন

যেতে হল বদ্রীদাসকে। সাবর্ণ চৌধুরীদের তখন রমরমা। গমগম করছে কাছারি বাড়ি। ভোজপুরি দারোয়ানরা পাহারা দিচ্ছে বাইরের দেউড়িতে। হাতে হাতে তাদের লম্বা লম্বা লাঠি।

বড়কর্তা সেদিন কাছারিতে আসেননি। ছিলেন ছোটকর্তা। তিনি সাহেবের আবেদন শুনে বললেন: 'একটা আস্তানা কেন সাহেব, তোমরা বিশটা আস্তানা আমাদের সুতানুটিতে বানিয়ে নিতে পার। কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু সাহেব, তোমাকে জায়গা বেচবার ক্ষ্যামতা আমাদের নেই। রায়ত স্থিতিবান স্বত্বে এখানে বসতে হলে শাহি ফরমান দরকার। দরকার হস্‌বুল হুকুমের। শুনেছি আপনাদের কোম্পানির ব্যবসার জন্য সা-শুজার নিশান আছে। তা সাহেব তোমরা ব্যবসা কর। হাট সুতানুটিতে থাকবার আর ব্যবসা করবার জন্য আমাদের কাছারিতে খাজনা জমা দিলেই হবে। আমাদের খালসা জমিতে এর বেশি কিছু সুযোগ আমরা তোমাদের দিতে পারব না।'

তা সাহেব এটুকু সুযোগ পেয়েই খুশি হয়ে গেল। নবাবের দরবারে যেমন করে তসলিম জানাতে হয়, ঠিক সেইভাবে বারবার সাহেব তসলিম জানাল সাবর্ণ চৌধুরীদের ছোটকর্তাকে।

'কর্তা সাহেব, আমাদের কালীঘাটের কালীমাকে একবারে দেখে যাবে নাকি?'

'কালীগট্? সে কি এখানে নাকি?'

'হ্যাঁ, তোমাদের কালীগট্ এখানে। সাবর্ণ চৌধুরীদের ঠাকুর। ভারি জাগ্রত। এ মায়ের কাছে যা চাওয়া যায়, তাই পাওয়া যায়। আমার শরিকী ভায়েরা এখানকার পুরোহিত। তুমি যদি মায়ের কাছে পুজো দিতে চাও, এখনই দিতে পার।'

'তোমার মা কি খ্রিস্টানের পুজো নেবেন?'

সাহেবের এ জিজ্ঞাসায় বদ্রী একটু অস্বস্তি বোধ করল। সাহেবকে নিজেদের ঠাকুরের মাহাত্ম্য বোঝাবার জন্য বদ্রী এতক্ষণ কথার পিঠে কথা চাপাচ্ছিল। তাছাড়া কেরেস্তান সাহেবরা হিঁদুদের দেবতাকে পুজো দেয় না বলেই সে জানত। সাহেব পুজো দিতে এগিয়ে আসবে না, একথা ভেবেই, সে সাহেবকে প্রলুব্ধ করেছিল। কিন্তু সাহেব যে একেবারে সত্যি সত্যিই কেরেস্তান হয়েও পুজো দিতে এগিয়ে আসবে, তা বদ্রী আঁচ করতে পারেনি। ফলে, বেচারি বিপন্ন হল। অস্বস্তি বোধ করতে থাকল।

'সাহেব, তুমি কি সত্যিই সত্যিই পুজো দিতে চাও?'

'চাই।'

চট্ করে বদ্রীর মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। সে সাহেবের কাছ থেকে একটা সিকি টাকা চেয়ে নিল। বলল, 'তুমি এ নাওয়ে বস সাহেব। আমি তোমার নামে মায়ের কাছে পুজো চড়িয়ে আসছি। তোমাকে মন্দিরের ভেতর হিন্দুরা ঢুকতে দেবে না। এখন আমি যাচ্ছি তোমার হয়ে।'

বদ্রীদাস হাঁটতে হাঁটতে চলে গেল মন্দিরের পথে। মন্দিরের সামনের একটি

দোকান থেকে প্রচুর মেঠাই কিনল। কিনল কলা-শশা-বাতাবি লেবু-পেয়ারা ইত্যাদি ফল। আর কিনল একরাশ ফুল আর ফুলের মালা। মন্দিরে ঢুকে নিজেই মনে মনে মন্ত্র বলে সাহেবের মঙ্গল কামনায় দেবীর সামনে সব উপচার নামিয়ে দিল। মন্দির সে সময় মোটামুটি নির্জনই থাকত। তখনও তাই। ছিল। মন্দিরের এক কোণে বসে পুরোহিত ইষ্টমন্ত্র জপ করছিলেন। খুটখাট্ শব্দ শুনে বললেন, 'কে বদ্রীদাস না ?'

'আঁজ্ঞে, হ্যাঁ।'

'কী করছিস ? এসব কী ?'

'আঁজ্ঞে, মনস্কামনা করে দেবীর কাছে এগুলি পোঁছে দিয়ে গেলাম। তা আপনার কাছে যদি দেবীর পায়ে উৎসর্গ করা একপাত তেল সিঁদুর থাকে, আমাকে দিন।'

'সিঁদুর দিয়ে কী করবি ?'

'কাজ আছে।'

এক পাত তেল সিঁদুর নিয়েই নৌকোয় ফিরে এসেছিল বদ্রীদাস। এই তেল সিঁদুর দিয়ে সাহেবের কপালে এঁকে দিয়েছিল ত্রিপুণ্ড্রক। সাহেব ভারি মজা পেয়েছিল। সকৌতুকে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'বদলি দাস, এটা তুমি কী করিলে ? তুমি গডেস্ কালীকে পাঁঠা দিবে না ?'

'সেই মানতই করে এলাম সাহেব। ব্যবসাটা জাঁকিয়ে উঠলে মায়ের কাছে জোড়া পাঁঠা বলি দিয়ে ষোড়শোপচারে পুজো দেব।'

সুতানুটি হাটখোলায় এবার সত্যি সত্যিই জাঁকিয়ে বসল চার্ণক সাহেব। গঙ্গার ধারে যে বিরাট নিমগাছটা ডালপালা মেলে দাঁড়িয়েছিল, তার কাছেই অনেকগুলি চালাঘর তুলল সাহেব। জলে রইল জাহাজ, আর ডাঙায় রইল চালাঘর। এখানে ফিরিঙ্গি ইংরেজদের বসবাস করবার অবাধ ব্যবসা। কোনও কোনও ঘরে জমা হতে থাকল হাট থেকে কেনা মালপত্তর। কোনটাতে গোল মরিচের ব্যবস্থা, কোনটাতে বস্তা বস্তা মিছরি। এছাড়া ছিল শয়ে শয়ে লাল কাঠের লাঠি। সোরা রাখা হত আলাদা জায়গায়। হাজার হাজার বস্তা সোরা, তাঁতবস্ত্র, মসলিন আর পশমের কাপড় রাখা হত জাহাজের ভেতর। ইংরেজ সাহেবদের সওদা করার ঠেলায় হাটখোলা রীতিমত জমকে উঠল। শেঠ-বসাকরা সাহেবদের ওপর ভারি প্রসন্ন। সুতানুটি হাটের দায়িত্ব সম্পর্কে তাঁরা প্রায় নিশ্চিত হয়ে গেলেন। চার্ণক সাহেবও খুশি। বড় নিমগাছটার মাথায় সাহেব একদিন বিরাট এক নিশান টাঙিয়ে দিলেন। কোম্পানির নিশান।

তা সেদিন নাওয়া-খাওয়ার সময় ছিল না বদ্রীদাসেরও। মালপত্তর সংগ্রহের জন্য তাকে ঘুরতে হচ্ছিল চরকির মতন। বদ্রী কখনও চলেছে চাঁদু তাঁতির আড়তে, আবার কখনও চড়ক ডাঙায় মল্লিকদের শোলার গুদামে। শেঠ-বসাকদের গোবিন্দপুরের ভদ্রাসনে তাকে প্রায়ই যেতে হত। বেনেটোলায় ছিল মশলার ব্যবসাদারেরা। গোলমরিচ আর মিছরি তাদের কাছ থেকেই সওদা করত বদ্রী। বদ্রী

নিজে সব পেরে উঠছিল না বলে ফাগ্‌লাল আর ঘনশ্যামকে নিজের নোকর হিসেবে বহাল করেছিল।

কর্মব্যস্ত এই দিনগুলির মধ্যে বদ্রীর অবকাশ ছিল কেবল রাত্তিরবেলাটুকুতে। প্রদীপের আলোকে টাকা-পয়সার হিসেব-নিকেশ করে বদ্রীদাস বিছানায় শুতে যাবার আগে অনেকক্ষণ ধরে থেলো হুঁকোটি নিয়ে ধূমপান করত। এই ধূমপান করবার সময় নানান ভাবনা তার মনে খেলা করে বেড়াত। অনেক কাল আগে এক অবধূত সাধু তার কপাল দেখে বলেছিল যে, তার ভাগ্যে ধনসঞ্চয়ের যোগ প্রবল। তবে ফিরিঙ্গি সংসর্গ ছাড়া এই ধনভাগ্য খুলবে না। অবধূতের একথা শুনে অনেকে টিপ্‌পানি কেটে বলেছিল, 'ও বদ্রীর মা, তোমার ছেলে কেরেস্তান হয়ে যাবে বলে মনে হয়। তা বাপু, তুমি ছেলেটার ওপর একটু নজর রেখ।'

সেসব কথা ভেবে আজ বদ্রী হাসে। সাধুর ভবিষ্যৎবাণী ফলেছে। বদ্রীদাস আজ দশ হাজার টাকার মালিক। শোবার ঘরের ভেতর লোহার এক সিন্দুকে সে অর্ধেক টাকা রেখে দিয়েছে। বাকি অর্ধেক আছে মাটির তলায় পেতলের হাঁড়ি ভর্তি করে। তিন হাত নীচে। ওপরে চৌকিতে বিছানা পাতা। এ বিছানাতে শোয় বদ্রী। বিছানাটা ভারি আরামের। ভারি স্বস্তির।

বদ্রীর যে মোটা টাকা হয়েছে, তা মায়ের কাছে চাপা নেই। যেমন করেই হোক, তিনি টের পেয়ে গেছেন। আগে মা-বেটা সংসার চালাত দারিদ্র্যের সঙ্গে রীতিমত সংগ্রাম করে। আজও গরিবের মতোই সংসার চলে, তবে সংগ্রামটা নেই। একটা হালকা সুখের হাওয়া সংসারে বসন্তকালের মতন খেলা করে বেড়াচ্ছে। একদিন মা এসে বদ্রীর কাছে হাত-পা ছড়িয়ে থপ করে বসে পড়লেন।

'মা, তোমার শরীর খারাপ নাকি ?'

'তা বাছা তবু ভাল। মায়ের শরীরের দিকে তোর নজর পড়েছে। আর তো পারি না বাবা। আমার বয়স বাড়ছে না কমছে ? এইভাবে কতদিন আর তোর সংসার ঠেলব, বাবা ?'

'কেন, তোমার হল কী ? শরীর খারাপ হয় তো একটু বিশ্রাম নাও। আমি রান্নাবান্নার জন্য একটা লোক দেখি।'

'লোক ?' মায়ের চোখ দুটি রাগে ঝিকিয়ে উঠল, 'ভারি বড় লোক হয়েছিস তুই নারে ? মাকে লোক দেখাচ্ছিস্ ! তা তুই কি বে-থা করবি না, নাকি ? তোর বয়সও তো এককুড়ি ছ'বছর হল। আর কবে বিয়ে করবি।'

ষোলো-আঠারো বয়স হবার পর থেকেই মায়ের কাছ থেকে এ প্রস্তাব বারে বারে এসেছে বদ্রীদাসের কাছে। আর বদ্রী সে প্রস্তাব বারে বারে নাকচ করেছে। গরিবের সংসারে আরও গরিবি সে বাড়াতে চায়নি। তাছাড়া ভেতর থেকে বিয়ে করবার জন্য তেমন সে তাগিদও অনুভব করেনি। কিন্তু আজ মায়ের প্রস্তাব সে কোন অছিলায় ফেরত দেবে ? বদ্রীদাসের বাড়ির দাওয়ায় বসে অনেক দূরের বড় বড় গাছগুলিকে উঁচু পাহাড়ের মতো মনে হয়। ঐ গাছগুলির মাথার ওপর যখন উজ্জ্বল তারাগুলি দেখা

দেয়, তখন তার মনটা কেমন যেন উচাটন হয়ে ওঠে। মনে হয়, তাকে অনেক পাহাড় ডিঙিয়ে অনেক দূর দেশে যেতে হবে।

তা মায়ের কথাগুলি সরাসরি উড়িয়ে দিতে পারল না বদ্রীদাস। বলল 'ভেবে দেখি। তোমার সাধ মেটাতে পারলে খুশি হব।'

ছাব্বিশ বছর বয়সটা বিয়ের পক্ষে সেকালে মেলা বছর। এ বয়সে কুলীন বামুনরা চার পাঁচটা বিয়ে হামেশাই করে ফেলত। কিন্তু বদ্রীদাস একটিও পারল না। আশেপাশে তাকিয়ে সত্যিই সে ঘাড়বে গেল। মনে মনে বদ্রী ঠিক করল, এবার সে বিয়ে করবে। তবে একেবারে ছোটোখাটো—নাকে পোঁটা-পড়া নয়। একটু ডাগর ডোগর। যাতে অন্তত ইশারায় কথা বুঝতে পারে।

তবে সুতানুটি বা গোবিন্দপুরের মেয়ে নয়। ডিহি কালকাতারও নয়। পরের দিন ফাগুলালের ডাক পড়ল। তা ঘনশ্যামকেও ডাকা যেত। কিন্তু ঘনশ্যাম তেমন চট্‌পটে নয়। সাব্যস্তও নয়। পক্ষান্তরে ফাগুলাল বেশ সপ্রতিভ। কায়স্থ। রুচিবোধ আছে।

'তা ফাগুলাল, তোমাদের ওদিকে ভালো বংশের বামুনের মেয়ে আছে নাকি ?'

'আঁজ্ঞে, তার আর অভাব কি ? খোঁজ করলেই পাওয়া যাবে।'

'তবে নাকে পোঁটা-পড়া হলে হবে না। একটু ডাগর-ডোগর হওয়া চাই। এই বছর বারো-চোদ্দর নীচে নয়।'

'আঁজ্ঞে, এই ধরনের মেয়ে কি আপনার বিবাহের জন্য ?' অতি বিনম্রভাবেই প্রভু বদ্রীদাসকে জিজ্ঞাসা করল ফাগুলাল।

ফাগুলাল বিনয়ের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেও বদ্রীদাসের কানে কথাগুলি কেমন যেন বেসুরো লাগল। বদ্রীর মনে হল যে, তার বিয়ের ব্যাপারটা ছেলে-ছোকরাদের চোখে হাস্যকর বলেই মনে হচ্ছে। কেননা, এই রকম বয়সে পোঁছুলে সচরাচর কেউ বিয়ে করে না। সুতরাং—

সুতরাং চট্ করে বদ্রীদাসের বাচনভঙ্গিও বদলে গেল। একটু গম্ভীরভাবে ফাগুলালের দিকে তাকিয়ে বদ্রী বলল : 'না, আমার বিয়ের জন্য নয়। মাকে সংসারের কাজে সাহায্য করবার জন্য একটি নির্ঝঞ্ঝাট মেয়ে দরকার। তা তোমাদের সন্ধানে থাকলে দেখো।'

বছর গড়িয়ে গেল। শরতের পরে এল হেমন্ত। ব্যবসা-পত্তর বেশ ভালই চলছিল। ফিরিঙ্গি ইংরেজদের নানা রকমের জাহাজও আসা-যাওয়া করছিল। বিলেতি মাল ভর্তি জাহাজ আসে। হাটে বিক্রি হয়। দেখতে দেখতে জাহাজ ফাঁকা হয়ে যায়। সেই ফাঁকা জাহাজ আবার এদেশের সওদায় ভরে ওঠে।

চোদ্দ মাসের মাথায় হঠাৎ সেবার গোল বাধাল এসে এক বিদিকিচ্ছিরি ইংরেজ সাহেব। সাহেবের নাম, হিথ্। জাহাজি লোক। কাপ্তেন। চেহারা ত নয়, ছোটখাটো একটা হাতি। মদ খেয়ে সর্বদা চুড়। চোখ দুটি ছোট ছোট। গাঁক গাঁক করে ইংরেজি বলে। চার্ণক সাহেবের সঙ্গে কথায় কথায় লেগে যায় ঝগড়া।

তা ঝগড়া করেই সাহেব শেষমেশ হারিয়ে দিল চার্ণককে। কেবল হারিয়ে দেওয়া নয়, সুতানুটির পাট চুকিয়ে চার্ণককে ঐ বিদিকিচ্ছিরি সাহেবটা বাধ্য করল অন্য এক অজানা জায়গায় পাড়ি দিতে।

ব্যাপারটি গোলমেলে হলেও বদ্রীর কাছে এ ঘটনা অপ্রত্যাশিত নয়। সে গিয়েছিল চার্ণক সাহেবের কাছে বিদায় নিতে।

'বদ্রি দাস, আমি আবার আসিব। বাংলার সুবাদার বাহাদুর খাঁ আমাদের কথা শুনিতেছে না। তবে শীঘ্রই শুনিবে। আমরা নিশান পাইব। আবার আসিব। তোমাদের কালীঘটে জোড়াপাঁঠা মানসিক আছে। অপেক্ষা কর। ওয়েট্ প্লিজ।'

বদ্রী সেই থেকে অপেক্ষা করে আছে। তবে বদ্রীর অবকাশও আজ তেমন নেই। কেননা, সে নিজেই মসলিন আর তাঁতের ব্যবসা আরম্ভ করে দিয়েছে। ফাগুলাল আর ঘনশ্যামকেও ছাড়েনি বদ্রী। তারা তার ব্যবসার খিদ্মদগার। তাঁতিদের ঘরে ঘরে দাদন দিয়ে আসে তারাই। মাল বয়ে দিয়ে যায় তাঁতি আর মহাজনেরা। হাট সুতনুটির আড়তে বদ্রীকে প্রায় সারা দিনই থাকতে হয়।

শরীরটা ভাল যাচ্ছে না বদ্রীর। গা টিস্ টিস্। বমি বমি ভাব। গ্রাম সুতানুটির খালে বিলে জল থই থই। পুকুরগুলি টই-টম্বুর। মশা-মাছির বেজায় উৎপাত। রেতে মশা। দিনে মাছি।

তা বাঁ-হাতের পাখা দিয়ে মাছি তাড়িয়ে তাড়িয়ে এক জোড়া ইলিশ দিয়ে আধসের-তিনপো চালের ভাত বদ্রীদাস উড়িয়ে দিল। বমি বমি ভাবটা এখন আর তেমন নেই। বরং গায়ে একটু বল ফিরে এল। দিন কতক হল মায়েরও জ্বর জ্বর ভাব। মা বললেন, 'বাবা, আর এক হাতা ভাত দোব ?'

বদ্রী বলল : 'আজ এ পর্যন্তই থাক। দেখি আজ শরীরটা কেমন যায়।'

ভাদ্র মাসের দুপুর। বেশ রোদ ঝলমল ছিল। হঠাৎ ধোঁয়ার মত কালো মেঘ এসে আকাশটাকে ঢেকে ফেলল। আকাশের দিকে তাকিয়ে তালপাতার টোকাটা মাথায় চড়িয়ে আড়তে বেরিয়ে পড়ল বদ্রীদাস। যাবার সময় বার-বাড়ির ঘরটার সামনে এসে ডাকল, 'ফাগুলাল আছ নাকি, ফাগুলাল ?'

কোন সাড়া পাওয়া গেল না। বাড়ির ভেতর থেকে মা ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন, 'তোর কি ভিমরতি হল নাকি বদ্রী ? দিন তিনেক হল ছেলেটা তোকে বলে দেশে গেছে। আর তাকেই কিনা তুই ডাকছিস্ !'

'না ডাকিনি। ফিরেছে কিনা, তাই খোঁজ নিচ্ছিলাম।'

আড়তে পৌঁছুবার সঙ্গে সঙ্গে আকাশ ফুঁড়ে বৃষ্টি নামল। তুমুল বৃষ্টি। কেবল বৃষ্টি নয়, মুহুর্মুহু বজ্রপাত। আকাশের একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত ঝিলিক দিয়ে উঠতে থাকল বিদ্যুৎ। বৃষ্টি আর বিদ্যুতে সারা আকাশ নিয়ে যেন দাপাদাপি করতে থাকল। বদ্রীদাস এমন ধারা বৃষ্টি অনেক কাল দেখেনি। তাই সে অবাক বিস্ময়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল। ঘনশ্যামও চুপ। তবে ঘণ্টা

দুই পরে বৃষ্টি একটু ধরে এল। সেই সময় পাশের আড়তের একটি কর্মচারী ভিজতে ভিজতে এসে বদ্রীদাসকে হেঁকে জানাল, 'খবরটা পেয়েছেন নাকি হালদার মশাই ?'

'খবর ? কিসের খবর ?

'আঁজ্ঞে সেই জাহাজি ইংরেজরা ফিরে এসেছে আবার। দেখলাম নিমতলার ওপাশে জাহাজ বাঁধা। বৃষ্টির জন্য কেও নামতে পারছে না।'

'বলো কী হে ? তুমি নিজে চোখে জাহাজ দেখে এসেছ ?'

'আঁজ্ঞে হ্যাঁ। নিজে চোখে।'

বদ্রীদাসের ভেতরটা গুরুগুর করে উঠল। তালপাতার টোপাটা মাথায় তুলে নিয়ে সে মুহূর্তে দৌড়ল নিমতলার দিকে। বৃষ্টি পাতলা হয়ে এসেছে। চার্ণক সাহেব জাহাজ থেকে তীরে নামবার চেষ্টা করছিলেন।

'হ্যালো, বদলিদাস। তুমি আসিয়া গিয়াছ! দ্যাখ, আমি কথা রাখিয়াছি। আসিয়াছি।'

'সাহেব, আবার পালাবে না তো ?'

'আজীবন আমি সুতানুটিতে থাকিব। এখানে আমার গোর থাকিবে।'

বৃষ্টি থামল না। ঝিরঝিরে বৃষ্টিটা খোলা আকাশের সঙ্গে একইভাবে লেগে রইল। অপরাহ্ণ গড়িয়ে পড়ল রাত্রিতে। গঙ্গার তীর কাদায় পিছল হল। পা ডুবে যেতে থাকল। সুতানুটির রাস্তাঘাটেও জমে উঠল কাদা। আশশেওড়া আর ঝিঁঝি গাছ ভিজে সপসপে হয়ে উঠল। মেঘে ঢাকা আকাশে অন্ধকার নামল নিবিড় হয়ে। খালবিল থেকে বেজে উঠতে থাকল ব্যাঙের ডাকের ঐকতান। ডাকতে থাকল ঝিঁঝি পোকা। সাহেবের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বদ্রীদাস অন্ধকারে হাতড়াতে হাতড়াতে কোনও রকমে বাড়ি ফিরে এল। বাড়িটাও নিঝুম অন্ধকারে ডুবে আছে। বদ্রীদাসের মনটা আনন্দে ডগমগ। খুশিতে সে হাঁক পাড়তে থাকল, 'মা, মা—তুমি কোথায় ?'

মায়ের ঘরের দরজা খোলা। প্রদীপ হাতে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে আলো দেখাল একটি মেয়ে। অচেনা অজানা মেয়েটিকে দেখে অবাক হয়ে গেল বদ্রী।

'কে তুমি ? কী নাম ? তোমাকে আমি কখনও দেখিনি তো ?'

মৃদু স্বরে মেয়েটি বলল : 'আমার নাম বাতাসি!'

বাইরে ঈষৎ মেঘ গর্জন। বদ্রী শুনল, 'দাসী।' প্রদীপের ক্ষীণ আলোকে মেয়েটিকে আরেকবার দেখতে চেষ্টা করল সে। দেখা গেল না। দমকা বাতাসে দীপ নিভে গেল।

॥ তিন ॥

দিন পাঁচেক পরের কথা। অমাবস্যার দিন থেকে দিন চারেক বেহুঁশ জ্বরে পড়েছিলেন মা। কেবল জ্বর নয়, জ্বরের সঙ্গে গাঁটে গাঁটে অসম্ভব যন্ত্রণা। নিজে নিজে পাশ ফেরা সম্ভব হচ্ছিল না। পাশ ফিরিয়ে দিতে হচ্ছিল ধরে ধরে। এমন বিশ্রী

অসুখ মায়ের কখনও দেখেনি বদ্রীদাস। মাকে সে বরাবর সক্ষম এবং সুস্বাস্থ্যের অধিকারীই দেখে আসছে। জ্বর-জিরেত তাঁর কদাচিৎ হয়েছে, হলেও কখনও শয্যা নেননি। ঐ অবস্থাতেই সংসার সামলেছেন। রান্নাবান্না করে দিয়েছেন বদ্রীদাসকে। সংসারের কোনও অসুবিধাই টের পাওয়া যায়নি। তবে এবার খুব রক্ষে যে, বাতাসি হঠাৎ এসে গেছে সংসারে। তার সেবাতেই দাক্ষায়নী বামনি বেঁচে উঠলেন।

এখনও সে রকম তুমুলভাবে বৃষ্টি নামেনি। তবে বৃষ্টি নামাবার মহড়া দিচ্ছে আকাশ। বদ্রীদাস বেরিয়ে গেছে আড়তের দিকে। ভেতর বাড়িতে দাক্ষায়নী বামনি ছাড়া আর কেউ ছিল না। বার-বাড়িটাও বন্ধ। ঘনশ্যাম অনেক আগেই আড়তে গেছে। ফাগুলাল গেছে দেশে। তবু বাইরের ঘরে মানুষের গলার স্বর শোনা যায় কেন? বৃষ্টিটা ঝমঝমিয়ে নামছে। উঠোনে ভিজে নরম কাদা। কে আবার ঢুকল বার-বাড়িটার ঘরে? ইদানীং সুতানুটিতে চোর আর মাতালের বড় উৎপাত। তা দিনের বেলা কি চোর আসবে? এ নির্ঘাৎ কোন মাতালের কাণ্ড। বৃষ্টি আসছে দেখে তালা ভেঙে ঘরে ঢুকে পড়েছে। তারপর কী করবে লোকটা, কে জানে?

দাক্ষায়নী বামনির মনে ধন্দ ঢুকে গেল। তাই ত, কী করা যায়! মনের ভেতর ধন্দ ঢুকে গেলে দাক্ষায়নী আর স্থির থাকতে পারেন না। ছটফটানি লাগে। তা ঐ রকম ছটফট করতে করতে বাইরের ঘরে তিনি হানা দিলেন।

ঘরের দরজা হাট করে খোলা। খড়ের চালে বৃষ্টির পটপট আওয়াজ। খুব রেগেমেগেই ঘরে ঢুকলেন দাক্ষায়নী। আর ঘরে ঢুকে যা দেখলেন, তাতে চক্ষুস্থির। ফাগুলালের চৌকির ওপর বসে আছে একটি মেয়ে। আর মেঝেয় বসে তার পায়ে ধরে সাধছে ফাগুলাল। মেয়েটি কেমন যেন সিঁটিয়ে আছে। চোখের চাহনিতে কেমন যেন অসহায় ভাব। ফাগুলাল বিড় বিড় করে কী যেন বলছে। ঐ বিড়বিড়ে ভাষার কিছুই বোধগম্য হল না তাঁর।

'হ্যাঁরে, অ বিটুলে, তোর পেটে পেটে অ্যাতো শয়তানি! ঘরে দিনদুপুরে একটা মাগী জুটিয়ে এনেছিস্! তোর আস্পর্ধা তো কম নয়!' কথা বলবার সঙ্গে সঙ্গে উত্তেজনায় ছটফট করে উঠলেন দাক্ষায়নী। তাঁর কণ্ঠস্বরে খনখনে আওয়াজ শোনা গেল।

'আজ্ঞে, এ সব কী কথা বলছেন ঠানদি! এ মেয়েটাকে আপনার জন্যই দেশ থেকে নিয়ে এসেছি। আর আপনি কিনা—'

'থাম', খনখনে গলায় আবার ঝঙ্কার তুললেন দাক্ষায়নী, 'অ আমার উপকারী নাতিরে! আমার জন্য যদি ওকে এনে থাকিস্ তা আমার কাছে ওকে নিয়ে গিয়ে হাজির হোস্‌নি কেন? তার ওপর আবার পায়ে ধরে কী করছিলি?'

'আঁজ্ঞে, পা হড়কে ঘরের সামনে পড়ে গেল কিনা! গোড়ালিটা মুচকে গেছে। তাই বললুম একটু টেনে দি। সেই টেনে দেওয়ার কাজটাই করছিলাম।'

'বটে!' দাক্ষায়নী একটু থিতু হলেন। এবার তিনি মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'অ আবাগীর বেটি! এই মুখপোড়া ফেগো কথাটা কি ঠিক বলেছে? তা তোমার নাম কী বাছা?'

এরকম কুৎসিত পরিবেশের মুখোমুখি কখনও হয়নি বাতাসি। সে ক্ষীণ কণ্ঠে বলল : 'আমার নাম বাতাসি। ফাগুদা আমাকে দেশ থেকে এইমাত্র নিয়ে এল।'

বৃষ্টিটা এবার তুমুল হয়ে নামল। বাতাসে শাঁ শাঁ শব্দ উঠল। বৃষ্টির ঝাপট বারবার ঘরের দরজায় আছাড় খেয়ে পড়তে থাকল। দাক্ষায়নীর মন থেকে ধন্দ যায় যায় না। তাঁর মনেও ঝড়ের দাপট। দেশ থেকে নিয়ে এসেছে মেয়েটাকে! তার মানে ফুসলে নিয়ে এসেছে? আহা, কার সর্বনাশ করে এল কে জানে? ভোগ করে দু'দিন পরে মেয়েটাকে ছেড়ে দেবে। মেয়েটা গিয়ে পড়বে হাটুরেদের হাতে। ক্ষুধার্ত নেকড়ের মত ওরা মেয়েটাকে ছিঁড়ে খাবে। তারপর গড়াতে গড়াতে চলে যাবে জানবাজারে গাঁয়ের সরল মেয়েটি বুঝতেও পারবে না যে, তার কী ভয়ঙ্কর সর্বনাশ হয়ে যাবে। দাক্ষায়নীর এবার সব মমতা গিয়ে পড়ল বাতাসির ওপর।

'তোমার জাত কী মা? ফাগু তোমাকে এখানে জোর করে এনেছে?'

'আমি ব্রাহ্মণের মেয়ে।' আগের মতন ক্ষীণকণ্ঠে বলল বাতাসি। 'আমাকে জোর করে ফাগুদা আনেনি। আমি স্বেচ্ছায় এসেছি।'

ফাগুলাল পরিস্থিতি সামাল দিতে বাতাসির কথা লুফে নিয়ে বলল : 'ঠানদি বিশ্বাস কর, আমার কোনও বদ মতলব নেই। বাবু বলেছিলেন আমাকে আপনার কাজের সুবিধের জন্য একটি বামুনের মেয়ে আনতে। তাই এনেছি। এখন আপনি যদি ওকে রাখতে না-চান, তাহলে অন্য কারোকে দিয়ে দেব। নয়ত দেশে রেখে আসব।'

'হুঁ।' দাক্ষায়নী কিছু যেন একটা বুঝলেন। বাতাসির হাত ধরে হিড়হিড় করে টানতে টানতে তিনি নিয়ে চললেন ভেতর বাড়ির দিকে। তখনও অঝোরে বৃষ্টি। বাতাসে জলের ঝাপট। বাতাসির এলানো খোঁপা খুলে গেল। কোমরের কষিটা আলগা হয়ে গেল।

'তা আমার জন্যেই যখন তোমাকে আনা হয়েছে বাছা, তখন তুমি আমার কাছেই থাকবে।'

দুপুরের পর থেকে দাক্ষায়নী বামনির জ্বর এল। জ্বরের সঙ্গে এল কাঁপুনি। তার আগে কোনরকমে রান্নাঘরটা বাতাসিকে চিনিয়ে দিয়েছিলেন দাক্ষায়নী। দেখিয়ে দিয়েছিলেন রান্নাঘরের জিনিসপত্র। হাতে তুলে দিয়েছিলেন পরবার জন্য আটপৌরে দু'খানা কাপড়। আর বলেছিলেন, 'বাছা, আমার কাছে যখন এসে পৌঁছেছ, তখন আর কোনও ভয় নেই। কোনও বিটলেকে তোমার ধারে কাছে ঘেঁষতে দেব না। এ সব নটবরদের আমি হাড়ে হাড়ে চিনি। আমি অল্প বয়সে একটা ছেলেকে কোলে নিয়ে রাঁঢ় হয়েছি। হাটে বাস করছি। শেয়াল-শকুনিদের আমার ভালই চেনা আছে।'

এই ধরনের আরও অনেক কথা বলেছিলেন দাক্ষায়নী। তবে সেসব কথা এখন তাঁর মনে নেই। কখন বৃষ্টির-বিকেল ফুরিয়ে রাতের আঁধার নেমেছে, তাও তিনি মনে করতে পারেন না। বদ্রীদাস কখন যে বাড়ি ফিরেছে, সে ব্যাপারেও তাঁর হুঁশ

নেই। দেখতে দেখতে সব কেমন যেন তালগোল পাকিয়ে গেল। মাঝে মাঝে যখন হুঁশ ফিরেছে, তখন শুধুই অনুভব করেছেন কাঁপুনি আর দুঃসহ গাঁটের যন্ত্রণা। চাঁদু কবিরাজ যে এসেছিলেন, তা ঝাপসাভাবে মনে পড়ে। তবে বাতাসির বিষণ্ণ করুণ মুখটি অনেকবার তিনি দেখেছেন। জ্বরের ঘোরেও এ মুখটির ছবি তাঁর কাছে হারিয়ে যায়নি। ঐ অজানা-অচেনা মেয়েটি তাঁকে সেবা করেছে দিনরাত্তির। পাশ ফিরে শুইয়ে দিয়েছে বারবার। মালিশ করেছে। পুরিয়া খুলে খুলে মধু দিয়ে মেড়ে তাঁকে সময় মতো ওষুধ খাইয়েছে। মাঝে মাঝে প্রদীপের আলো ধরে উদ্বেগের সঙ্গে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকেছে।

তার অসুখটা তাঁকে তেমন ভোগাল না। চারদিনের দিন জ্বর ছাড়ল। ব্যথাটাও বেমালুম উবে গেল। কিন্তু শরীরটা দুর্বল। একেবারে কাহিল। চৌকি থেকে ওঠা-নামা করতেও কষ্ট। পরের দিন সকালবেলা দাক্ষায়নী ছেলেকে পাকড়াও করলেন।

'হ্যাঁরে বদ্রী, ব্যাপারটা আমায় খুলে বল তো। এই মেয়েটাকে তুই ফাগুলালকে আনতে বলেছিলি!'

'বলেছিলাম।' বদ্রী সকৌতুকে বলল কেন, মেয়েটাকে এনে কি খারাপ করেছি?'

'তা করিসনি। কেননা, মেয়েটা না থাকলে আমি এ যাত্রা বাঁচতাম না। তবে কিনা সোমত্ত একটা মেয়ে। বে-থা হয়নি। কে এই মেয়েটাকে চোখে চোখে রাখবে? যদি কোন গোল বাধে, কে সামলাবে?'

'মেয়েটাকে দেখে তেমন কি তোমার মনে হয়? স্বভাব-টভাব কেমন? ওর মধ্যে যদি তেমন ছেনালি-টেনালি দ্যাখ, তা হলে দূর করে দাও।'

'না বাপু। মিথ্যে বলব না। মেয়েটার স্বভাব চরিত্তির ভাল।'

তা দেখতে দেখতে দাক্ষায়নী বাতাসির মায়ায় পড়ে গেলেন। বাতাসির নিরীহ শান্ত বড় বড় চোখ দুটি বড় মায়াময়। চেহারার ভেতরেও রয়েছে একটি আলগা শ্রী। বাতাসির চেহারার সতেজ স্নিগ্ধ ভাবটি দাক্ষায়নীকে আকৃষ্ট করে। প্রতিদিন বিকেলবেলা বাতাসির চুলগুলি আঁচড়ে টানটান করে খোঁপা বেঁধে দেন তিনি। কপালে টিপ পরিয়ে দেন। আর মনে মনে ভাবেন, এ রকম একটি ছেলের-বৌ কি তাঁর বরাতে জুটবে না?

এক মাস গড়িয়ে গেল। বদ্রীদাস মাকে বলল: 'মা, তোমাকে এই একটা টাকা দিয়ে রাখছি। মাস শেষ হয়েছে। বাতাসিকে মাইনে হিসেবে এই টাকাটা দিয়ে দিও।'

দাক্ষায়নী সেই টাকাটা বাতাসিকে ডেকে হাতে তুলে দিলেন, 'বাছা, এই টাকাটা তোমার কাছে রাখ। তোমার মাইনে।'

'আমি এই টাকা নিয়ে কী করব মা! আমার সামান্য টাকা আছে। তাতেই আমার কাজ হবে। আমার টাকার দরকার নেই!'

'আহা! তাই বললে কি হয়! এ তোমার পরিশ্রমের টাকা। গতর খাটিয়ে

রোজগার করেছ। তোমাকে এ টাকা নিতেই হবে।' এরপর জোর করে টাকাটি বাতাসির হাতে গছিয়ে দিলেন দাক্ষায়নী।

এদিকে ফাগুলালের মাথায় গোঁ চেপেছে। বাতাসির সঙ্গে তাকে একবার দেখা করতেই হবে। তীরে ভেড়বার পরেও তার নৌকো যে এভাবে ডুবে যাবে, এই সুকঠিন সত্যটিকে সে কোনওরকমে মেনে নিতে রাজি নয়। বাতাসি হল তার। বুড়ি দাক্ষায়নীর সে কখনই নয়। দাক্ষায়নীর দাক্ষিণ্যে বাতাসিকে সে ছাড়তে রাজি নয়। পাকে চক্রে আজ না হয় দাক্ষায়নীর ঘরে বাতাসিকে তুলে দিতে হয়েছে। কিন্তু তাই বলে চিরদিন কি সে ওখানে থাকবে? বাতাসির জীবনে কি বসন্ত আসবে না?

বদ্রীদাসের বার বাড়ির ঘর থেকে ভেতর-বাড়ির ঘরের দূরত্ব মাত্র কয়েক হাত। অথচ আজ এই মুহূর্তে তার মনে হচ্ছে, বাতাসির সঙ্গে তার দূরত্ব এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা। চেষ্টা করেও বাতাসির সঙ্গে দেখা মিলছে না ফাগুলালের। দেখতে দেখতে চোখের সামনে দুটি মাস গড়িয়ে গেল। দেখা হল না।

কয়েকদিন আগে ফাগুলাল গিয়েছিল গ্রাম পীরপুকুরে। ভেবেছিল বাতাসির পিসিকে গিয়ে সব কথা কবুল করবে। সব কথা কবুল করে বললে দামিনী পিসি নিশ্চয় তাকে ক্ষমা ঘেন্না করে বেকসুর অভিযোগ মুক্ত করবেন। হয়ত তখন তিনি বাতাসিকে দেখতেও চাইবেন। তখন দামিনী পিসিকে নিয়ে এসে ঐ দাক্ষায়নী বুড়ির সঙ্গে লড়িয়ে দেওয়া যাবে। বাতাসি কি দাসীবৃত্তি করবার জন্য এখানে এসেছে? ফাগুলাল যাকে রানি করতে চায়, সে হবে দাসী?

পীরপুকুর যাবার আগে বাতাসির সঙ্গে একবার দেখা করতে চেষ্টা করেছিল সে। সরাসরি ভেতর-বাড়িতে ঢুকে গিয়েছিল বুক ঠুকে।

'অ ঠানদি, ঠানদি, বাতাসি আছে নাকি? বাতাসির সঙ্গে যে একটু কথা বলব!'

ফাগুলাল অনুমান করেছিল যে, তার এই গলার স্বরে বাতাসি নিজেই বেরিয়ে আসবে। আর বাতাসি বেরিয়ে এলে তার সঙ্গে ফাগুলালের কথা বলাটা আটকায় কে? এক গাঁয়ের মেয়ে। নৌকো চাপিয়ে অতটা পথ তাকে সে একা একাই নিয়ে এসেছে। তাতে যদি বাতাসির ইজ্জতের হানি না হয়ে থাকে, এখন কথা বললে নিশ্চয় ইজ্জৎ চলে যাবে না। কিন্তু কী আশ্চর্য তার ডাকে বাতাসি বেরিয়ে এল না। পরিবর্তে বেরিয়ে এলেন দাক্ষায়নী স্বয়ং। ফাগুলাল অস্বস্তি বোধ করল।

'হ্যারে ড্যাকরা, বাতাসিকে তোর কিসের দরকার। তার সঙ্গে তোর আবার কিসের কথা রে।'

দাক্ষায়নীর এরকম সম্বোধনে ফাগুলাল একটু ঘাবড়ে গেল। তবে ফাগুলাল সপ্রতিভ। চটপটে। এরকম উলটোপালটা পরিস্থিতিতে সে অনেক বার পড়েছে, কিন্তু কোনওবার কোন পরিস্থিতিই তাকে ঘায়েল করতে পারেনি। এবারও পারল না। বরং সে যে কতখানি ডাকাবুকো, তা দাক্ষায়নীকে দেখাতে চেষ্টা করল।

'ঠানদি, আমাকে দেখলে অমন চটে যান কেন বলুন তো? এ ফাগুলাল

আপনার কাছে দোষটা কী করল? আবার বাতাসিই বা আমার সঙ্গে কথা বলবে না কেন, তাও তো বুঝতে পারি না!'

'ও তোর বোঝার দরকার নেই।' দাক্ষায়নী খনখনিয়ে উঠলেন, 'বাতাসিকে কী বলতে হবে বল, আমি বলে দেব। ভদ্রঘরের মেয়ে তোর সামনে ল্যাং ল্যাং করে বেরু হবে কীরে? বল্ কী বলবি!'

'আমি দু'দিনের জন্যে দেশে যাচ্ছি। তা ও যদি আমার সঙ্গে যেত, তাহলে ঘুরিয়ে আনতুম।'

দাক্ষায়নী লাফিয়ে উঠলেন।

'বটে! এই কথাটা বলবার জন্যে তুই বাতাসিকে খুঁজছিলি! দূর হ হতভাগ্য! একটা সোমত্ত মেয়েকে তোর সঙ্গে একা একা আমি ছেড়ে দেব! ভেবেছিস কী রে ড্যাকরা! তারপর তুই মেয়েটাকে একা পেয়ে গা হাত-পা টিপে টিপে দেখবি!'

ঠানদি এবার উগ্রমূর্তি ধারণ করলেন। গলার স্বর বদলে গেল। চোখের তারা ঘুরতে থাকল। তাঁর সামনে ফাগুলাল আর দাঁড়িয়ে থাকতে ভরসা পেল না। সে লাফিয়ে ভেতর বাড়ির উঠোন থেকে চলে এল বার-বাড়ির ঘরে। তখন সকাল বেলা। ঘনশ্যাম ঘরে ছিল। আড়তে যাবার জন্য তৈরি হচ্ছে। মাথায় পাগড়ি বাঁধছে। বদ্রিদাস পুজোর মন্ত্র পাঠ করছে তার পুজোর ঘরে। তার গমগমে কণ্ঠস্বর বাইরের এ ঘর পর্যন্ত চলে আসছে। ওদিকে ফিরিঙ্গি ইংরেজদের জাহাজে ভোঁ বাজছে। প্রতিদিন এরকম বাজে। ভোঁ বাজিয়ে ওরা সময় জানায়। গোটা সংসারটা পরিকল্পিত ছকে চলছে। এই ছকে বেচারি ফাগুলালই কিনা বেছুট!

'কী হল ফাগুলাল, অমন ধপ্ করে বিছানায় বসে পড়লে কেন? দেশের গাঁয়ে যাবে না।'

'যাব বলেই তো বাতাসিকে দুটো কথা বলতে গিয়েছিলাম। কিন্তু কথা বলা গেল না।'

'বাতাসি তোমার সঙ্গে কথা বলল না?'

'বলবে কী করে? ঠান-দি খনখনে গলায় আমাকে না-হোক অপমান করতে আরম্ভ করল। ঐরকম অবস্থায় কোন ভদ্রঘরের মেয়ে কথা বলতে পারে?'

'ঠানদি কি কিছু আঁচ করেছেন নাকি তোমার সম্পর্কে! নইলে'

'মাগীর মাথা খারাপ। মাগীকে আমি জব্দ করব। আমি এ অপমানের শোধ নেব।'

পীরপুকুরে আসবার পরেও ভেতরের জ্বালা মেটেনি ফাগুলালের। সারা রাস্তা সে ন্যানান পরিকল্পনা ভাঁজতে ভাঁজতে এসেছে। দামিনী পিসিকে ঠানদির সঙ্গে লড়িয়ে দেবার পরিকল্পনা তার কাছে তখন বেশ জুতসই বলেই মনে হচ্ছিল। ইচ্ছে ছিল, গ্রামে ঢুকেই সে সোজা দামিনী পিসির কুশল সংবাদ নিয়ে যাবে। পরিস্থিতিটা আঁচ করবার ব্যাপারে সেটাই হবে সঠিক পদক্ষেপ।

তা গ্রামে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে মতলব মাফিকই সে এগোচ্ছিল। কিন্তু হঠাৎ ঢোকার পথে তার এক খুড়তুতো দাদার সঙ্গে দেখা। এ দাদা চাষবাস নিয়ে থাকে। কাচিৎ কদাচিৎ ফাগুলালের সঙ্গে কথা বলে। সে দাদা এগিয়ে এসে প্রায় যেচেই বলল : ফাগুলাল, কতদিন পরে গাঁয়ে আসছিস। গাঁয়ের সব খবরটবর জানিস তো ? নাকি কিছুই জানিস না ?'

'কেন, কী হল ? আমি তো অনেকদিন বাইরে বাইরে আছি। নতুন কিছু খবর হয়েছে নাকি ? সুসংবাদ না দুঃসবাদ ?'

'তা দুঃসংবাদই বলতে পারিস।' ফিস্‌ফিস্ করে বলল সেই দাদা, 'ক'দিন ধরে আমাদের গাঁয়ে কোতোয়ালি থেকে ফৌজদারের সেপাই এসে ঢুঁড়ে বেড়াচ্ছে। অনেক সেপাই। এই পীরপুকুর আর আশপাশের গাঁয়ে নাকি অনেক হার্মাদ ডাকাত লুকিয়ে আছে। ব্যাটারা মেয়ে ধরে ধরে জাহাজে তুলে নিয়ে চলে যায়।'

'সত্যি ?'

'সত্যি নাকি মিথ্যে ? ফৌজদারের সেপাইরা সে কারণেই তো ঢুঁড়ে বেড়াচ্ছে সারা গাঁ। আমাদের সা-জোয়ান ছেলেগুলোকেও ধরে ধরে পিটোচ্ছে। বলছে এ ছেলেদেরও নাকি হার্মাদদের সঙ্গে ভেতরে ভেতরে আঁতাত আছে।'

ফাগুলাল বলল, 'মেয়ে চুরি নিয়ে কী যেন বলছিলে ? সেটা আবার কী ব্যাপার ?'

'ব্যাপার আর কী, আমাদের এখানেও মেয়ে চুরি হয়ে গেছে। ও পাড়ার দামিনী পিসির ভাইঝি, জলজ্যান্ত ডবকা ছুঁড়িটাকে কারা যেন চালান করে দিয়েছে। বোঝ ব্যাপার !'

'তার কোনও হদিশ পাওয়া যাচ্ছে না ? কেউ কিছু বলতে পারছে না—মেয়েটা কোথায় গেল !'

'না। নানান জনে নানান কথা বলছে। কে একজন তোর নামেও খারাপ খারাপ কথা বলছিল। ঘোষ বাগানের জঙ্গলে তুই মাঝে মধ্যে সেই ছুঁড়ির সঙ্গে কথা বলতিস।'

'আমি ?' ফাগুলালের ভেতরটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। 'আমাকে আবার এ সবের ভেতর কে জড়াল রে বাবা। আমি মশাই এ তল্লাটেই থাকি না। কারো সাতে পাঁচে নেই। আর আমার নামেই কিনা, যাঃ শালা—

দাদা বলল : 'আমিও তাই বলেছি। ফাগুলালের নাম তোমরা করছ কেন। সে কি এখানে থাকে ? কিন্তু কে কার কথা শোনে ? ফৌজদারের সেপাইরা বাংলা ফাংলাও বোঝে না। ধরছে আর পেটাচ্ছে। লাথি মেরে শিরদাঁড়া বাঁকিয়ে দিচ্ছে। পাশের গাঁয়ে তাঁবু ফেলে বসে আছে। সন্দেহ হলেই গ্রামে হানা দিচ্ছে। তাই বলি কি, এ ক'দিন সাবধানে থাক। যদি অবশ্য থাকতে চাস। নইলে কাল সকালেই কেটে পড়। বুঝতেই তো পারছিস, পরিস্থিতি সুবিধের নয়।'

'তা এ সব ব্যাপারে দামিনী পিসি কিছু বলছে না ?'

'সে বুড়ি কী আর বলবে ? কপাল চাপড়াচ্ছে, আর কাঁদছে। শুনছি দু'দিন হল শয্যাগত। বুড়ি এবার টাসবে।'

গ্রামে ঢুকে এ ধরনের খবর শুনে ফাগুলাল চিন্তিত হয়ে পড়ল। ঠান-দি দাক্ষায়নীর কাছ থেকে বাতাসিকে উদ্ধার করার জন্য সে যে সব মতলব ভেঁজে আসছিল, তা মুহূর্তে বানচাল হয়ে গেল। এখন সে আবিষ্কার করল যে, সে নিজেই বিপন্ন। বাতাসির নামের সঙ্গে তার নামটা যখন একবার উঠেছে, তখন যে কোন মুহূর্তে গোল বেধে যেতে পারে। আর একবার গোল বাধলে ছাড়ান পাওয়া কঠিন। চিল পড়লে কুটো-না নিয়ে কি রেহাই দেবে? এইসব শঙ্কার কথা ভাবতে ভাবতে ফাগুলাল ভয়ে শিউরে উঠল। গ্রামের বাড়ির পথে পা বাড়াতে সে আর ভরসা পেল না। যেখান থেকে আসছিল, সেই বেতড়ের দিকেই হাঁটা দিল।

পরের দিন সকালে গ্রাম সুতানুটিতে সে ফিরে এল।

ফাগুলালকে দেখে ঘনশ্যাম অবাক। কেননা, গ্রামে গেলে সে এত তাড়াতাড়ি ফিরে আসে না। কম পক্ষে চারদিন থাকে, কখনও কখনও সে ছুটি বাড়িয়ে দিন আট-দশও থাকে। তাছাড়া ফাগুলালকে কেমন যেন হতশ্রী দেখতে লাগছে। তার চোখে-মুখে উদ্বেগের চিহ্ন। রাতজাগা চেহারা।

'কী হল, দেশ থেকে আজই ফিরে এলে যে? নাকি দেশে যাওনি?'

'গিয়েছিলাম। কিন্তু থাকা গেল না।'

'সে কী? কী এমন পরিস্থিতি হল যে, থাকতে পারলে না?'

'গাঁয়ে মড়ক শুরু হয়েছে।'

'মড়ক?'

'হ্যাঁ, গাঁয়ে খুব ওলাওঠা হচ্ছে। বাড়িকে বাড়ি সাফ। তাই থাকতে ভরসা পেলাম না।'

ঘনশ্যাম ভ্রূ কুঞ্চিত করল। ফাগুলালের মুখের দিকে তাকিয়ে জরিপ করতে চেষ্টা করল যে, সে ঠিক সত্যিকথা বলছে কিনা! এখন শীতকাল। ওলাওঠা রোগের সময় এটা নয়। অথচ এই সময়েই বাড়িকে বাড়ি সাফ হয়ে যাচ্ছে এই মহামারীতে! ফাগুলালের কথায় ঘনশ্যামের খট্‌কা লাগল।

'তা তুমি যে ফিরে এসেছ, ভালই হয়েছে। গতকাল তুমি বাড়ি চলে যাওয়ার একটু পরেই বাতাসি খুঁজতে এসেছিল তোমাকে।'

'আমাকে?' ফাগুলাল বিস্ময়ে চোখ বড় বড় করল। 'বাতাসি আমাকে খুঁজতে এসেছিল? ঘনশ্যাম তুমি কি আমাকে রসিকতা করছ?'

'না, রসিকতা নয়। সত্যি।'

'ঠানদি তাকে আটকে দেয়নি?'

'জানলে হয়ত আটকে দিত। কিন্তু বাতাসি জানতে দেয়নি। লুকিয়ে এসেছিল।'

'তা সে কি কিছু বলেছে।'

'বলেছে। সে জানতে চাইল, তুমি 'হাতিদেহে'র কোন খোঁজ পেয়েছ কিনা!'

ফাগুলাল জিজ্ঞাসা করল, 'এছাড়া বাতাসি আর কিছু কথা বলেনি? জানতে চায়নি, আমি কেমন আছি। দেশের কিছু খবর আছে কিনা—এইসব!'

'না আর কিছু বলেনি।' ঘনশ্যাম আর কথা বাড়াল না। ফতুয়ার ওপর গামছাটা কাঁধে ফেলে আড়তের পথে পা বাড়াল।

ফাগুলাল হতাশ হয়ে চৌকির ওপর নিজেকে এলিয়ে দিল।

॥ চার ॥

হাটের চেহারাটা ক'মাসের ভেতরেই বেবাক বদলে গেল।

ব্যাপারিরা আসছে দূর-দূরান্তর থেকে। জঙ্গল সাফ করে বসতও তৈরী হচ্ছে। চারদিক ঘিরে যেন শুরু হয়ে গেছে কর্মব্যস্ততা।

জাহাজ ভিড়েছিল যে-কাছারির উত্তরে, সেই নিমগাছটিও যেন হঠাৎ বসন্তে প্রগলভ হয়ে উঠেছে। অজস্র ফুলে ফেটে পড়েছে গাছটি। এই ফুলেও যে হালকা মিষ্টি একটা গন্ধ আছে, তা গাছতলায় বসলে টের পাওয়া যায়। মধু নিমফুলেও জমে। সেই মধুর লোভে অবিরাম মৌমাছি যাওয়া-আসা করছে। শোনা যায় দিনভর গুন গুন শব্দ।

গাছের তলাটি মনোরম। ছায়া ছায়া। নদীর ওপর দিয়ে বয়ে আসছে সুশীতল বাতাস। কাঠের এক চৌকির ওপর গদি বিছিয়ে সাহেবকে এখানে হামেশাই দেখা যায় আড়তদারি করতে। পাশেই থাকে আলবোলা। ফরসিতে মৃদু টান দিতে দিতে সাহেব হিসেবের খাতায় চোখ বুলোয়। আলবোলায় শব্দ ওঠে গুড়ুক গুড়ুক। সাহেবের মনও উড়ুক্কু হয়। সাহেব স্বপ্ন দেখে বড় মহাজন হবার। মুতসুদ্দি আর বেনিয়ানে সাহেব যেন সদা পরিবৃত।

আড়তদারিতে বদ্রীদাসের অভিজ্ঞতা তেমন কিছু কম নয়। কিন্তু তা নিয়ে সাহেবদের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া যায় না। সাহেবদের কারবার অন্য রকমের। এদের অর্ধেকটা থাকে জলে, আর অর্ধেকটা থাকে ডাঙ্গায়। বেনেটোলার ঘাটের কাছে গঙ্গার বুকে নোঙ্গর ফেলে দাঁড়িয়ে আছে দু'দুখানা ইয়া বড় জাহাজ। জাহাজের উঁচু মাস্তুলে শাঁ শাঁ করে উড়ছে কোম্পানির নিশান। ছোট বড় বিশখানা নৌকো বেনেটোলার ঘাট থেকে মাল বোঝাই হয়ে চলে যাচ্ছে জাহাজের দিকে। জাহাজের খোলে হাজার হাজার মণ মাল বোঝাই হচ্ছে। এই সব মাল দেশ-দেশান্তর ঘুরে অকূল সমুদ্র পেরিয়ে একদিন গিয়ে পেঁছিবে সাদা সাহেবের দেশে। ব্যাপারটা ভাবতে গেলে রোমাঞ্চ লাগে বদ্রীদাসের। তা রোমাঞ্চ লাগুক, বদ্রীদাস কিন্তু এসব কথা ভাবে।

'বদলিদাস, তুমি কী দেখিতেছ ? জাহাজ ?'

'হ্যাঁ সাহেব, আমি অবাক হয়ে তোমাদের কাণ্ড-কারখানা দেখছি। আমাদের দেশে বজরা আছে, নৌকো আছে, কিন্তু এমন বিশাল একটা অট্টালিকা কখনও জলে ভাসতে দেখিনি। তোমরা বাপু অসম্ভবকেও সম্ভব করতে পার। আলাদিনের প্রদীপ বোধহয় তোমাদের জেবের ভেতর আছে।"

সাহেব হা-হা করে হাসে। ভারি প্রাণখোলা হাসি। মন মাতানো।

নিমতলা ছাড়িয়ে পূবদিকে বিঘে বিশ তিরিশেক জমি সাফ করা হয়েছে। জঙ্গল কেটে চৌরস করা হয়েছে মাটি। ভারি ভারি দুরমুশ পিটিয়ে ভরাট মাটি শক্ত করা হয়েছে। তারপর ঐ মাটির ওপর চকবন্দী করে অনেকগুলো চালাঘর বানানো হয়েছে। সাহেবরা ঘুপসি ঘাপসি ঘর পছন্দ করে না। সুতরাং ঘরগুলো বেশ প্রশস্ত। মাথার দিকটা বেশ খাড়াই। আলো-বাতাস-খোলা ঘর। এই ঘরগুলির ভেতর সব থেকে যেটি বড়, তাকে বানানো হয়েছে গুদাম ঘর। গুদামে অবশ্য শোরা ঢোকে না, এখানে ঢোকে লবঙ্গ, দারুচিনি, মিছরি, চাল, গম ইত্যাদি। এই ক'দিন আগে মালদা থেকে এসে পেঁাছেছে দু'হাজার মণ গম, ছয় হাজার মণ চাল, দুশো মণ মাখন, আর কোম্পানির আস্তাবলের ঘোড়ার জন্য দুশো মণ ঘোড়ার দানা। এ ছাড়াও দুশো মণ খাবার তেল কেনা হয়েছে মাদ্রাজের গড় সেণ্ট জর্জে পাঠিয়ে দেবার জন্য। গুদামঘরটি মালে ঠাসাঠাসি।

গুদাম ঘরের ঠিক পাশেই হল খাবার ঘর। এই খাবার ঘরেই সকালের 'ছোট হাজারি' সকলের জন্য পরিবেশন করা হয়। এই ঘরেই দেওয়া হয় দুপুরের বড় হাজারি। আর সন্ধ্যার লাঞ্চ। ভাদ্রমাসে এই বৃষ্টিঝরা দিনে চার্ণক যখন বেনেটোলা ঘাটের কোলে জাহাজ বেঁধেছিল, তখন খুব বেশি লোক সাহেবের সঙ্গে আসেনি। কেননা এইরকম একটা পাণ্ডববর্জিত জায়গায় বেশি লোক আনবার অসুবিধা ছিল। অনিশ্চিত ছিল মাথা গোঁজবার জায়গাটির পর্যন্ত। তা সেরকম অবস্থার ভেতর পড়তেও হয়েছিল। কয়েক মাস আগে যে-চালাঘরগুলি চার্ণক রেখে গিয়েছিল, কারা যেন সেগুলি খুলে নিয়ে চলে গেছে। বাকি যা ছিল, সব ভাঙা। লণ্ডভণ্ড। ডাঙায় নেমে মাথা গোঁজবার ঠাঁইটুকু পর্যন্ত মেলেনি। উঃ সে কী অসহায় অবস্থা!

সাহেবের সঙ্গে স্ত্রী ছিল। মেয়েরাও ছিল। কাউন্সিলের সদস্যরাও ছিলেন। এঁদের ছেলেবৌও ছিল। আরও ছিল কয়েকজন ফ্যাক্টর এবং তিরিশজন সৈনিক। তুমুল বৃষ্টির ভেতর কয়েকজন মাত্র সৈনিক নিয়ে চার্ণক সুতানুটির মাটিতে পা রেখেছিল। সুতানুটির বিশ্রী কাদা সাহেবের পায়ে জড়িয়ে ধরেছিল। ঝড়ের বেগে আন্দোলিত নিমগাছটি তার কয়েকটি মোটা মোটা ডাল মর্মর শব্দে মাটিতে ভেঙে ফেলে দিয়ে স্বাগত জানিয়েছিল। সুতানুটির আকাশ-চেরা বিদ্যুৎ ঝিলিক দিয়ে জানিয়েছিল সংবর্ধনা। আশে পাশে কোথাও বাজ পড়েছিল। সে বাজ কামানের তোপের থেকেও ছিল গমগমে আর ভারি।

এ ধরনের সংবর্ধনায় সাহেবের সাহসী সৈন্যরা পর্যন্ত বেজায় ভয় পেয়ে গিয়েছিল। সাহেবও কাত। সকলেই ঘাবড়ে গিয়েছিল। সৈনিকদের সঙ্গে সাহেবও দৌড়ে গিয়ে জাহাজে আশ্রয় নিয়েছিল।

বাংলাদেশের এই বর্ষার সঙ্গে তেমন পরিচয় ছিল না সাহেবদের। তবে একেবারে অপরিচিতও নয় সাহেব। হুগলিতে থাকার সময় বর্ষার এই বিদিকিচ্ছিরি রূপটা সাহেব প্রথম দেখে। পরে উলুবেড়িয়া থাকার সময় এই জঙ্গলে বর্ষার সঙ্গে আবার নতুন করে

মোকাবিলা করতে হয়। চারদিকে উলুগাছের জঙ্গল। অবিরাম বৃষ্টি। ভিজে কাদাভরা পথ। খাবারের সঞ্চয় ফুরিয়ে আসে। অথচ খাবার সংগ্রহের উপায় নেই। অসুস্থ হলে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা যায় না। কী ভয়ঙ্কর অসহায় অবস্থা। দিনের পর দিন কেবল আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকা। কিন্তু সুতানুটির ঐ প্রথম রাত্তিরের সঙ্গে কোন অবস্থারই যেন তুলনা হয় না। তবে সাহেব এবার তৈরি হয়ে এসেছিল। ছিল প্রস্তুত। পরিস্থিতি যত প্রতিকূলই হোক না কেন, পরাজয় বরণ করা চলবে না। খাওয়া-পরার জন্য যাতে অসুবিধেতে পড়তে না হয়, তার জন্যে ছিল জাহাজ ভর্তি রসদ। চালাঘর যদি না মেলে, ডাঙায় বাস করবার জন্য ছিল বড় তাঁবু। আর ছিল জাহাজ-ভরা সওদা, যা হাটে বিক্রি করতে পারলে হাতে হাতে মিলবে নগদ টাকা। সেগুলি কেবল হাটে ফেলবার অপেক্ষামাত্র।

এছাড়াও বাড়তি যে হাতিয়ারটি সাহেব সঙ্গে করে এনেছিল তা হল নবাব ইব্রাহিম খাঁয়ের 'হুকুমনামা'। এই হুকুমনামার জোরে ফিরিঙ্গি ইংরেজরা বার্ষিক তিন হাজার টাকা খাজনার বিনিময়ে এই বাংলা মুলুকে বাণিজ্য করতে পারবে। নবাবের সেরেস্তায় খাজনাটা নিয়মিত জমা দিতে পারলে উপস্থিত নিশ্চিন্দি।

সাহেব নতুন যে-সব ঘর বানাল, তাতে একটি ঘর আলাদা করে রাখা হল কাপড় বাছাই করবার জন্য। মসলিন আর তাঁতের কোরা কাপড় যেমন সেখানে বাছাই করা চলছিল, তেমনি চলছিল রেশমি কাপড়ের ভালো-মন্দ বিচার। কোম্পানির কর্ম-চারীদের জন্য বিশেষ একটা ঘর পৃথক করে দেওয়া হল। এইসঙ্গে জুড়ে দেওয়া হল চৌকিদারদের ছোট ছোট কুঠরি। এ চৌকিদাররা বেশির ভাগই হল দেশি লোক।

বদ্রীদাস সাহেবের কাছে অনেক দেশি লোকের চাকরি সুপারিশ করল। অনেককেই সাহেব তাঁর কাজে নিলেন, তবে কড়া হুকুম জারি করলেন যে, কাজে কামাই করা চলবে না। তবে সপ্তাহে সপ্তাহে একদিন করে ছুটি মিলবে। ছুটি মিলবে পালে পার্বণেও। কিন্তু ইচ্ছে করে অকারণে ডুব দিলে জরিমানা হবে। বিনা নোটিশে গুরুতর কারণে পাঁচদিন পর্যন্ত ছুটি মকুব। পাঁচ দিনের আগে এলে চারআনা বকশিস। আর তার চেয়ে দেরি হলে পিঠে পড়বে চাবুক।

চার্ণক সাহেবের হাতের চাবুক মাঝে মাঝে শাঁই শাঁই করে ওঠে। সাহেবের তখন আরেক চেহারা। সাহেবের মাথার সোনালি চুল তখন খাড়া হয়ে ওঠে। নীল চোখে বিজলি ঝলকায়। সারা অঙ্গ উত্তেজনায় লাল হয়ে ওঠে। মুখ থেকে তখন অবিরাম বদ-জবান হুড়হুড় করে বেরিয়ে আসে। সে ভাষা বদ্রীদাস বোঝে না। উত্তেজিত সাহেবকে সামলাবার অনুমাত্র চেষ্টা করে না সে। স্রেফ চুপচাপ দাঁড়িয়ে সাহেবকে সে খুঁতিয়ে দেখতে চেষ্টা করে। সাহেবের মেজাজ জরিপ করতে চেষ্টা করে। চেষ্টা করে সে চার্ণককে বুঝতে।

ঘোড়ায় চড়ার বিদ্যেটা বদ্রীদাসের জানা ছিল না। চার্ণকের উৎসাহে সে ঘোড়ায় চড়ার বিদ্যেটা রপ্ত করে ফেলল। ইদানীং স্থলপথে যেতে হলে সে কোম্পানির ঘোড়ায় চড়েই যায়। ফিরিঙ্গি ইংরেজরা আসবার পর থেকে সুতানুটি গ্রামটিও দু'ভাগে ভাগ

হয়ে গেছে। একভাগে রয়েছে হাটখোলা সুতানুটি, আরেকভাগে কলকাতা সুতানুটি। চার্ণক সাহেব হাটখোলা সুতানুটিতে থাকে না। থাকে কলকাতা-সুতানুটিতে। জায়গাটি বেশ খানিকটা উঁচু। হাটের থেকে দূরে। সেখানে ভারি সুন্দর একটি কুঠি বানিয়েছে সাহেব। তবে ঐ চালাঘর। ঘরগুলি খাড়াই। প্রশস্ত। আলোবাতাস খেলে। কিন্তু দেওয়াল মাটির।

বদ্রীদাস একদিন সবিনয়ে বলেছিল, 'সাহেব, একটা কথা বলব, যদি অবশ্য রাগ না কর।'

'বল, বল। একটা কেন, হাজারটা কথা তুমি বলিতে পার। রাগ করিব না।'

'সাহেব, তোমার নিজের কুঠিটা পাকা করে নাও। তেমন বেশি খরচ পড়বে না। এক টাকায় দু হাজার ইঁট। চুনের দামও সস্তা। হাজার পাঁচ সাত টাকা খরচ করলে খাসা বাড়ি হয়ে যাবে।'

'তা যাবে। কিন্তু আমি করিব না।'

'তুমি তাহলে কোম্পানির টাকা বাঁচাতে চাও?'

'না, বদ্রীদাস, তা নহে। সুতানুটির মাটিতে কোম্পানির অধিকার এখনও সাব্যস্ত হয় নাই। এ কার জায়গায় অট্টালিকা বানাইব?'

'তা ইব্রাহিম খাঁ শুনেছি তোমার খুব পেয়ারের লোক। তিনি কি আর তোমাদের জন্য একটু মাটির ব্যবস্থা করবেন না? সুতানুটির মাটি নিশ্চয়ই তিনি তোমাদের জন্য বরাদ্দ করবেন। শেঠ-বসাকরাও তোমাদের চান। সাবর্ণ চৌধুরিরাও চান হাটটা বাড়ুক, তা হলে তাঁদের খাজনার পরিমাণটা বাড়বে।'

'তা জানি। সবাই চায় আমরা ব্যবসা করি। নবাব খাঁ সাহেবও চান—হ্যাঁ ঐ লোকটা খানদানি বটে।'

'তোমরা চাও না?'

'অবশ্যই চাই। নইলে এভাবে কেন আমি এদেশে আসিব। বদ্রীদাস, কোম্পানির ট্রেডটা যদি আমি দাঁড় করাইতে না পারি, আমার জীবনটা বরবাদ হয়ে যাবে। সুতানুটি না দাঁড়াইলে, আমি দাঁড়াইব না।

বদ্রী হাসল, 'সাহেব, তুমি যা বললে, ও কথার দু'পিঠই সত্যি। তুমি যদি দাঁড়াতে না পার, তাহলে এই গ্রাম সুতানুটিও দাঁড়াতে পারবে না। বিদেশিদের ঠেসু পায়নি বলে বেতড়ের হাটটা নষ্ট হয়ে গেল! নইলে বেতড়ের হাটের কি অমন দশা হয়? হার্মাদরা যদি তোমাদের মতো হত, তাহলে কী হতে পারত ভাব দেখি? বেতড় ছেড়ে শেঠ-বসাকরাও আসত না। আর আমরাও এই সুতানুটিতে বসত করতাম না।'

'ওহ হো! ঠিক বলিয়াছ বদ্রীদাস! 'ব্যাটর' খাসা জায়গা। আমরা নিশ্চয় ওখানে যাইতে পারিতাম। তবে কিনা, আমরা বিবাদ চাই না।'

চার্ণক খোস মেজাজে থাকলে এ ধরনের গল্প মেলাই জমে উঠত। বদ্রীদাসও সাহেবের সঙ্গে এই ধরনের গল্প করে অনেক কিছু শিখে নিত। মেলা অজানা খবর

জানতে পারত। তাছাড়াও এদের সঙ্গে এই ধরনের আলোচনা থেকে ব্যবসার অনেক অন্ধিসন্ধিও তার জানা হয়ে গিয়েছিল। বিদেশিদের ব্যবসার ধরনটাই একেবারে আলাদা। এরা অকারণে যে মাল জমা করে রাখে না, তা সে নিজের চোখের সামনেই দেখেছে। একই সঙ্গে গুদাম সাফ করা এবং গুদাম বোঝাই করাই হল ওদের ব্যবসার কৌশল। এরা জাহাজের মহাজন। আদার কারবারি নয়। গো-যান বা নৌকোরও নয়। তাই ধীর গতিতে ওদের কেনা-বেচা পোষায় না। ওদের ব্যবসা চলে অকূল দরিয়ায়, কূল খুঁজতে খুঁজতে। চলে দ্রুত। মাদ্রাজ থেকে আসবার সময় চার্ণক সাহেব জাহাজ ভরে এনেছিল মেলা বিলেতি মাল। এ মালের ভেতর ছিল চওড়া কাপড়, টিন, ফটকিরি আর নানা ধরনের টুকিটাকি জিনিস। তা সাহেব সেগুলি মওকা বুঝে বাজারে ছাড়তে চেয়েছিল। কিন্তু পারেনি। কেননা, বাজার-জুড়ে সে সময় সাহেবের পাওনাদারেরা ওৎ পেতে বসে ছিল। গতবার হঠাৎ চলে যাওয়ায় অনেকের পাওনা টাকা পরিশোধ করা হয়নি। এই পরিস্থিতিতে মাল ছাড়লে ধার শোধ হতে পারে, কিন্তু নগদ টাকা মিলবে না। অথচ নগদ টাকাটাই সে সময় চার্ণক সাহেবের কাছে ছিল সব থেকে জরুরি। সাহেব কিংকর্তব্যবিমূঢ়। ছটফট করছে, অথচ কিছু করতে ভরসা পাচ্ছে না।

বদ্রী বলেছিল, 'সাহেব, তুমি পাওনাদারদের টাকাটা তোমার মাল দিয়ে চুকিয়ে দাও। পরে মহাজনদের কাছ থেকে তুমি সুবিধামত কর্জ নেবে।'

'না।' পায়চারি থামিয়ে সাহেব গর্জে উঠল।

'তাহলে তুমি কী করবে ?'

'ও মাল আমি ঐ জাহাজেই সেণ্ট-জর্জ কেল্লায় ফেরত পাঠাইব।'

'তাতে তোমার লাভ ? পাওনাদেররা যদি এখন তোমাকে না ছাড়ে ? তারা যদি তোমার কাছে মাল না বেচে ?'

'বেচিবে। আমি তাহাদের কাছ হইতে প্রচুর মাল লইব। খেপে খেপে পাওনা শোধ হবে। একেবারে নয়। খেপে খেপে হইলে, তারা আমাকে মাল যোগান দিতে আগ্রহী থাকিবে। আর আমারও পুঁজিতে টান পড়িবে না।'

বদ্রী সেবার চার্ণক সাহেবকে মনে মনে নমস্কার করে অনেকবার চিনতে চেষ্টা করেছিল। ব্যবসাদারিতে সাহেব যে কতখানি ঘুন, তা এই একটি সিদ্ধান্তেই চেনা গেল। মাছের তেলে মাছ ভাজা হয়ত একেই বলে। দেনায় যে ভয় পেতে নেই, এটা তার আরেক নিদর্শন। ব্যবসা চালু রেখে ধার শোধ করাটাই বোধহয় শ্রেষ্ঠ ব্যবসায়ী কেতা।

এই ভাবেই দিন চলছিল। চলছিল মাসের পর মাস। ব্যবসার খুঁটিনাটি বিষয়ে মাথা ঘামাবার দরকার ছিল না। তার মূল কাজ ছিল সাহেব চার্ণকের হয়ে নানা ধরনের মাল জোগাড় করা। তাকে যেতে হবে কাঁহা কাঁহা মুলুক। যেতে হবে মাকুন্দা, বাঘমারী, ট্যাংরা, ধলন্দা, শেখপারা, তিলজলা, চৌবাঘা, ইটাঁন, গোবরা ইত্যাদি নানান জায়গায়। যেতে হবে কালীঘাটের দিকেও। আমিরাবাদ আর পাইকন পরগনার

ভেতরেই অবশ্য বেশি ঘোরাফেরা করতে হত। স্থলে হলে বদ্রীদাস ঘোড়ায় চড়েই এ সব জায়গায় যেত। জলে হলে নৌকোতে। খালবিল ভরা কলকাতা-গোবিন্দপুরে নৌকো করে যাওয়াটাই ছিল সুবিধের।

তা বদ্রীদাস এ সময় সুখেই দিন কাটাচ্ছিল। প্রতিদিন তার সিন্দুকটা রুপোর টাকায় ভরে উঠছিল। মা লক্ষ্মী যেন ছপ্পর ভরে তাকে ধন দান করছেন। বাড়িতে খাওয়া-দাওয়াটাও বেশ ভালই হচ্ছে। মাকে রাঁধতে দেয় না বাতাসি। সে নিজেই রান্না করে। খাসা রাঁধে বাপু মেয়েটা। আর মেয়েটার পয়ও আছে। চার্ণক সাহেব যেদিন সুতানুটির মাটিতে পা রেখেছে, ঠিক সেই দিনই তার সংসারে ঢুকেছে বাতাসি। বাতাসির হাওয়া ভাল। মেয়েটি ভারি মায়াবী। মা দাক্ষায়নীকে একেবারে বশ করে ফেলেছে। বাতাসিকে মা চোখের আড়াল করতে পারেন না।

'অ বদ্রী, তোর কি চোখ নেই রে বাছা? তুই বাপু দিনে দিনে অর্থ পিশাচ হয়ে যাচ্ছিস!' একদিন ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন মা।

'কেন মা? আমি আবার কী করলাম? কী তোমার দেখছি না বল?'

'আমার জন্য বলছি না বাবা! বলছি এই আবাগীর মেয়েটির জন্য।'

'কেন, কী করতে হবে বল!'

'সংসারে একটা ঝি দরকার। বাসন মেজে মেজে বাছার আমার হাতে কড়া পড়ে গেল! কচি মেয়ে! পেটের দায়ে কাজে এসেছে। তাই বলে কি মেয়েটাকে অমানুষের মত খাটাবি? একটা ঝি জোগাড় করে দে বাপু! বাতাসিকে আমি বাসন-কোসন মাজতে দেব না। ঘরদোর ঝাড়ামোছাও ও করতে পারবে না। ও আমার সেবা করবে, আর রাঁধবে।'

মায়ের হুকুম। ঝি একটা তাই জোগাড় করতে হল। তবে ছি-মাগীটা তেমন সুবিধার নয়। কাজকর্ম ভালই করছে। কিন্তু সে কেমন যেন একটু ব্যাপিকা। নামটাও খুব বাহারে। নয়নতারা। নয়নতারা বলেই বোধহয় তার চোখের তারা দুটো একটু বেশি ঘোরে। মেয়েটি জাতিতে নাপিত। সুতরাং জলচল। মাকে সর্বদাই সে 'মা মা' করছে। আর বদ্রীদাস হয়েছে 'দাদাবাবু।' মেয়েটি স্বামী পরিত্যক্তা। চৌবাঘা থেকে জোগাড় করে এনেছে একে বদ্রীদাস।

'দেখ বাপু নয়নতারা মেয়েটা তেমন সুবিধের নয়। বড় বেশি বাচাল।' মা একদিন অনুযোগ করল।

'তা বাচাল হোক। সংসারের কাজকর্ম ঠিক করে তো?'

'সে সব ঠিক আছে। কিন্তু—'

'আবার কিন্তু কেন?'

'আমার বাতাসির মতো নয়।'

'সে জানি। কিন্তু বাতাসির মতো মেয়ে তুমি হাজারে একটাও পাবে না। সুতরাং বাতাসির উপমা না দেওয়াই ভাল।'

কথাটা একটু আড়ালেই হচ্ছিল। কিন্তু দরজার ওপারে বাতাসি যে কখন এসে

দাঁড়িয়েছিল, তা খেয়াল করেনি বদ্রীদাস। দরজার দিকে তাকাতেই চোখাচোখি হয়ে গেল। বাতাসি ধীরে ধীরে সরে গেল। বাতাসির এই নীরবতা, এই সযত্ন আত্ম-গোপনের প্রয়াস বদ্রীদাসকে কেমন যেন কৌতূহলী করে তোলে। মেয়েদের সম্পর্কে বদ্রী বরাবরই উদাসীন। তাদের ভালবাসা কেমন, তাদের শরীরের রহস্য পুরুষকে কতখানি প্ররোচিত করে, কিসের টানে পুরুষেরা মেয়েদের পিছনে ঘুরঘুর করে, সেসব কোনওদিন সে ভেবে দেখেনি। ভেবে না দেখার কারণ হল, কোন মেয়ের জন্যই সে আজও টান অনুভব করেনি।

তবে ইদানীং সে নিজের ভেতর আলাদা একটা সুর অনুভব করছে। তার মন উচাটন করার কারণ হয়েছে বাতাসি। সেই যে স্নিগ্ধ দীপালোকে ঝড়বৃষ্টির রাত্রে সে বাতাসিকে প্রথম দেখেছিল, বাতাসির সেই লজ্জানম্র ভীরু চাহনি তার মনে খোদাই হয়ে গেছে। অপ্রত্যাশিত সেই দেখা। অথচ কী মিষ্টি। বাতাসি কি তার দাসী হতে চেয়েছিল? নতুবা সে বাতাসির পরিবর্তে 'দাসী' কথাটি উচ্চারণ করেছিল কেন? নাকি ব্যাপারটা একেবারেই বিপরীত? বদ্রী নিজেই কী মনে মনে এইরকম একটি 'দাসী' চেয়েছিল! তাই 'বাতাসি'কে সে 'দাসী' শুনেছিল!

মাস খানেক পরের কথা। বদ্রী পুজোয় বসেছিল। প্রসন্ন সকাল। ভারি ঝকঝকে রোদ্দুর দেখা দিয়েছে বাইরে। মাটিতে পোঁতা ত্রিশূলের গায়ে তেল-সিঁদুরের প্রলেপ দিয়ে মন্ত্র পাঠ করছিল বদ্রী। মন্ত্র পাঠ করতে করতে সেই গমগমে কণ্ঠস্বরটা ফিরে পেয়ে সেদিন ভারি সন্তুষ্ট হল সে। মাটির বেদির কোলে একটি কাঠের পুষ্পপাত্র রাখা ছিল। ছোট্ট পুষ্পপাত্র। তার নিচে কাঠের ছোট্ট একটি বাক্স। এই বাক্সের ভেতর তার মন্ত্রপাঠের পুঁথি রাখা থাকে। আজও আছে। ইদানীং পাঠের জন্য পুঁথির দরকার হয় না বলে, বাক্সটা সে খোলে না। আজ অনেকদিন পরে সে বাক্সটা খুলল। ঝেড়ে মুছে রাখবার জন্য পুঁথিটিও বার করল। কিন্তু পুঁথি বার করতে গিয়ে সে অবাক। পুঁথির সঙ্গে ঘরের মেঝেতে গড়িয়ে পড়ল আটটি রুপোর টাকা।

টাকা! এতগুলি টাকা কোথা থেকে এল? আকাশ থেকে নাকি!

টাকার খবর পেয়ে মা বললেন, 'তাই তো। ওখানে টাকা কী করে গেল? কে রাখলে ওখানে টাকা? এ নির্ঘাৎ বাতাসির কাজ।'

তা শেষমেশ বাতাসিই ধরা পড়ল। এগুলি হল তাকে দেওয়া সেই মাস মাহিনার টাকা। এ পর্যন্ত নিজের মাইনে থেকে সে একটি টাকাও খরচ করেনি। এমনকি নিজের কাছেও রাখেনি। তার নিজের অর্জিত টাকাগুলি দেবতার কাছে কেবল নীরবে পৌঁছে দিয়েছে। মা বললেন, 'তুই কেমনধারা মেয়েরে বাতাসি? তুই আমাদের কাছ থেকে একটা টাকাও নিবি না? এ দাক্ষায়নী বামনি এমন মেয়ে জীবনে দেখেনি! তোর কী হয়েছে বল তো?'

বদ্রীদাসও কম অবাক নয়। সে টাকার মূল্য বোঝে। তাই সে অবাক হয়ে মাকে জিজ্ঞাসা করল; 'মা, বাতাসী কী চায় বলো তো?'

'জানি না বাপু। ঐ আবাগীর বেটিই জানে।'

নয়নতারা বলল ; 'কী জানি বাবা ! পয়সার জন্যই চাকরি করতে আসা। গতর খরচ করা। তা সে পয়সা কেউ কি এভাবে বিলিয়ে দেয় ?' নয়নতারার কাছে বাতাসির এই আচরণ রীতিমত হেঁয়ালি বলে মনে হল। কেবল হেঁয়ালি নয়, সে এর ভেতর কেমন যেন এক রহস্যের গন্ধও পেল। বাতাসি তার থেকে যে বয়সে ছোট, সেটা বুঝতে তার অসুবিধা হয় না। কিন্তু মেয়েটা অমন নীরব কেন ? কেনই বা টাকা-পয়সা সম্পর্কে এত উদাসীন ? বয়সে বাতাসি ছোট হলেও নয়নতারা তাকে দিদি বলেই সম্বোধন করে। একদিন বাতাসিকে একান্তে পেয়ে নয়নতারা বলল ঃ 'বাতাসি দিদি, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই। যদি সত্যি কথা বলে জবাব দাও, তা হলে জিজ্ঞাসা করি।'

বাতাসি কোনও কথা বলল না। মৃদু হাসল। যে হাসি নিজেকে প্রকাশ করার থেকে গোপন করে বেশি, সেই হাসি।

'না না, হাসলে হবে না। তোমাকে দু'একটা কথা বলতেই হবে। নইলে ফাগুলালকে গিয়ে আমি জিজ্ঞাসা করব।'

'ফাগুলাল কেন ? সে আবার কী বলবে ? সে আমার সম্পর্কে জানে কী ?'

'বাঃ ! সে তোমাকে নিজের দেশ থেকে এখানে আনেনি ? সে ছাড়া তোমার বিষয়ে আর কে বেশি জানে ?'

বাতাসি গম্ভীর হয়ে গেল। কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বেশ দৃঢ়ভাবে অথচ স্পষ্ট উচ্চারণে বলল ঃ 'তাকেই যা জিজ্ঞাসা করবার, জিজ্ঞাসা কর। আমি কিছু জানি না। তাছাড়া আমি চাই না যে, তুমি আমাকে নিয়ে কথা বল।'

'আহা ! এতে দোষের কী আছে ? তুমি যদি কিছু গোপন করে রাখ, সে কথা প্রকাশ করে দিলে কি দোষের হয় ? অত দেমাক ভাল নয় !'

দুপুরের দিকে ফাগুলাল নিয়মিত নিজের ঘরটিতে ফিরে আসে দুপুরের খাবার জন্য। এ সময় আড়ত বন্ধ থাকে। ইদানীং ঘনশ্যাম আর এ আড়তে বসে না। সে কোম্পানির লোক হয়ে গিয়েছে। সুতরাং বদ্রীদাসের এই আড়তটুকুর দেখভালের সব দায়িত্ব ফাগুলালের ওপর বর্তেছে। সকাল সাত-সাড়ে সাতটার সময় সে আড়তে চলে যায়। কোম্পানির জাহাজে এ সময় ভোঁ বাজে। দুপুরেও ওদের জাহাজে আবার ভোঁ বাজে। ঐ ভোঁ শুনে সে প্রতিদিন খেতে আসে। দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পর সে খানিকটা গড়িয়ে নেয়। তারপর চাঁপা গাছের ছায়াটা দরজার কাছে পড়লেই সে বিছানা ছেড়ে উঠে বসে। পোশাক বদল করে। আবার রওনা দেয় আড়তের দিকে। এ তার প্রতিদিনের ব্যাপার। নিত্যদিনের অভ্যাস।

ফাগুলাল ইদানীং একটু মুষড়ে পড়েছে। অনেক চেষ্টা করেও সে বাতাসির সঙ্গে আর যোগাযোগ করতে পারেনি। দু'একটি কথা খুলে বলবার সুযোগ পর্যন্ত সে পায়নি। অথচ সে থাকে তার এত কাছে। ফাগুলালকে দেখলেই বাতাসি কেমন যেন পালিয়ে যায়। কিছুতেই সে ফাগুলালের মুখোমুখি হতে চায় না। ভাবটা

এমন, যেন ফাগুলাল বাতাসিকে গপ্‌ করে গিলে ফেলবে। বাতাসি বাইরে অবশ্য কোথাও যায় না। বাড়িতেই সে থাকে। তবে প্রতিদিন সকালে সে সামনের পুকুরটায় চান করতে যায়। এই চান করাতেও সে বেশি সময় খরচ করে না। ঝট্‌পট্‌ কয়েকটা ডুব দিয়ে সারা গায়ে কাপড় জড়িয়ে উঠে আসে বাতাসি। ভিজে কাপড়ে বাতাসির আশ্চর্য এক সিক্ত সৌন্দর্য ফুটে ওঠে। এই সৌন্দর্যের দিকে তাকিয়ে ফাগুলাল দীর্ঘশ্বাস ফেলে। সন্তানটিতে আসবার পরে বাতাসি আরও সুন্দরী হয়েছে। হয়েছে আরও লাবণ্যময়ী। যৌবনের যুগল ঐশ্বর্য আরও পুরুষ্ট হয়েছে। ফাগুলাল ভাবে, একবার যদি সে বাতাসিকে বুকে জড়িয়ে ধরতে পারত! অন্ততঃ একবার, তাহলে নিজেকে সে ধন্য মনে করত।

বাতাসির সুখের বাসাটি আগে হলে ফাগুলাল অনায়াসেই ভেঙে দিতে পারত। হাটের মাঝে হাঁড়ি ভাঙতে পারা তার কাছে কঠিন নয়। দাক্ষায়নী বামনিকেও খেপিয়ে তোলা অসম্ভব ছিল না। কিন্তু কাল করেছে সেই পীরপুকুরের ফৌজদারী উৎপাত। ফৌজদারের সেপাইরা যদি কোম্পানির কাছে তার নামে হুলিয়া পাঠিয়ে দেয়, তখনই বিপদ ঘনিয়ে আসবে। স্রেফ এই কারণেই ফাগুলাল ইদানীং চুপচাপ বসে আছে। নইলে সে এত দিনে বাতাসিকে নিজের কাছে ছিনিয়ে আনত। কোন বাধাকেই সে বাধা বলে মনে করত না।

দরজাটা খোলাই ছিল। দাওয়ার নিচে কার যেন পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। সেই শব্দ ধীরে ধীরে সিঁড়ি ভেঙে উঠে এল দাওয়ায়। এই ঝাঁ ঝাঁ দুপুরে এদিকে কেউ আসে না। চারদিক সুনসান্‌। দরজার কাছে শব্দটা হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল থমকে। ফাগুলাল চিত হয়ে শুয়েছিল বিছানার ওপর। তাকিয়েছিল খড়ের চালের মাচাটার দিকে। সে কৌতূহলী হল। কে উঠে এল? গোরু না ছাগল? নাকি কাঠবেড়ালি?

'বাইরে তুমি কে দাঁড়িয়ে? ভেতরে এস।' বিছানার ওপর ধড়মড় করে উঠে বসল ফাগুলাল। 'নয়নতারা। তুমি! কী ব্যাপার?'

নয়নতারা তার পিঠের আঁচলটা সামনের দিকে যথাসম্ভব টেনে বলল: 'হ্যাঁগো, দাদাবাবু, আমি।'

ফাগুলাল বহুবার দেখেছে নয়নতারাকে। তবে দূর থেকেই দেখেছে। মেয়েটি যুবতী। এ ধরনের যুবতী মেয়ের সঙ্গে কথা বলার কেতা গৃহস্থ বাড়িতে নেই। কথা বললেই পাঁচ জনে সন্দেহ করে। সন্দেহ করে যে, খারাপ সম্পর্ক আছে। এ ধরনের যুবতীর সঙ্গে আজও ফাগুলালের কথা বলবার তেমন সুযোগ হয়নি। সুতরাং নয়নতারার সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে বেশ একটু অস্বস্তি বোধ করল ফাগুলাল। অনভ্যাস হয়ত একেই বলে।

'তা নয়নতারা, হঠাৎ তুমি আমার কাছে চলে এলে যে। কেউ পাঠাল বুঝি?'

'না কেউ আমাকে পাঠায়নি। আমি নিজেই এলাম।'

'নিজে? স্বেচ্ছায়? অবাক করলে তুমি? কাউকে না বলে চলে এসেছ? কী সর্বনাশ?'

'অত ভয় খাচ্ছেন কেন ? আমি কি রাক্ষুসি নাকি ?'

'তুমি যে এখানে এসেছ, সে খবর কেউ জানে ?'

'না।'

'না ?' ককিয়ে উঠল ফাগুলাল।

ফাগুলাল এবরে একটু গম্ভীর হল। বুঝতে পারল যে, নয়নতারা মেয়েটি বাতাসির মত লজ্জাশীলা নয়। বরং সে একেবারেই বিপরীত। বেপরোয়া। কিছু একটা মতলব নিয়ে সে এখানে এসেছে। তা মতলবটা যে কী, তা ধীরে-সুস্থে শুনে নেওয়া যাক। ফাগুলাল কৌতুহলী হল।

'দাদাবাবু, আপনি উদবিগ্ন হবেন না। আমি সবদিক আড়াল করে লুকিয়ে লুকিয়ে এখানে এসেছি। কেউ টের পাবে না।'

'বেশতো, কেউ না হয় টের পেল না। কিন্তু তুমি আমার কাছে কেন এসেছ, তা খুলে বল।'

'আমি বাতাসির জন্য আপনার কাছে দরবার করতে এসেছি।'

'বাতাসির জন্যে ?' অবাক হয়ে গেল ফাগুলাল। 'তা তার দরবার সেই তো করতে পারত। তুমি কেন ?'

'সে এখানে আসতে ভয় পায়।'

'বাতাসি ভয় পায়। তুমি পাও না ?'

'না।'

'তা বাতাসি কী চায় ? তার জন্য কিসের দরবার।"

'সে নিজের গ্রামে ফিরে যেতে চায়।'

'তা যাক না। তারজন্য আমাকে কী করতে হবে ?'

'সে যে আপনাকে ছাড়া যাবে না। হাজার হোক, আপনার সঙ্গে তার একটা আশনাই ছিল। কে কি আপনাকে ছাড়া যেতে পারে ?'

ফাগুলাল একথাগুলির ওপর চট্ করে মন্তব্য করল না। সে গভীরভাবে নয়নতারার মুখের দিকে তাকাল। তার বুঝতে অসুবিধা হল না যে, নয়নতারা সব কথাগুলিই বানিয়ে বানিয়ে বলে চলেছে। এর ভেতর এক কণা সত্যি নেই। বাতাসিকে ফাগুলাল জানে। বাতাসি যে ঐ ধরনের কথা বলতে পারে না, তা তার থেকে আর বেশি কে জানে ? কিন্তু নয়নতারা এমন ডাহা মিথ্যে বলে চলেছে কেন ? এর পিছনে কি কোনও মতলব আছে ? নয়নতারা কি ফৌজদারের জন্য খবর সংগ্রহ করতে এসেছে ? নয়নতারার ওপর ফাগুলালের বেজায় রাগ হয়ে গেল। তবে সে-রাগ বাইরে প্রকাশ করল না ফাগুলাল। বরং সে মৃদু মৃদু হেসে তাকে আস্কারা দিল।

'কী হল দাদাবাবু, আপনি কি বাতাসির ওপর রাগ করেছেন। তার জন্য কিছু করবেন না ?'

'কেন করব না ?' ফাগুলাল যে বাতাসির জন্য অনেক কিছুই করতে প্রস্তুত সেরকম একটা ভাব দেখাল। বলল : 'দিনকতক হল আমার শরীরটা বেজায় খারাপ।

জ্বর জ্বর ভাব। শরীরে তেমন বল পাচ্ছি না। একটু সুস্থ হয়ে নি, তারপর কিছু একটা করব।'

এবার নয়নতারা দরজার কাছ থেকে সরে এসে ফাগুলালের বিছানার একপাশে বসল। বলল 'দাদাবাবু, তোমার যে এমন শরীর খারাপ, কারোকে বলনি তো?'

'কাকে আর বলব, নয়নতারা! এ সুতানুটিতে আমার কে আছে বল! আমি একা থাকি। অসুস্থ হলেও একা।' নিপুণ অভিনেতার মতো বলল ফাগুলাল।

'তা বটে!' নয়নতারা এদিক-ওদিক তাকাল। 'তা দাদাবাবু, আমি কি তোমার একটু সেবা করব?'

'সেবা! কীভাবে?'

'একটু পা টিপে দি।'

'না না, সে বড় অস্বস্তিকর।'

'তাহলে একটু মাথা টিপে দি।'

নয়নতারার উৎসাহকে ফাগুলাল আর বাধা দিতে চেষ্টা করল না। শারীরিক অসুস্থতার কথা বানিয়ে বললেও, সত্যি সত্যিই সেদিন তার মাথা টিপটিপ করছিল। ফাল্গুনের শুরু থেকেই গরম পড়েছে। হঠাৎ গরম। দু একদিন পরেই হোলি উৎসব। গাছের পাতা ঝরছে। কোন কোন গাছ ফুলে ফেটে পড়তে আরম্ভ করেছে।

নয়নতারার কোমল হাতের স্পর্শে ফাগুলালের মনে হঠাৎ বসন্তের সঞ্চার হল। সেদিন নীরবে সে নয়নতারার সেবা নিল। তবে ফাগুলালের মনে কিন্তু কাঁটার মতো বিঁধতে থাকল একটি জিজ্ঞাসা। সে জিজ্ঞাসাটা হল, নয়নতারা কী চায়? বাতাসির প্রসঙ্গটি কি তার সঙ্গে ভাব করবার একটি অছিলামাত্র? ফাগুলালের কাছে সে কি যৌবন-সুখ চায়? নাকি বাতাসির মুক্তি চায়? নয়নতারা কি বাতাসিকে ভালবাসে? নাকি বাতাসির সর্বনাশ চায়! সে ফৌজদারের চর নয় তো?'

পরের দিন নয়নতারা আবার এল। সেই ঝাঁ ঝাঁ নির্জন দুপুর। চারদিক শুনশান। শুকনো পাতার মর্মর ধ্বনি।

'আজ আবার এলাম গো দাদাবাবু!'

'এস। শরীরটা আজও সেরকম। কেমন যেন একটা অস্বস্তি।'

আজ আর কোনও ভূমিকার পরোয়া করল না নয়নতারা। সরাসরি বিছানায় এসে বসল। শীতল কোমল হাতে সে ফাগুলালের মাথায় হাত বুলোতে আরম্ভ করল। বলল: চাঁদু কবরেজের ওষুধ খাও। ভাল দাওয়াই। চার পুরিয়া খেলেই শরীর সাফ। কোনও ব্যাধি থাকবে না।'

'কিন্তু আমার ব্যাধিটা যে বড় বেয়াড়া রে! থেকে থেকে বুকের ভেতরটাও যে টনটন করে।'

'বুকে ব্যথা! টনটন করে। মালিশ করে দেব?' নয়নতারা আগ্রহের আতিশয্যে তার হাত ফাগুলালের বুকে রাখল। ফাগুলাল বাধা দিল না। বরং সে নিজের বাঁ হাতটা তুলে নিয়ে নয়নতারার হাতের ওপর রাখল।

মেয়েদের হাত কী ঠাণ্ডা! কী নরম! এরকম একটি হাতের ছোঁয়া বাতাসির কাছ থেকে যদি সে পেত, তাহলে জীবনটাকে অন্যরকমভাবে গড়ে তুলতে চেষ্টা করত। কিন্তু সে আশা বৃথা! বাতাসি কেন যে তার সঙ্গে সুতানুটি এল, তা সে আজও বুঝতে পারে না। 'হাতিদহ' বলে একটি জায়গায় খোঁজ সে করবে বলে এখানে এসেছিল, কিন্তু সে-খোঁজের ব্যাপারে আজ সে উদাসীন। তার যৌবন দিনে দিনে বিকশিত হয়ে আশ্চর্য শ্রীমণ্ডিত হয়েছে। কিন্তু এ ফুলে আজও ভ্রমর বসতে পেল না। অমন ডবকা ছুঁড়িটাকে হাতের মুঠোতে পেয়েও ফাগুলাল ধরে রাখতে পারল না। এ আফশোস্ তার সারা জীবন যাবে না। ফাগুলাল এখন ঠেকে শিখেছে। তার ধারণা মানুষের জীবনে সুযোগ কখনও সখনও আসে। কদাচিৎ। সে সুযোগ যেমনই হোক না কেন, উপেক্ষা করা ঠিক নয়। বরং ষোলো আনাই সুযোগের সুবিধেটা নিয়ে নেওয়াই ভাল। বাতাসি ফস্‌কে গেলেও, নয়নতারাকে সে ফস্‌কাবে না। তা ছুঁড়িটা ডবকাও বটে।

নয়নতারার এই ঘনিষ্ঠতাকে ফাগুলাল তাই পুরো মাত্রায় ভোগ করে নেওয়ার সঙ্কল্প করল। যদি সে ফৌজদার সেপাইদের গুপ্তচর হয়, তবুও। নয়নতারার যৌবনও ঈর্ষণীয়। বেশ পুরুষ্ট। মন মাতানো। বেশ রম্য। বাতাসির জন্য দরবার করবার অছিলায় নয়নতারাকে এখন আর আসতে হয় না। সে এখন ফাগুলালের টানে রোজ দুপুরে হানা দেয়। নয়নতারা ধারণা ছিল, বাতাসির সঙ্গে ফাগুলালের একটা চাপা আশনাই আছে। আজও হয়ত আছে। তা ফাগুলালকে সে ছিনিয়ে নিয়ে বাতাসির মুখে ছাই দিতে চায়। নয়নতারা বিধবা নয়, স্বামী পরিত্যক্তা। দু'চারদিনের জন্য হলেও সে যৌবন-সুখ আস্বাদ করেছে। সে জানে পুরুষরা কিসে কাবু হয়। কেমন করে নারীলুব্ধ পুরুষদের বশে আনতে হয়। সব কৌশলই নয়নতারা একে একে প্রয়োগ করল ফাগুলালের ওপর। তা ফাগুলালও ঠিক এমনি চেয়েছিল।

ডিহি সুতানুটিতে বসন্ত এল। শিমুলে-পলাশে আরক্ত হল সুতানুটির যৌবন। দক্ষিণা বাতাসে নবীন কিশলয়গুলি আন্দোলিত হতে থাকল। কোকিলের ডাকে অনেকের মনেই দেখা দিল এক অজানা ব্যাকুলতা। আমের বোলে শোনা গেল মৌমাছিদের গুনগুনানি। সুতানুটির হাটুরে উপনিবেশ হঠাৎ কেমন যেন প্রগলভ হয়ে উঠল।

নয়নতারা এদিকে নির্জন দুপুরে নিয়মিত হানা দেয় ফাগুলালের ঘরে। ফাগুলালও এই মুহূর্তটির জন্য হাঁ করে অপেক্ষা করে থাকে। বসন্তের দুপুর দু'জনের মিলনে বারবার নিবিড় হয়ে ওঠে। একটি কোকিলে বসন্ত আসে না। তেমনি একটি চুম্বনে যেন নয়নতারার মিলনে সুখ নেই। হাজার চুম্বনে নয়নতারা বিগলিত হয়। ফাগুলালও তাই। নয়নতারার সুপুষ্ট সুডোল যুগল যৌবনের সিংহদ্বার দিয়ে সে যৌবনরাজ্যের অধিকার চায়।

ওদের এই গোপন-মিলন কতদিন ধরে যে চলত, তা বলা মুশকিল। হয়ত বছরের

পর বছর ধরেই চলত। হয়ত গড়িয়ে যেত বসন্তের পর বসন্ত। কিন্তু হঠাৎ একটা নাটকীয় ঘটনা ঘটে গেল। নয়নতারা একদিন তার অভিসারের শেষে সোহাগে গদগদ চিত্তে ফাগুলালের ঘর থেকে বেরিয়ে পিছনের পোড়ো জঙ্গলভরা জমির ওপর দিয়ে পুকুরঘাটে যাচ্ছিল। কেননা, এই সময় প্রতিদিন সে পুকুরঘাটে মাজবার বাসন ভিজিয়ে রেখে আসত। কিছুক্ষণ পুকুরঘাটে থেকে থালাবাসন সাফ্ করে সে খিড়কির দরজা দিয়ে বদ্রীদাসের বাড়িতে ঢুকত। এই ছিল তার নিত্যদিনের নিয়মিত কাজ। এই দুপুরে গৃহিণী দাক্ষায়নী সাধারণত ঘুমোতেন। বাতাসিও ঘুমোত। তবে কোন কোনদিন সে জেগে থাকত। জেগে থাকলে সেলাইয়ের কাজ করত, নকশা আঁকত কাপড়ে। নয়নতারাকে দেখলেও সে কোনও কৌতুহল প্রকাশ করত না। বরং সযত্নে সে এড়িয়ে চলত।

তা সেদিন একটা নাটকীয় ঘটনা ঘটে গেল। ফাগুলালের ঘর থেকে বেরিয়ে যথারীতি জঙ্গলভরা পোড়ো জায়গাটির ওপর দিয়ে ঘাটের পথে যাচ্ছিল নয়নতারা। পোড়ো জমিতে অজস্র ঘেঁটু ফুল ফুটে রয়েছে। চারদিকে ঘিরে রয়েছে কালকাসুন্দ আর চাকুন্দের জঙ্গল। জঙ্গল এড়িয়ে পা ফেলে ফেলে এগিয়ে চলেছিল নয়নতারা।

হঠাৎ পর পর তিনটি গুলির শব্দ। ফিরিঙ্গি বন্দুকের আওয়াজ।

ঝিম্ মেরে ফাগুলাল বিছানার ওপর শুয়েছিল। একটি মিষ্টি আলস্য ঘিরেছিল তাকে। ফিরিঙ্গি বন্দুকের আওয়াজে সে চম্‌কে উঠল। পরপর তিনটি আওয়াজ শোনবার পর সে আর স্থির থাকতে পারল না। ঘর থেকে দৌড়ে বেরিয়ে এল। তবে সে সামনে এগিয়ে যেতে ভরসা পেল না। কেননা, ফৌজদারের সেপাইরা তাকে পাকড়াও করবার জন্য আসতে পারে। একটু আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে পরিস্থিতিটা বুঝতে চেষ্টা করল। আবিষ্কার করতে চেষ্টা করল ঘটনাটি কী!

কিন্তু ফাগুলাল যা দেখল, তাতে তার চোখ ছানা বড়া। ইংরেজ কুঠির এলিস্ সাহেব বিরাট একটি সাদা ঘোড়ার ওপর বসে রয়েছেন। ঘেঁটু বনের ওপারে। ডান হাতে ফিরিঙ্গি বন্দুক। মাথায় ফিরিঙ্গি টুপি। গায়ে ফিরিঙ্গি কামিজ। সেই মুহূর্তে সাহেব উঁচু টিলার নিচে নিচু হয়ে কিছু খোঁজবার চেষ্টা করছেন। ফাগুলালের মনে হল, সাহেব নির্ঘাৎ পাখি শিকারে বেরিয়েছেন। কিন্তু সাহেবের ঘোড়ার পায়ের কাছে ওটা কী! কোনও জানোয়ার নাকি? ফাগুলাল গাছের ডাল ধরে এক ধাপ উঁচু হতে চেষ্টা করল।

দেখল, ঘেঁটুবনের ডাঙা থেকে গড়িয়ে পড়ে গেছে নয়নতারা। বন্দুকের শব্দ শুনে বেচারি হয়ত দৌড়ে পালাতে গিয়েছিল ঘাটের দিকে। কিন্তু চোখের সামনে হঠাৎ যমদূতের মত এক অশ্বারোহী সাহেবকে দেখে পায়ে শাড়ি জড়িয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেছে। শেষে গড়াতে গড়াতে সাহেবের ঘোড়ার শ্রীচরণে।

এলিস সাহেব ঘোড়া থেকে নামলেন। ধীরে ধীরে তুলে ধরলেন নয়নতারাকে। তা নয়নতারা ভিরমি খায়নি।-- তার নাড়ি দুর্বল নয়। সাহেবের হাত ধরে কোনও-রকমে সে উঠে দাঁড়াল। নয়নতারার পোশাক আলুথালু। শাড়ির আঁচলটা মাটিতে

লুটোচ্ছে। সাহেব বলল: 'ম্যাডাম, তোমার কি চোট্ লাগিয়াছে! ডর নাই। আমি চিকিৎসা করাইব। তুমি আইস।'

নয়নতারা ফুঁপিয়ে উঠল। থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে বলল: 'ফিরিঙ্গি, তুমি আমাকে ছেড়ে দাও। আমাকে ছুঁয়ো না। আমার জাত যাবে। আমার কিছু হয়নি।'

সাহেব বলল: 'অবশ্যই তোমার কিছু হইয়াছে। তোমাকে আমি এভাবে যাইতে দিব না।' এরপর ফিরিঙ্গি-দানব এলিস্ সাহেব হালকা একটি পুতুলের মতো ঘোড়ায় তুলে নিল নয়নতারাকে। ঘোড়া ছুটিয়ে মুহূর্তে হাওয়া হয়ে গেল।

ঘটনাটি ঘটে গেল ভোজবাজির মতো। ফাগুলাল এ দৃশ্য দেখে কেমন যেন বিবশ হয়ে গেল। একটি কোকিল বিশ্রীভাবে বারবার ডেকে, তাকে যেন ভ্যাংচাতে থাকল।

॥ পাঁচ ॥

ঠিক যেন চড়াই পাখির কিচির মিচির।

তালে তালে ঢোলকের বাজনা। শব্দ উঠছে খচ্মচ খচ্মচ। রহস্যময় মায়াবি শব্দ। শব্দটা কখনও ভেসে আসে অনেকদূর থেকে। জলজঙ্গল পেরিয়ে। ডাঙা ডহর মেলা পথ ডিঙিয়ে। আবার হঠাৎ হঠাৎ শব্দটা একেবারে কাছেই ভেসে ওঠে। বুড়বুড়ি কাটে মগজের ভেতর। মনে হয় একটা ডানাওয়ালা পোকা ভেতরে ঢুকে পড়েছে। সেটা বাইরে বেরতে চায়। তাই ফরফর করছে। আওয়াজ শোনা যাচ্ছে, খচ্মচ।

ঘুমটা পাতলা হয়ে গিয়েছিল। ঐ কিচির মিচির রহস্যময় শব্দটা শুনতে শুনতে ভয়ঙ্কর এক অস্বস্তির ভেতর ঘুম ভেঙে গেল চার্ণক সাহেবের। ধড়মড়িয়ে বিছানার ওপর উঠে বসল সাহেব। তবে উঠে বসবার সঙ্গে সঙ্গেই ঐ ভুতুড়ে শব্দটা থেমে গেল। তা থেমে গেলেও বারকয়েক জোরে জোরে মাথাটা ঝাঁকিয়ে নিল সাহেব। ঝাঁকিয়ে নিয়ে সাহেব পরখ করতে চাইল ঐ বিদিকিচ্ছিরি শব্দটা ঠিক কোথা থেকে আসছে। বোঝা গেল না। গুম্ মেরে সাহেব বিছানার ওপরেই কিছুক্ষণ বসে থাকল। আরও কিছু পরে বিছানা থেকে নেমে এসে ঘরের মেঝেতে বার কয়েক পায়চারি করল। না, শব্দটা নেই।

সাহেবের বিছানার পাশে টেবিলের ওপর এক পেল্লায় বোতলে খাবার জল ভরা থাকে। সেই জল প্রায় সবটাই ঢক্ ঢক্ করে খেয়ে নিল সাহেব। বাকি যেটুকু থাকল, তা হাতের ভেলোয় ঢেলে নিয়ে চোখে মুখে ঝাপ্টা দিল। ঘুম ঘুম ভাবটা কাটিয়ে সাহেব ঘর থেকে বেরিয়ে এল বাইরের দাওয়ায়। কত রাত কে জানে? সাহেবের

টেবিল ঘড়ি ছিল। কিন্তু দেখতে ইচ্ছে করল না। বাইরেটা ভারি শান্ত। অনিমিখ জ্যোৎস্না। কলকাতা-সুতানুটির আকাশটা যেন ঝকঝকে। এই জ্যোৎস্নায় অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়। কিন্তু হাটখোলা-সুতানুটি-কলকাতায় দূরের জিনিস দেখা খুব কঠিন। সারি সারি গাছ চারদিকে অবরোধ সৃষ্টি করে দাঁড়িয়ে আছে। জ্যোৎস্নার আলোয় এরা সারি সারি অন্ধকার। গাছের তলাতেও মেলা অন্ধকার। থেকে থেকে শোনা যায় বন্যজন্তুর কলরোল। শেয়ালের ডাক। বাংলোর সামনেই যে পাকুরগাছটা আছে, তার মাথায় এসে থমকে দাঁড়িয়ে গেছে নিশীথ রাতের চাঁদ। আর চাঁদ থেকে রুপোলি ধারায় নেমে আসছে জ্যোৎস্না। জঙ্গল-ঘেরা গ্রাম সুতানুটির এ চেহারাটা চার্ণকের কাছে ঠিক চেনা নয়। তা শুধু চেনা নয় বললে ঠিক হবে না, চার্ণক সাহেবের কাছে এ সুতানুটি রীতিমত রহস্যময় বলে বোধহয়। সাহেবের ধন্দ লাগে। সাহেব যে সুতানুটিকে চিনতে পারে, তা হল হাটের সুতানুটি। হোক না কেন, ডাঙা ডহর আর জঙ্গলভরা গ্রাম, সে গ্রাম যে অচিরে জনাকীর্ণ হয়ে উঠবে, বসতের পর বসত বাড়বে, খানা-খন্দ বুজে গিয়ে চারদিক চৌরস হবে, তা সাহেব স্পষ্ট দেখতে পায়। হাটুরে লোকেদের চিৎকার আর চেঁচামেচিতে চারদিক গমগম করছে। মুটের মাথায় মাল উঠছে। সে মাল বোঝাই হচ্ছে নৌকোয় বা গো-যানে। আবার বিপরীত চিত্রও রয়েছে। নৌকো থেকে নামছে নতুন নতুন সওদা। শেঠেদের আড়তে আড়তে পৌঁছে যাচ্ছে সে মাল। দেশ-বিদেশের বণিকরা এসে দরদাম করছেন রেশমি কাপড়ের। হাতে তুলে পরখ করছেন ঢাকাই মসলিন। পছন্দ হলেই সে মাল নৌকোয় উঠছে। চলে যাচ্ছে দেশ-দেশান্তরে। মাঝে মাঝে হাটুরেদের ভেতর মারামারি লাগে। লাঠি পেটাপেটি হয়। বস্তাভরা মাল গড়িয়ে পড়ে খানা-খন্দে। হাটের চালা ভাঙে। হা-হা করে ওঠেন বয়স্ক লোকেরা। চার্ণক সাহেব নিজেও কখনও কখনও দৌড়ে যায়। কিছু পরেই সব মিটমাট। শুনশান। আবার কেনা-কাটা শুরু হয়। সাহেব এই সুতানুটিকে চিনতে পারে। বুঝতে পারে। কিন্তু রাতের সুতানুটিকে একেবারেই না।

নিশুতিরাতের গ্রাম সুতানুটির চেহারাটা বেবাক আলাদা। দিনের সুতানুটির সঙ্গে এ সুতানুটির কোনও মিলই খুঁজে পাওয়া যায় না। বিশেষত এইরকম জ্যোৎস্নাভরা রাতে। এইরকম রাতে গোটা বসতটা রহস্যময় হয়ে ওঠে। জেগে ওঠে চারদিক। হাটুরে লোকদের তোয়াক্কা না-করে সে নিজে নিজেই যেন কিছু একটা হয়ে উঠতে চায়। জ্যোৎস্নার আলোয় তার গা দিয়ে রূপ ঝলকায়। সোনার কাঠির ছোঁয়ায় যেমন রূপ-কথার রাজকন্যা জেগেছিল, ঠিক সেইভাবে কে যেন জেগে ওঠে। আর সেই জেগে ওঠার মুহূর্তে এই সুতানুটিকে দেখে চার্ণক সাহেবের কেমন যেন ঝিম লাগে। ভয় ভয় করে। একটা ভুতুড়ে হাওয়া সেই সময় গঙ্গার ওপর দিয়ে হুহু করে ছুটে এসে গ্রাম সুতানুটির ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে যায়। চার্ণক সাহেব অস্বস্তি বোধ করে।

আজও প্রায় সে রকমই হল। তবে বাতাসটা এল দক্ষিণ থেকে। নিশীথ রাতের

ঠাণ্ডা হাওয়া। এই হাওয়ায় জেগে উঠে অনেকগুলি রাতচর পাখি হঠাৎ ট্যা ট্যা করে উঠল। পাখা-ঝাপ্টাল। ভেসে এল বন্যজন্তুদের কলরোল। আর ওই বাতাসের সঙ্গে বিদিকিচ্ছিরি শব্দটাও ঢিমে লয়ে ভাসতে ভাসতে চলে এল খচ্‌মচ্‌ খচ্‌মচ্‌। ভুতুড়ে আওয়াজ। তালে তালে ঢোলকের বাজনা। চার্নক সাহেব মাথা ঝাঁকাল। শব্দটা তবু গেল না। বরং ঐ শব্দটার সঙ্গে বাড়তি আর একটা সুর শোনা গেল, 'হোরি হ্যায়! হোরি হ্যায়!'

এবার সাহেবের আর বুঝতে অসুবিধে হল না যে হিন্দুস্তানে হোলি এসে পড়ল। তা তামাম হিন্দুস্তানে যদি হোলি আসে, সেই আসা থেকে গ্রাম সুতানুটিই বা বাদ যায় কেন? এই হোরি উৎসবটা দেখতে চার্নকের ভারি ভাল লাগে। রোমের সেই বিখ্যাত বসন্ত-উৎসবের কথা মনে পড়ে যায়। সে উৎসবে নাঙ্গা হয়ে হল্লাবাজি করা যায়। তা হোরিও সেই রকম। এখানেও প্রায় একইরকম বেলেল্লাপনা। ঐ খচ্‌মচ্‌ খচ্‌মচ্‌ বাজনাটা উৎসবের বেশ কিছুদিন আগে থেকেই গা-গরম করে। তালে তালে ঢোলক বাজে। উৎসবটা পছন্দ হলেও, এই বিদিকিচ্ছিরি বাজনাটা চার্নককে কেমন যেন খেপিয়ে তোলে। ভয়ংকর একটা অস্বস্তিতে সাহেব ছট্‌ফট্‌ করতে থাকে।

ভেতরে ভেতরে অনেক গোপন ব্যথা জমে আছে। আছে অনেক কাঁটা। অনেক ক্ষত। এমন অনেক গ্লানি আছে, যা সাহেব বরাবরের মতো চাপা দিয়ে রেখেছে। এসব গোলমাল কোনও মানুষ কখনও প্রকাশ করতে চায় না। চার্নকও চায় না। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে কি, ঐ বিদিকিচ্ছিরি শব্দটা সাহেবকে বেসামাল করে দিয়ে ঐ গোলমেলে সব বিষয়গুলির মুখোমুখি করে দেয়। মাথার ভেতরটা কুরকুর করে। চার্নকও লাফিয়ে লাফিয়ে ওঠে। বিকারগ্রস্ত রোগীর মতো মাঝে মধ্যে হাত পাও খেঁচতে থাকে।

তা গোলমাল তো থাকতেই পারে। নিজের পরিজন-আত্মীয়দের ছেড়ে বিদেশে এসে বাস করতে হচ্ছে সেই কত যুগ আগে থেকে। চাকরিও কিছু লোভনীয় নয়। ইদানীং কিছু মাইনে বেড়েছে। এখন রাইটার হয়ে কোম্পানির কুঠিতে এসে মাস-মাইনে কুল্লে সাড়ে বারো। বছরে দেড়শ। আগে আরও কম ছিল। এই কম মাইনে কবুল করেই আসতে হয়েছিল সাড়ে তিন দশক আগে। তবে কোম্পানি মাথার ওপর একটা ছাউনি দিয়েছিল। আরও পাঁচজনের সঙ্গে থাকতে হত সেই ছাউনির নিচে। কেবল আশ্রয় নয়, কোম্পানি নিজের স্বার্থে দুপুর আর রাত্তিরের খাবার ব্যবস্থাও রেখেছিল। টেবিলে খানা সাজানো হলেই ঢং ঢং করে বাজত। দৌড়ুতে হত ডাইনিং রুমে। সকলের জন্য একটি ঘর। ডাইনিং রুম একটা হলেও, প্রত্যেকের র‍্যাঙ্ক অনুসারে চেয়ার সাজানো থাকত। দেখা হত, মারচেণ্ট ফ্যাক্টর রাইটার যেন আলাদা আলাদা মর্যাদা পায়। কিছুতেই যেন একাকার না হয়ে যায়। এ খানার জন্য কোম্পানি অবশ্য পয়সা নিত না। এটা মাগনো জুটে যেত। তা হিন্দুস্তানে আসবার পর প্রথমে দু'এক বছর এটুকুও জোটেনি চার্নকের কপালে। তখন সে কোম্পানি

থেকে দূরে। 'এলোমেলো জীবন। যেখানে সেখানে ভোজন। শয়ন হট্টমন্দিরে। সে সব ভাবতে গেলে মন ভারি হয়ে যায়। ভেতরটা হুহু করে।

পাটনা শহর থেকে সাড়ে সাত ক্রোশ উত্তরে। ছোট্ট একটি নদী। গণ্ডক। জায়গাটি বেশ মনোরম। লালগঞ্জ। তবে কুঠিটা ঠিক লালগঞ্জে নয়। সেটা ছিল সিংঘিয়ায়। মাথায় তখন ছিল ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল। লাল চুল। সেই চুল ছেঁটে ফেলল চার্ণক। কুর্তি টুপিও ফেলে দিল ছুঁড়ে। আবর্জনার মতন। পরল চুস্ত পা-জামা। আর এদেশি কামিজ। মুরেদের দেশে এসে মুরেদের মতই থাকা ভাল। হোয়েন্ ইন্ রোম, ডু এ্যাজ দি রোমান্স।

রসুইখানার দায়িত্বে ছিল যে লোকটা, সে লোকটার নাম এখন আর মনে পড়ে না। তবে তার মূর্তিটা চোখের ওপর ভাসে। লোকটা মুর। পেটমোটা ভুঁড়িখানা। গালে ছিল ইয়া গালপাট্টা। তার মুখে সর্বদাই ভরা থাকত সুগন্ধি পান। কথা বলত গাঁক গাঁক করে। কথা বলার সময় শিলাবৃষ্টি হত। ছড়িয়ে পড়ত পানের পিক। সুপুরির কুচি। সুগন্ধি জর্দা। তা লোকটা যেমনই হোক না কেন, খানা পাকাত ভাল। দিলটাও ছিল সাফা।

'তা খাঁ সাহেব, তোমার পাকানো তো তোফা! একবার মুখে দিলে, জিন্দেগি ভর মনে থাকার কথা। কিন্তু কুঠির সবাই এ খানা খায় না কেন?'

'ওরা সব ছুছুন্দর সাব! খাবে কেন?"

'ছুছুন্দর! তা ওদের ছুছুন্দর বলছ কেন খাঁ সাহেব!'

'ছুছুন্দর কি সাধে বলছি সাব! ছুছুন্দরের মতো কাজ করছে বলেই, ওদের ঐ বদখত নামে ডাকছি। ওরা এখন গন্ধী জীব। টাকার গন্ধ পেয়েছে। আমার পাকানো খানা না-খেলে 'ডায়েট মানি' পাবে। সেই ডায়েট মানির গন্ধ পেয়ে আমার পাকানো খানা আর খায় না।'

'তাহলে ওরা খায় কোথা?'

'ওরা আলাদা আলাদা কুঠিতে থাকে। নিজের নিজের খানা নিজেরাই পাকিয়ে নেয়।'

খাঁ সাহেব 'ছুছুন্দর' বলে গালাগাল দিলেও, গন্ধী লোকেদের পাটোয়ারি বুদ্ধির তারিফ করতে হয়েছিল চার্ণককে। কুঠির ভেতর থাকলে অনেক সুবিধা পাওয়া যায় ঠিকই, কিন্তু বাইরে থাকলে তার সঙ্গে বাড়তি যা পাওয়া যায়, তা হল স্বাধীনতা। বাইরে থাকলেও বিনি খরচার চাকর পাওয়া যায়। রাতে জ্বালাবার মোমবাতি বিনি পয়সায় মেলে। অথচ রাত্তির নটার ভেতর আবশ্যিকভাবে কুঠির ভেতর ঢুকতে হয় না। রাতে সে যেখানেই থাকুক না কেন, তারজন্য কোন কৈফিয়ত দিতে হয় না। কবলাতে হয় না জরিমানা। দিনের বেলা মুখ বুজে কোম্পানির কাজ করে যাও। রাত্তিরে নাও অবাধ স্বাধীনতা।

বার্ষিক কুড়ি পাউণ্ডের মাইনে তখন চার্ণকের। টাকার হিসেবে মাসে মাসে তিরিশ। মালপত্তর সওদা করার জন্য, দালালের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতে হয় কাঁহা কাঁহা

মুলুক। দালাল মালপত্র সন্ধান করে, দরদস্তুর করে, চালান দেয় কুঠিতে। চার্ণক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে। দালাল সওদাপিছু দালালি পায় শতকরা তিন টাকা। চার্ণক অন্টরম্ভা। ফক্কা। রোদ্দুরে ক্লান্ত হয়ে দালাল মিছরির পানা খায় থিতিয়ে জিরিয়ে। পাখাওয়ালা তাকে হাওয়া করে মৃদু মৃদু পাখা চালিয়ে। তাপদগ্ধ চার্ণক ছট্‌ফট্‌ করে গরমের জ্বালায়। ঢক্‌ঢক্‌ করে গলায় ঢালে অ্যারাক পান্‌চ। গলা জ্বলে, তবু খায়। গর্মি মরে না। বরং বাড়ে।

নদীর ধারে তাঁবু পড়েছে। লখনৌ থেকে এসেছে সেরা তওফাওয়ালি। দালাল টেনে নিয়ে গেল। জলের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে আসছে মিঠে হাওয়া। আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ। তওফাওয়ালির বিলোল কটাক্ষে, চঞ্চল ঘুঙুরের রুনুঝুনু ঠিনি ঠিনি মিঠে বোলের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে ফার্সি গজলের মন মাতানো সুর। মনে রঙ লাগা, মনে নেশা ধরেছে। সরাবে গলা ভিজিয়ে নিতে নিতে সমঝদার হাঁক ছাড়ছে, 'বহুত আচ্ছা!' রুমাল ভরা মোহর ঝন্‌ঝনিয়ে পড়তে থাকে। তওফাওয়ালির পায়ের নিচে জাজিমের ওপর। ফিরিঙ্গি চার্ণকও পেলা ছুঁড়েছে, তবে সেটা রুমাল ভরা রুপোর টাকা। জাজিমের ওপর তার আওয়াজ ঝনঝনায় না। ঠক্‌ করে পড়ে। খট্‌খটে বেছুট আওয়াজ। একেবারে বেছুট!

সংকল্প চিড় খায়। সংকল্প ছিল 'হোয়েন্‌ ইন্‌ রোম, ডু অ্যাজ দি রোমান্‌স।' মুরেদের দেশে মুরেদের মতো থাকতে চেয়েছিল সাহেব। কেবল থাকা নয়, বাঁচতেও চেয়েছিল। কিন্তু তিরিশ তঙ্কার মাইনেতে ছোট্ট একটা দালালের মতো থাকা যায় না। তা কোম্পানির কোনও ক্ষতি না করে দালালের রুটির একটি পাশে কামড় দিতে চেয়েছিল তরুণ চার্ণক। তুমি যদি তিনটাকা পাও, তা থেকে আমাকে একটা আধলা দেবে না কেন? নইলে তোমার সঙ্গে কাঁহা কাঁহা মুলুক ঘুরব কি আমি পেটে গামছা বেঁধে? তুমি খাবে, আর আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখব। একজন ভরপেট। আরেকজন উপোসী? এক যাত্রায় পৃথক ফল হবে কেন?

এদিকে কোম্পানি দিনে দিনে চাঙ্গা হয়ে উঠছে। তামাম ইউরোপ জুড়ে গোলমাল। বারুদের গন্ধে বাতাস ভারি। আর এই বারুদ তৈরির জন্য চাই সোরা। কোম্পানি হুকুম জারি করছে, হাজার হাজার টন সোরা পাঠাও। সুতরাং সোরার চালান বেড়ে গেল। শয়ে শয়ে নৌকো ভর্তি হয়ে সোরা চলেছে পাটনা কুঠি থেকে। থানা রাজমহল ছুঁয়ে সে নৌকো চলেছে কাশিমবাজার। কাশিমবাজার থেকে হুগলি। হুগলির গুদামে জমছে হাজার হাজার টন সোরা। পরে তা জাহাজ বোঝাই হয়ে বালাসোর ছুঁয়ে চলে যাচ্ছে ইউরোপ। কোম্পানি নাফা করছে। কোম্পানির শেয়ার তখন বড়ই তেজি।

চার্ণকের ঘোড়া ছুটছে। লাক্‌খোয়ার। সে আবার কোথায়? পাটনা থেকে তিরিশ মাইল দূরে। দালাল বলল: 'একবার হাত দিয়ে দেখুন সাহেব! খাসা জিনিস। এমন কাপড় আর ভূ-ভারতে পাবেন না। এর নাম 'আমবাতি' কাপড়। ফিরিঙ্গিদের এ কাপড় ভারি পছন্দ। যাকে বলে দিল পসন্দ্‌।'

'তা কী করে বুঝলেন যে, এটা ফিরিঙ্গিদের দিল পসন্দ ?'

'আজ্ঞে, ওলন্দাজরা ইদানীং এ জিনিস বেশি সওদা করছে।' দালাল কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে বলল : 'শুনেছি ওরা এ কাপড়ে ভালই নাফা করছে।'

'তাহলে আমরাও করব।'

দালাল মিছে বলেনি। ইউরোপের বাজারে আমবাতি কাপড় হুহু করে কাটতে থাকল। কোম্পানি মুনাফা করতে থাকল লাফিয়ে লাফিয়ে। কোম্পানি খুশি। ওখান থেকে নির্দেশ এল আরও পাঁচরকম মন ভোলানো জিনিসের খবর রাখো। মজাদার ...নতুন নতুন জিনিসের নমুনা পাঠাও। টাকার অভাব হবে না। চাইলেই টাকা পাবে।

দালাল বলল, এলাচি কাপড়ের নাম শুনেছেন ?'

এলাচ দানা হয় জানি। তা এলাচি কাপড় আবার কবে থেকে হল ? একি পাটনাই মসলিন নাকি ?

দালাল হাসে। খুশি খুশি অথচ বিগলিত হাসি। ঐ রকম হাসি হাসতে হাসতে হাত কচলে বলে, 'এলাচি কাপড় ভারি এক মজার জিনিস সাহেব। এ কাপড় সুতোরও নয়, আবার রেশমিও নয়। অথচ দুটো জিনিসই আছে। টানা-পোড়েনে মিশে আছে সুতো আর রেশম। খাসা মাল। ছোট এলাচের মতো গায়ের রং। আমাদের খানদানি ঘরের বিবিদের দিল খুশ করা জিনিস। আপনাদের দেশে নমুনা পাঠিয়ে দেখুন। এ মাল খেয়ে যাবে।'

'ঐ এলাচি কাপড় কোথায় মিলবে।'

'কাছেই। জায়গাটা পাটনা শহর থেকে পাঁচ ক্রোশের ভেতর। গ্রামের নাম, বৈকুণ্ঠপুর। ওখানকার তাঁতিদের হাতে জাদু আছে।'

চার্ণকের ঘোড়া ছুটল বৈকুণ্ঠপুরে। এ ধরনের ঘটনা কেবল একবার নয়, ঘটে বারবার। কোম্পানির মুনাফা বাড়াতে চার্ণককে চুঁড়ে বেড়াতে হয় এক গ্রাম থেকে আরেক গ্রাম। এক গঞ্জ থেকে আরেক গঞ্জ। বাংলা চুঁড়ে সংগ্রহ করা হয় বাফতা, কাঁচা রেশম, ঢাকাই মসলিন। এমনকি সাত গাঁয়ের তৈরি নকশি লেপও বাদ যায় না। মাথার ওপর দিয়ে চলে যায় গ্রীষ্ম বর্ষা। চলে যায় হাড় ভাঙা শীত। অঞ্চল বদল হয়। বদল হয় দালাল। তবে চেহারায় আর মেজাজে সব দালালই এক। একশ টাকা সওদা হলে, তিনটাকা সে গুনে নেবে। আর কোম্পানির চাকর হয়ে চার্ণক তা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবে।

তা চার্ণক একদিন বলে বসল, 'একটা আধলায় আর হবে না খাঁ সাহেব। দস্তুরিটা এবার থেকে আমাকে দুই করেই দিতে হবে।'

'আজ্ঞে, আমাদের তা হলে কত থাকবে ?'

'সেটা আপনারা বুঝে নিন। তবে কোম্পানির কাছে যেন বাড়তি চাইবেন না। ভাঙ্গু-চাল যা করবার, তা নিজের হিস্যায় করুন।'

'তাহলে বড় সমস্যায় পড়া গেল।'

'এ সমস্যা আপনাদের। আমার নয়। আপনি দালালি ইস্তফা দিলে, আরেক দালাল নিয়োগ করা হবে।'

কেবল মাল বিক্রির দালালকে নয়, তাঁতিদের কাছেও ব্যাপারটা সাফ্ সাফ্ জানিয়ে দিল চার্ণক। সিক্কা টাকায় কোম্পানি তাদের যে দাদন দেবে, তার জন্য স্রেফ মাল তৈরি করে দিলেই হবে না। টাকার জন্য শতকরা দু'টাকা হারে সুদ চাই। এ সুদের পাঁচসিকি থাকবে কোম্পানির। তিন সিকি পাওনা হবে চার্ণকের।

দেশটা যখন মুরেদের, মুরেদের মতন করেই বাঁচতে হবে। তবে সংকল্পটা হবে, লিভ অ্যান্ড লেট লিভ। বাঁচ এবং বাঁচিয়ে রাখ। কোম্পানিকে বাঁচিয়ে রাখ। তার বাড়বাড়ন্ত হোক। নতুবা তুমি বাঁচবে কী করে? কাকে নিয়ে বাঁচবে।

অনিমিখ জ্যোৎস্না। ঝকঝকে আকাশ। অ্যারাক পানুচের নেশাটা এখনও কাটেনি। চারদিক ঘোর ঘোর লাগছে। দূরের জঙ্গলে বন্যজন্তুদের কলরোল। আবার সেই দখিনা বাতাসটা হু হু করে জাম-জারুলের মাথার ওপর দিয়ে বয়ে গেল। কানের কাছেই বুড়বুড়ি কেটে উঠল সেই ঝিঁঝিঁপোকার শব্দটা. থচমচ থচমচ। তালে তালে বাজছে ঢোলক। চার্ণক অনুভব করল যে, গলার কাছটা কেমন যেন শুকিয়ে গেছে। একটু জল খাওয়া দরকার।

রাস্তাঘাট বড় সংকীর্ণ। বিশেষত বাজারের ভেতর। একটা পালকি ঢুকে পড়লে আরেকটা পালকির পাশ কাটানো শক্ত হয়ে ওঠে। গম্‌গম্ করছে বাজার। নদীর ধারে শহর। অথচ বড়ই অপরিচ্ছন্ন। হাজার হাজার টাকার মাল খরিদা হচ্ছে, কিন্তু বাজারটার কোন উন্নতি নেই। শহরের বাইরে এলে হাঁফ ছেড়ে বাঁচা যায়। চারদিকে তুঁত গাছের চাষ। এই তুঁত গাছের পাতাই হল গুটি পোকার খাদ্য। এই গুটিপোকা থেকে পাওয়া যায় হলুদ রঙের রেশম। রেশমের কারবারিরা কলা বাসনার ছাই দিয়ে রেশমকে কেচে পরিষ্কার করে। সেই রেশমের তখন কী জেল্লা!

'দ্যাখেন দ্যাখেন, এমন হাত সুরত মাল তওফাওয়ালিদের শরীল হাঁটকালেও মিলবে না! যেমনি নরম. তেমনি জেল্লা।'

'বটে!'

'জি। এমন তোফা জিনিস আপনাদের প্যালেস্তাইনেও মিলবে কিনা সন্দেহ! একবার হাত দিয়েই দেখুন না, সাহেব!'

'এই কাশেমবাজারে আমাদের কুঠিতে তোমার কতদিনের দালালি?'

'তা একযুগ তো বটেই! এই অনন্তরামকে সব ফিরিঙ্গি সাহেবই চেনেন। আপনাদের এলিস্ সাহেবও আমাকে চেনেন। পেয়ার করেন।'

'নেলর? নেলর সাহেব তোমাকে পেয়ার করেন?'

অনন্তরাম এক গাল হাসল। তোয়াজ করা মিষ্টি হাসি। একেবারে বিগলিত। এই দালালদের চরিয়ে নিয়ে বেড়ানোই চার্ণকের পেশা। অনন্তরামকে বুঝতে অসুবিধে হল না তার। মাথায় পাগ। কানে কুণ্ডল। কপালের মাঝখানে পয়সাভর একটি সাদা চন্দনের তিলক। গায়ে চোগা। ডান হাতে দুটি আংটি। আংটি দুটির

একটিতে হিরে, আর অন্যটায় চুনি। চুনিটা ঘোর লাল। দপ্‌দপ্‌ করছে। অনন্তরাম বিগলিত হয়ে বলল : 'নেলর সাহেব আমাকে বেজায় পেয়ার করেন। ও'র সুপারিশেই এখানকার যত বাফ্‌তা আর রেশম কেনা হয়। তা ও'র চোখ আছে। আজেবাজে জিনিস একদমই কিনতে পারেন না।'

'এবার থেকে আমিই এ কেনাকাটার ব্যাপার-স্যাপার দেখব। নেলর নয়।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। সেকথাও নেলর সাহেবের মুখে শুনেছি। নেলর সাহেব আপনার অধীনস্থ কর্মচারী। উনি কেবল রংদার হিসেবেই থাকবেন। অপরিষ্কার বাফ্‌তা আর রেশম উনি মাজাঘষা করে রং লাগাতে থাকবেন।'

'তা ঠিকই শুনেছ অনন্তরাম। তোমাকে দেখে বেশ চৌখস বলে মনে হচ্ছে। তাছাড়া কুঠিতে যখন অনেকদিন ধরে আছ, নিশ্চয় আমাদের পাওনা গণ্ডার ব্যাপারটাও জান। আমার হাতে কিন্তু খরিদা পিছু শতকরা দুই দিতে হবে। তবে নেলরকেও তার পাওনা থেকে বঞ্চিত করলে হবে না।'

'ছি ছি! বঞ্চিত করব কেন?' অনন্তরাম জিভ কাটল। সবিনয়ে বলল : 'হুজুর যেমন চাইবেন, সে রকমই হবে।'

দালাল অনন্তরাম তার কথা রেখেছিল। চার্ণকের সঙ্গে সে কখনও বেইমানি করেনি। আর এই বেইমানি না-করার জন্য চার্ণকও তাকে আড়াল করেছিল, বাঁচিয়ে দিয়েছিল নিশ্চিত হাজতবাস থেকে। তবে লোকটা ছিল ঘোড়েল। মুখে বিগলিত হাসি, কিন্তু ভেতরটা পাথরের থেকেও কঠিন। পাষাণ। টাকা-পয়সা ছাড়া এ দুনিয়ায় সে আর কিছুই চিনত না। আর এই টাকা-পয়সার ব্যাপারে গোল বাধলে, সে বাঘের থেকেও হিংস্র হয়ে উঠত। বিগলিত হাসি মুহূর্তে মিলিয়ে যেত। বেরিয়ে আসত সেই পশুটা। নখদন্ত সমেত।

'হুজুর, লোকটা একটা খুনে। অনন্তরাম থেকে বিশ কদম পিছিয়ে থাকবেন। কখন ফাঁসিয়ে দেবে যে আপনাকে, তা টের পাবেন না!' কুঠির চৌকিদার একদিন ফিস্‌ফিস্‌ করে জানিয়ে গেল। কথাটা শুনে চার্ণক পেটে রাখল না। একদিন সরাসরি অনন্তরামের কাছেই কথাটা ফেলল, 'তোমার নামে খুনি অপবাদ কেন, অনন্তরাম! তুমি কি কারোকে খুন করেছ?'

'না, সাহেব, খুন আমি নিজে হাতে কারোকে কখনও করিনি। তবে করিয়েছি। বা যাতে সে নিজেই নিজেকে খতম করে ফেলে, সেরকম ব্যবস্থা করে দিয়েছি।—আর এসব কাজ করেছি হারামির বদলা নিতে।'

'কী রকম?' অনন্তরামের বাহ্য পরিচ্ছন্নতার পিছনে যে হিংস্র পশুটা লুকিয়েছিল, তার পরিচয় নেবার জন্য ঐ ঔৎসুক্য দেখিয়েছিল চার্ণক।

'হুজুর নিশ্চয় রঘু পোদ্দারের কথা বলছেন?'

'রঘু পোদ্দার? সে কে? চিনি না তো!'

'না, হুজুর, আপনি তাকে চিনবেন না। তা ব্যাপারটা আপনাকে খুলেই বলি। খুলে বললে বুঝবেন, কেন আমি ও কাজ করেছি।'

এরপর অনন্তরাম তার জীবনের দুটি জঘন্যতম অপরাধের কথা চার্ণকের কাছে কবুল করেছিল। অনন্তরাম বেশ বলিয়ে কইয়ে লোক। গলাতেও স্বর ওঠানামা করে। —থিতিয়ে জিরিয়ে সে যা বলেছিল, তাতে বিস্মিত হয়েছিল চার্ণক।

রঘু পোদ্দার ছিল কুঠির খাজাঞ্চি। সম্ভবত কাশেমবাজারেরই লোক। তিন পুরুষ ধরে পোদ্দারি করে আসছে। টাকা-পয়সা নিয়ে নাড়াচাড়া করা রঘুদের রক্তেই ছিল। বাটা নিয়ে টাকার খুচরো করে দেওয়া, সোনা রুপো যাচাই করা, তেজারতি কারবার ইত্যাকার বিষয় ছিল তার রক্তে। সুতরাং কোম্পানি বুঝে সুঝেই তাকে কুঠিতে খাজাঞ্চি করেছিল। তা সে কাজ খারাপ করত না। কোম্পানির কাজ করবার সঙ্গে সঙ্গে নিজের বন্ধকী কারবারও সে পুরোদমে চালিয়ে যাচ্ছিল। তেজারতিতে তার ভালই নাফা হত। রঘু পোদ্দার দিনে দিনে ফুলে উঠছিল।

তা ফুলুক। কেউ যদি নিজের কেরামতিতে ফুলে ওঠে, তাতে আপত্তি থাকবে কেন অনন্তরামের। আর যদি বা থাকে, লোকে শুনবে কেন? রঘুর মতে অনন্তরামও কুঠির একজন নোকর। সে দালাল। আর রঘু খাজাঞ্চি। দু'জনের কাজ আলাদা। কাজের জগৎ আলাদা। বিরোধ হবার কথা নয়। তবু বিরোধ বাধল। অনন্তরামের দালালির টাকার ওপর লোভি শয়তানটার একদিন নজর পড়ল। রঘু দালালির ভাগ চায়। ভাগ দাও, নইলে সব ধরিয়ে দেব। কাশেমবাজারের কুঠিয়াল ছিলেন তখন ভিনসেণ্ট সাহেব। সাহেব মানুষ হিসাবে খাসা। কিন্তু বেজায় কান পাতলা। রেগে গেলে জ্ঞান থাকে না। একগুঁয়ে। ভাল তো ভাল, রাগলে বাপের কুপুত্তুর। দালালির ব্যাপার-স্যাপার ফাঁস হয়ে যাবার ভয়ে, অনন্তরামকে বাধ্য হয়েই রঘু পোদ্দারের সঙ্গে রফা করতে হয়েছিল। দালালির বখরা দিতে হয়েছিল বিনা প্রতিবাদে। হাসি মুখে।

অনন্তরামের মুখটা হাসি হাসি থাকলেও, তার ভেতরের জন্তুটা ওত পেতে ছিল রঘুর ঘাড় মটকে রক্ত পানের অপেক্ষায়।

হঠাৎ সুযোগ জুটে গেল। কোম্পানির হিসাব রক্ষকের কাছে রঘুর টাকার গরমিল ধরা পড়ল। স্পষ্টতই বোঝা গেল, কুঠির একটি মোটা টাকা খাজাঞ্চি রঘু সরিয়ে বসে আছে। সম্ভবত রঘুর তেজারতি কারবারে সে টাকা খাটছে। কোম্পানির হাঁস ডিম পাড়ছে পোদ্দারের ঘরে। এ অনাসৃষ্টি কে সহ্য করে? আর যেই সহ্য করে করুক, কুঠিয়াল ভিনসেণ্ট সাহেব সহ্য করলেন না। তিনি রঘু পোদ্দারকে কুঠির কয়েদখানায় আটকে রাখলেন। আর রঘুর পেট থেকে আরও কিছু বের করা যায় কিনা, তা দেখভালের দায়িত্ব পড়ল অনন্তরামের ওপর। অনন্ত ঠিক এরকম একটি সুযোগই খুঁজছিল। তার ভেতরের পশুটা এই সুযোগে ঝাঁপিয়ে পড়ল রঘুর ঘাড়ের ওপর। প্রহারের চোটে রঘুর ইন্তেকাল ঘনিয়ে এল। ব্যাটাকে হাঁ করতে হল না। আর শেষ মুহূর্তে সে বুঝে গেল অনন্তরাম কেমন মানুষ। তা হুজুর, বেইমানিটা কে করল অনন্তরাম, না রঘু পোদ্দার? বেইমানদের যেমন সাজা হয়ে থাকে, রঘু পোদ্দারের ঠিক সেই সাজা হয়েছে। একরত্তি কম হয়নি। বেশিও না। পরের ধনে পোদ্দারি

করাতে আপত্তি ছিল না অনন্তরামের। কিন্তু পরের রুটিতে দাঁত বসানোতে ঘোরতর তার আপত্তি। আমাকে আমার হক্ বুঝে নিতে দাও। তুমি বুঝে নাও তোমার। অযথা গোল কর কেন?

'আরও একটা এই রকম ঘটনার কথা যে শুনতে পাই! সে ঘটনাটা কিসের?'

অনন্তরাম বলল: 'হ্যাঁ হুজুর, ঠিক এই ধরনের আরও একটা ঘটনা আছে। সে ব্যাটাও ছিল হারামি। আপনাদের কুঠিতেই মহাজনি করে খেত। লোকটা ছিল আবার গোঁসাই। ব্রাহ্মণ সন্তান। নদের লোক।' এক নিঃশ্বাসে কথাগুলি বলে দম নিল অনন্ত। কাঁধের ওপর পাটকরা যে চাদরটি ছিল, সেটি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে হাওয়া খেল। ধীরে ধীরে আবার আরম্ভ করল, 'তা হুজুর, লোকটা গোঁসাই বলে, তাকে আমরা খাতির করতাম। কখনও কখনও প্রণাম করে পায়ের ধুলোও নিয়েছি। কিন্তু তাই বলে তাকে রেহাই দেব? তাঁতিদের দাদনের টাকা বেমালুম হজম করে বসে থাকবে, আর আমরা তা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখব। আর সে টাকার হিসেব যখন আমাকে দিতে হবে, তখন তেনাকে ছেড়ে দিই কী করে?'

'তা তুমি কী করলে?'

'কী আর করব সাহেব!' তক্কে তক্কে থেকে একদিন গোঁসাইকে ফাটক বন্দি করে ফেললাম! তারপর কুঠির জমাদারদের দিয়ে গোঁসাইকে উত্তম মধ্যম দেওয়ার ব্যবস্থা হল। মার খেয়ে গোঁসাই টিট্। জমাদারদের হাতের মার। বেচারার আঁতে লাগল। পুরো একদিন সে জলস্পর্শ করল না। তারপর দিন সকালবেলা দেখি এক কাণ্ড! গোঁসাই গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে আছে ফাটকের ঘরে। তা গোঁসাই যে এমন একটা কাণ্ড করতে পারে, আমার কাছে অপ্রত্যাশিত ছিল না। এ অনন্তরাম একটুও অবাক হয়নি। অবাক হয়েছিল কেবল একটা ব্যাপারে।'

'কী সে ব্যাপার?' চার্ণক ব্যাপারটি জানতে চেয়েছিল।

অনন্তরাম মাথা চুলকিয়ে বলেছিল, 'আঁজ্ঞে সেটা হল ঐ দড়ির ব্যাপার। ফাটকের ভেতরে একখণ্ড বাড়তি বস্ত্র থাকারও কথা নয়। তা সেখানে সে দশহাতি একটা শক্ত রশি জোগাড় করল কেমন করে? গোঁসাইজির যে এলেম আছে, তা সেদিন এই অনন্ত-রামকে স্বীকার করতে হয়েছিল। আমি হার মেনেছিলাম হুজুর।'

দালাল অনন্তরামের মুখের দিকে সেদিন হাঁ করে চার্ণক সাহেবকে তাকিয়ে থাকতে হয়েছিল। লোকটা যে ভয়ঙ্কর রকমের করিতকর্মা, তা চার্ণককে বারবার তারিফ করতে হয়েছিল। তবে সে শঙ্কিতও হয়েছিল, এ মানুষ কখন কাকে ফাঁসায় কে জানে?

'এই যে একটার পর একটা খুন হয়ে গেল। এর জন্য আমাদের কুঠিকে ঝামেলায় পড়তে হয়নি?'

'হয়নি আবার? খুব ঝামেলায় পড়তে হয়েছিল। বেদম ঝামেলায় পড়তে হয়ে-ছিল।' অনন্তরামের মুখে আবার সেই অমায়িক হাসি। 'তবে ঝামেলাটা বেশি হয়ে-ছিল রঘু পোদ্দারের খুনটা নিয়ে। কেননা, রঘু কুঠির খাজাঞ্চি হলেও, প্রজা ছিল

মুঘল বাদশার। তাই গোলমালটা বেশ জোর পাকিয়ে গিয়েছিল। শায়েস্তা খাঁর সেরেস্তা থেকে এ খুনের তদন্ত হয়েছিল। হ্যাপা অনেক দূর গড়াত। নগদ তেরো হাজার টাকা খরচ করে খুনটা চাপা দিতে হয়েছিল।'

'টাকাটা দিয়েছিল কে?'

'কে আবার দেবে? কোম্পানির কয়েদখানায় খুন হয়েছে। কোম্পানিই গুনে গুনে টাকাটা দিল।'

চিড়বিড়িয়ে উঠল সারা গা। ঝাঁকে ঝাঁকে মশা এসে যে ঘিরে ফেলেছে, তা বেহুঁশ থাকার জন্য খেয়াল হয়নি। বাতাসটাও এখন একটু কম। ধীরে ধীরে চাঁদটাও হেলে পড়েছে। সেই বিদিকিচ্ছিরি ভুতুড়ে শব্দটাও একটু ঝিমিয়ে পড়ছে। নিজেই নিজের গায়ে বার কয়েক চাপড় বসাল চার্ণক।—সুতানুটির মশা বড়ই রক্তচোষা।

মাদ্রাজের কাউন্সিল থেকে বিলেতের অফিসে ঘন ঘন চিঠি যাচ্ছে, 'বাঙ্গালার ফ্যাক্টরেরা স্বেচ্ছাচারী হইয়াছে। বাদশাহী ছাড় ও নিশান তাহাদের হস্তগত থাকায়, তাহারা নিজেরাই ব্যবসা চালাইতেছে। ইহাতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির যথেষ্ট অর্থক্ষতি হইতেছে।'

চিঠিগুলি সত্যি সত্যিই উদ্‌বেগজনক। তবে চিঠিতে যা লেখা হয়েছিল, তার থেকেও উদ্‌বেগজনক ঘটনা চোখের সামনেই দেখতে পেত চার্ণক। এইসব কাজের সঙ্গে যারা জড়িয়েছিল, তাদের নাম দেওয়া হয়েছিল 'ইন্‌টার লোপার'। এই ইন্‌টার লোপারদের অনেকেই কোম্পানির গা-ঘেঁষে থাকত, কেউ দূরে দূরে। এরা বেনামে ব্যবসা চালাত। নতুবা গোপনে। রাশি রাশি মাল সওদা করে নৌকো বোঝাই করে চালান দিত। নদীপথ থেকে বেরোতে পারলেই সমুদ্র। সে সময়ে সাগরে পাড়ি দেবার জন্য ভাড়া জাহাজের অভাব হত না। একটু বেশি পয়সা কবুল করলেই হার্মাদদের জাহাজ মিলে যেত। নতুবা দিনেমার বা ডাচেদের।

তবে গোলমাল ছিল কুতঘাটায়। এখানে ছিল মুঘলদের চৌকি। 'নিশান' বা বাদশাহী ছাড় দেখাতে না পারলে ঐ মুঘল চৌকি থেকে মাল বের করা ছিল রীতিমত কঠিন। ইনটার লোপারদের এইখানেই ছিল প্রকৃত দু'নম্বরি ব্যাপার। কোম্পানির 'নিশান' আর 'ছাড়' ব্যবহার করে তারা কুতঘাটার চৌকি পার করত। —জোব চার্ণক এই ব্যাপারটাকে মনে প্রাণে ঘৃণা করত। এই ইন্‌টার লোপারদের কেউ কেউ তুর্কি সওদাগরদের কবজা করে নতুন একটা কোম্পানিই খাড়া করতে চেয়েছিল। কোন কোনও ওলন্দাজ আর বাঙালি ব্যবসাদার এগিয়ে এসেছিল ঐসব বদমাসদের সাহায্য করতে। —চোখের ওপর এসব কাণ্ডকারখানা দেখেছিল চার্ণক, আর এদের থেকে সর্বদা শত হস্তের দূরত্ব রক্ষা করত।

'তুমি কি কোম্পানিকে ডোবাতে চাও? তুমি কি ইন্‌টার লোপারদের ভেতরে ভেতরে সাহায্য কর?' হেজেস্‌ একদিন অগ্নিমূর্তি হয়ে জিজ্ঞেস করল চার্ণককে।

মুহূর্তে চার্ণকের চোখমুখ লাল হয়ে উঠল। ঠোঁট দুটো কাঁপতে থাকল। সে বুঝতে পারল যে, তার ভেতর থেকে জেগে উঠছে বিস্ফুভিয়াস।

'ভুলে যাবেন না অনারেবল্ হেজেস্, আমি কাশেমবাজার কুঠির মাথা ! আমি মনে করি, এ জিজ্ঞাসা আমার কাছে অপমানজনক।'

'তা যারা যারা কুঠির মাথা হয়ে বসে আছে, তারা সবাই একেবারে ধোয়াতুলসি পাতা নাকি ? আমি হুগলি কুঠির অধ্যক্ষ ভিন্‌সেণ্টকেও অভিযুক্ত করেছি। তা সে আমার অভিযোগের জবাব দিতে পারেনি। বলেছে, এসব কথার উত্তর আমি বিলেত গিয়ে দেব।'

'আমি কিন্তু তা বলছি না। আমি বলছি ইন্‌টার লোপারদের আমি ঘৃণা করি। সুতরাং ঐ ঘৃণ্য লোকদের জড়িয়ে আমাকে কিছু বলা মানে, আমাকেও ঘৃণ্য জীব বলে গণ্য করা। অপমান করা। আমি যা নই, অনুগ্রহ করে তা আমাকে সাজাতে চেষ্টা করবেন না।'

'কোম্পানির ব্যবসা এদেশে গড়ে উঠুক, তা কি তুমি চাও ?'

'চাই-চাই-চাই ! আমার মতো এই চাওয়াটা অনারেবল হেজেসও বোধহয় চান না। চাইলে এমন কথা কখনও আপনি আমাকে জিজ্ঞাসা করতে সাহস করতেন না। আজ তিরিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে আমি কোম্পানির জন্য প্রাণপাত করে চলেছি, তা শুধু শুধু নয়। আমি আছি, অথচ কোম্পানি নেই—একথা আমি ভাবতে পারি না।'

অনারেবল হেজেস নির্বাক হয়ে অনেকক্ষণ ধরে চার্ণকের মুখের দিকে তাকিয়ে কী যেন খুঁজতে চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু দুঃখের ব্যাপার এই, চার্ণককে বোঝবার মতন মন ঈশ্বর তাঁকে দেননি। সুতরাং চার্ণককে ভুল বুঝতে তাঁর দেরি হল না। হেজেস্ এরপর যা করতে থাকলেন, তা যেমন নাটকীয়, তেমনি চমকপ্রদ। প্রথমেই চাকরি ছুটে গেল নেলরের। চাকরি ছুটে গেল অনন্তরামের। ছুটে গেল এলিসেরও।

'এলিস ! তুমি কোম্পানির কাজে দালালি খাও ?'

'তা খাই। কিন্তু আমি ইন্‌টার লোপার নই।'

'তুমি চার হাজার টাকা ঘুষ নিয়ে কোম্পানির গুদাম থেকে মাল সরিয়েছ ?'

এলিস মাথা চুলকে বলল : 'গুদাম থেকে মাল কিছু সরিয়েছিলাম। কিন্তু তা বোধহয় চার হাজার টাকার হবে না ! হলে শ নয়েক টাকার হতে পারে।'

'তুমি কবুল করছ শ নয়েক টাকার চুরির ?'

'তা করছি। তবে এটাকে চুরি বোধহয় বলা যায় না। তালে গোলে খরচ হয়ে গেছে।'

'তুমি রাত্তিরবেলা নিজের কুঠিতে থাক, না থাক না ? দেশি মেয়েদের নিয়ে র‍্যালা কর ?'

এলিস মাথা চুলকে সে দোষও স্বীকার করল। কেবল স্বীকার করেই থামল না, চার্ণককে জড়িয়ে একটি বেফাঁস কথাও বলে ফেলল। বলল, 'তা হুজুর, বয়স থাকলে বয়সের দোষও হয়। আমাদের কর্তারও এককালে ছিল। তেনার পিঠ খুঁজলে, হয়ত

শুকিয়ে যাওয়া চাবুকের দাগ আজও খুঁজে পাওয়া যাবে। পরের বৌকে ঘরে আটক রাখার জন্য তিন হাজার টাকার জরিমানা তেনাকেও দিতে হয়েছিল পাটনার নবাবি সেরেস্তায়।' এলিস কেবল এখানেই থামেনি, সে গড়গড় করে আরও উদাহরণ দিয়ে গিয়েছিল, 'অনারেবল হুজুর হেজেস কি জানেন না, রালফ্ কার্টরাইটের কথা ? তিনি কি এক মুসলমান প্রতিবেশীর স্ত্রীকে ফুসলে বের করে নিয়ে এসে অবৈধ সম্পর্ক তৈরি করে দীর্ঘদিন থাকেননি ? হেনরি গ্রিন্‌হিল, টমাস চেম্বার বা গ্যাব্রিয়েল বুটনকে হেজেস্ সাহেব চেনেন না ? তাঁরা যদি কোম্পানির চোখে দোষি না হন, আমার দোষটা কোথায় ?'

এমন সুন্দর সওয়াল করার পরেও বেচারি এলিসের চাকরি ছুটে গেল। চার্ণককে তার সওয়ালে কেচ্ছার দৃষ্টান্ত হিসাবে ব্যবহার করা সত্ত্বেও চার্ণকই তাকে কাছে টেনে নিয়েছিল। নেলর ও অনন্তরামকেও আড়াল করতে চেষ্টা করেছিল সে। এমনিভাবে একদা এক বিপন্ন ও অসহায় পরস্ত্রীকে আশ্রয় দিয়েই সে নিজের বিপদ ডেকে এনেছিল, চাবুক খেয়েছিল, নিজের ট্যাক থেকে টাকা বের করে জরিমানা দিয়েছিল, নিজেকে কালিমালিপ্ত করেছিল। তবু চার্ণক পিছিয়ে আসেনি। কেননা, সে কেবল নিজে বাঁচতে চায়নি, সকলকে নিয়ে বাঁচতে চেয়েছিল। আর এরা সবাই না বাঁচলে, কোম্পানি বাঁচবে কী করে ?

সারা গাটা আবার চিড়বিড়িয়ে উঠল। ঝাঁক ঝাঁক মশা। পাগলের মতো নিজেকে চাপড়াতে থাকল চার্ণক। সুতানুটির আকাশে চাঁদের আলো আরও যেন মায়াবী হয়ে উঠল। এই মুহূর্তে আকাশের চাঁদটাকেও কেমন যেন রহস্যময় মনে হতে থাকল তার। সেই বিদিকিচ্ছিরি শব্দটা ঘুমিয়ে পড়েছে, বাতাসও স্তব্ধ, শেয়ালের ডাক আর শোনা যায় না, তা সত্ত্বেও গায়ের চিড়বিড়ানি যায় না। পাগলের মতো নিজেকে আবার চাপড়াতে থাকল চার্ণক।

'এ কী জোব, তুমি আবার বিছানা থেকে উঠে এখানে বেরিয়ে এসেছ ?' হঠাৎ মহিলা কণ্ঠে ভেসে এল অনুযোগ।

চমকে উঠল চার্ণক। হলুদ জ্যোৎস্না এসে পড়েছে যার মুখে, এই মহিলাই তার স্ত্রী। এই মহিলা নিজেও জানে না, তাকে ঘিরে লোকের কত জল্পনা-কল্পনা। এই মহিলাকে নিয়ে কত কৌতূহল। কত জিজ্ঞাসা। আর একে ঘিরে চার্ণকের কত যন্ত্রণা। কত ব্যথা। আবার কত ভালবাসাও। তিন কন্যার জননী হলেও, এ মহিলা আজও তার কাছে রহস্যময়ী। সুতানুটির হলুদ জ্যোৎস্নায় তাকে আরও রহস্য জটিল মনে হল।

'কী হল, হাঁ করে কী দেখছ জোব ! ঘড়িতে এখন কটা বেজেছে জান ?'

'জানি না। তা অনেক রাত হবে, তাই না ?'

'রাত তিনটে। সকাল হতে খুব দেরি নেই ! শুয়ে পড়বে চল। দিনের বেলায় তোমার বিশ্রাম নেই। পশুর মতো খাট। এরপর রাত্তিরেও যদি এভাবে জেগে জেগে কাটাও, তা হলে শরীর থাকবে কী করে ? শরীর ভেঙে যাবে। সুতানুটির মাটিতেই আমাদের কবর নিতে হবে।'

এতক্ষণে চার্ণকের খেয়াল হল যে, তার স্ত্রী অসুস্থ। কয়েকদিন ধরেই গায়ে রয়েছে জ্বর। দুর্বল। এক কবিরাজ এসে চিকিৎসা করে যায়। সাহেব বা ফিরিঙ্গি চিকিৎসক তার স্ত্রীর পছন্দ নয়। সুতরাং অনেক ভেবেচিন্তে সুতানুটির চাঁদু কবরেজের ওপরই ছেড়ে দিতে হয়েছে স্ত্রীর চিকিৎসার ভার।

'আজ তুমি কেমন আছ ডার্লিং! দেখি তোমার গা!'

গায়ে হাত দিয়ে চমকে উঠল চার্ণক। জ্বরের তাপে গা পুড়ে যাচ্ছে। এ জ্বরের সঙ্গে নিশ্চয় অনুরূপ যন্ত্রণাও রয়েছে!

'কী, চমকে উঠলে?'

'চমকাব না! তুমি এই জ্বর নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলে কেন? আমি ঠিক বিছানায় গিয়ে শুতাম।'

'না, শুতে না। তোমার ঘাড়ে এক দানো চেপেছে। এই সুতানুটির দানো। এ জায়গাটা বড় খারাপ জোব! আমাদের সকলকে এ জায়গাটা খেয়ে ফেলবে। বরং চল আমরা আবার পাটনায় চলে যাই। গণ্ডকের ধারে। সিংঘিয়ায়।'

হা হা করে হেসে উঠল চার্ণক। যেন ভারি এক মজার কথা শোনা গেছে। পিছনে ফিরে যাওয়া? হাসি থামিয়ে চার্ণক বলল, 'এক নদীতে দু'বার স্নান সম্ভব নয়, ডার্লিং। যে জলে আমরা সেদিন স্নান করেছিলাম, সে জল এতদিনে সাগরে পোঁছে গেছে। আমরা এখন নতুন জলে স্নান করব। সুতানুটি আমাদের সেই নতুন জল দেবে। সুতানুটি আমাদের নতুন ঘাট। তা হোক না কেন জীবনের শেষ বন্দর।'

আরেকটু পরেই সুতানুটির আকাশ ফরসা হল। লাল আভা দেখা দিল নোনাবাদার ওদিকে। সে রাতে ফাগুলালের চোখেও ভাল ঘুম ছিল না। বেচারা সারারাত ঘরবার করেছে। কিন্তু কিছুই সিদ্ধান্তে আসতে পারেনি। ভোরের দিকে বিছানায় মাথাটা ঠেকাতেই ঘুমিয়ে পড়ল।

দরজার পিছনে প্রবল ঝনঝন্। সঙ্গে আওয়াজ, 'কী ফাগুলাল, ঘুম ভাঙল নাকি! ফাগুলাল—'

ফাগুলাল ধড়মড়িয়ে উঠে বসল। এ যে তার মালিক বদ্রীদাসের কথা! দৌড়ে বেরিয়ে এল। বেরিয়ে এসে দেখল বদ্রীদাসের চোখে মুখে স্পষ্ট রাত্রি জাগরণের চিহ্ন। দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত। গমগমে গলায় বলল: 'হ্যারে, নয়নতারা কোথায় জানিস? কাল থেকে তার কোনও খোঁজ পাচ্ছি না! নিশ্চয় তুই তাকে কোথাও লুকিয়ে রেখেছিস্। ঠিক করে বল্। নইলে আমি তোকে কোতোয়ালিতে চালান দেব।'

'আঁজ্ঞে, আমি কিস্সু জানি না। সে বেটি যে উধাও, তা আপনার মুখেই এই প্রথম শুনলাম!'

'মিথ্যে কথা!' ধমক দিয়ে উঠল বদ্রীদাস, 'তোদের খবর সবাই জানে। বাতাসি আমার মাকে তোদের সব কথা বলেছে!'

॥ ছয় ॥

নয়নতারা চোখ মেলে চাইল। যেন সকালবেলা সে ঘুম থেকে উঠল।

তা প্রথমে তার সেই রকমই মনে হয়েছিল। চারদিক শুনশান। জনমনিষ্যির গলার স্বর শোনা যায় না। কেবল পাখির কিচির মিচির। মাথাটা বেদম হালকা। কোনও কথাই তার স্মরণে আসছে না। একবার মনে হল সে তাদের চৌবাঘার বাড়িতে শুয়ে আছে। তাদের ছাঁচতলার পেয়ারা গাছে ঝাঁক ঝাঁক টিয়াপাখি এসেছে পেয়ারা খেতে। তাই এমন কিচির মিচির। আবার পরের মুহূর্তেই মনে হল, কোথায় চৌবাঘা! সুতানুটিতে বদ্রীদাদাবাবুর বাড়িতে কোণার ঘরটিতে অসুস্থ হয়ে সে শুয়ে আছে। এখনই বুঝি দাদাবাবুর পুজোর মন্ত্র পড়ার সেই ভারি গলা শোনা যাবে! তাহলেও অনেক বেলা হয়ে গেছে! এখনই বুঝি গিন্নীর গলার ঝংকার বেজে ওঠে! অ, পোড়ারমুখি, নয়নতারা, মলি নাকি রে!

নয়নতারা আবার চোখ মেলে চাইল। অনেক দূর থেকে ভেসে এল জাহাজের ভোঁ। এই ভোঁ শব্দটি নয়নতারার ভারি পরিচিত। কেননা, এই সময়েই ফাগুলাল তার ঘর থেকে আড়তে যায়। আর সে যায় থালা বাসন নিয়ে ঘাটের পথে। এক লহমার দেখা তবু চোখাচোখি হয়। ইদানীং চোখে চোখে ইশারা হয়। ফাগুলাল তাকে দুপুরে আসবার জন্যে চোখ ঠারে! নয়নতারাও একটু ছেনালি করে। ইচ্ছে করেই বুকের আঁচলটা আলগা করে দেয়। ফাগুলালের লোভী চোখ দুটো চক্‌চক্‌ করে ওঠে। নয়নতারা ফাগুলালের ঐ অবস্থা দেখে ভারি মজা পায়। খুক খুক করে হাসে। পুরুষমানুষদের এই বেকুব অবস্থাটা দেখতে সে ভারি মজা পায়।

মাথাটা আজ বেবাক ফাঁকা। জাহাজের ভোঁ বেজে গেল। অথচ সে উঠতে পারছে না। কী এমন ব্যারাম হল রে বাবা! দাঁত ছিরকুটে সে পড়ে থাকবে নাকি?

উঠতে গেল। আর উঠতে গিয়েই নয়নতারা টের পেল যে, সে এমন এক জায়গায় শুয়ে রয়েছে, যে জায়গাটা তার সম্পূর্ণ অজানা। অচেনা। যে বিছানায় শুয়ে রয়েছে, এই বিছানাটিও তার নয়, সেই হুমদো সাহেবটার, নয়নতারার গা ঘিন্‌ঘিন্‌ করে উঠল। হায়রে, কপালে এত ছিল! ফিরিঙ্গি সাহেবের বিছানা! উঠতে গিয়ে আরেকটা জিনিস টের পেল নয়নতারা। তার পায়ের গোড়ালির কাছে বেদম ব্যথা! পা মুচকে গেলে কি এমন ব্যথা হয়! ব্যথাটা বোঝবার জন্য নয়নতারা উঠে বসল। আর উঠতে গিয়ে আরও যে বিষয়টি সে টের পেল, তা হল তার পরনের শাড়িটা বেমালুম লোপাট। পরনে তার শাড়ি নেই। পরিবর্তে সে পরে আছে একটি বালিশের খোলের মত পোশাক। ঢোলাঢিলে পোশাক। মেম সাহেবগুলো যেমন পরে থাকে। নয়নতারার গা ঘুলিয়ে উঠল।

এবার একে একে তার সব স্মৃতিটায় ফিরে এল। নয়নতারা আর পাঁচটা মেয়ের মত ভিতু নয়। বরাবরই সে একটু ডাকাবুকো। সহজে ভরকায় না। জীবনে কখনো সে ভিরমি খায়নি, দাঁতে দাঁত লাগেনি। কিন্তু সেই নয়নতারাই টের পেল যে, ঘেঁটুবনের উঁচু ঢিবি থেকে গড়িয়ে পড়বার সময় দাঁতে দাঁত লেগে যাচ্ছে। আর ঘোড়ার পায়ের তলায় পড়বার সঙ্গে সঙ্গে তার জ্ঞানলোপ। এই বেঘোর অবস্থাটা ঠিক কতক্ষণ ছিল, তা তেমন ঠাহর করতে পারছে না সে। তবে সন্ধ্যের সময় সম্ভবত তার একটু একটু জ্ঞান ফিরেছিল। চোখ মেলে সে একটু তাকিয়ে দেখেছিল। কিন্তু তাকিয়েই সে যা দেখেছিল, তাতে তার চিত্তির চড়কগাছ। সেই হুমদো সাহেবটা তার বিছানার ওপর ঝুঁকে পড়ে তার দিকে ড্যাবডেবে নীল চোখ মেলে তাকিয়ে দেখছিল এক দৃষ্টিতে।

'ডর নাই। তুমি ভয় পাইয়ো না। তোমার কোথায় লাগিয়াছে বল। আমার কাছে উত্তম মেডিসিন আছে। তোমার চিকিৎসা হইবে।'

সাহেবের ঐ ন্যাকা ন্যাকা কথা শুনে নয়নতারার মেজাজ হঠাৎ গরম হয়ে গেল। তখন সে ঐ গরম মেজাজে চোখ পাকিয়ে বলল ; 'দোহাই সাহেব! তোমাকে আর কিস্সু করতে হবে না। তুমি একটা বদমাস।'

'টমাস! নো, নো, আমি টমাস নহি। আমি এলিস্। আমি কোম্পানির কর্মচারী।'

নয়নতারা বিরক্ত হয়ে বলল : 'তুমি একটা নচ্ছার! তোমার কোম্পানির পায়ে ধরছি, আমাকে ছেড়ে দাও।'

'বেদনা তোমার পায়ে ধরছে! ইয়েস্ দ্যাট্স পসিবল্। তোমার পাটা তাহলে পরখ করার দরকার হবে। দেখি তোমার পা!'

সাহেব পায়ে হাত দিল। নয়নতারা দমাদম্ পা ছুড়ে বলল : 'আলুস সাহেব! তোমার মুখে লাথি। তোমার চোদ্দো পুরুষের মুখে আমি গোড়ালি মারি।'

সাহেব শঙ্কিত হল। এলিসের মনে হল নয়নতারার পায়ে বড় ব্যথা। এত ব্যথা যে, হাত দেওয়া যাবে না। নয়নতারার বড় বড় চোখ দুটি দেখে সাহেবের বড় মায়া হল। ব্যথা উপশমের জন্য সেই সময় সাহেবের হাতে একটা দাওয়াই ছিল, তা হল সদ্য বিলেত থেকে আমদানি করা এক বোতল হুইস্কি। সাহেবের মনে হল, এই বেঙ্গলি গার্লকে এক পেগ্ বা দুই পেগ্ হুইস্কি খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দেওয়া যাক। তাহলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। ব্যথা-বেদনার উপশম হবে। সাহেব নয়নতারার কথা ভেবেই হুইস্কির বোতল খুলল। নয়নতারা ঝঙ্কার দিয়ে উঠল, 'বুঝেছি সাহেব, তোমার উদ্দেশ্য ভাল নয়। তুমি আমার ধর্মনাশ করতে চাও। মদের বোতল নিয়ে বসেছ বদ মতলব নিয়ে। তোমার মতলব আমি হাসিল হতে দেব না।' এই বলে তড়াং করে লাফিয়ে উঠে নয়নতারা ঘর থেকে বাইরে যেতে চেষ্টা করল।

কিন্তু সে সুযোগ এলিস তাকে দিল না। সে লাফিয়ে উঠে নয়নতারাকে ধরে ফেলল। চ্যাং দোলা করে তুলে নিয়ে এসে বিছানায় শুইয়ে দিল। কেবল তাই নয়। তাকে জোর করে হাঁ করিয়ে গেলাসে-ঢালা হুইস্কি তার মুখে ঢেলে দিল। নয়নতারা হাত পা নেড়ে বাধা দেবার চেষ্টা করল! কিন্তু মদের গন্ধে বেচারি কাবু হয়ে গেল এবং তারপরই অজ্ঞান। বেঘোর।

নয়নতারা এখন বুঝতে পারল যে, সেই সন্ধ্যের পর এখন তার ঘোর ফিরল। তা ঘোর ফিরলে কী হয়, শরীরটা বেজায় কাহিল! মুচকে যাওয়া পায়ে ব্যথা। আর তার থেকেও যে লজ্জার ব্যাপারটি তাকে ঘায়েল করল, তা হল তার বালিশের খোলের মতো এ পোশাক। এ পোশাক তাকে কে পরালে! ঐ আলুস সাহেব? ছি-ছি! ঐ পোড়ারমুখো সাহেবটা তাহলে তার শাড়িও তো খুলেছে! ইজ্জতের সবটাই তাহলে মাটি! বেচারি নয়নতারা বড়ই মুষড়ে পড়ল। গা ঘিন ঘিন করতে থাকল। এবং এই অবস্থাতেই তার মনে হল, এ জায়গা থেকে এখনই পালানো দরকার যেভাবে হোক। যেমন করে হোক। সাহসে বুক বেঁধে সে বিছানা থেকে নেমে মেঝেতে দাঁড়াল।

ঠিক সেই মুহূর্তে দরজার কাছে একটি ছায়া পড়ল। নয়নতারা অসহায় বোধ করল। এখন সে কী করবে? বিছানায় শুয়ে পড়বে?

সামনে ছায়া ফেলে যে এসে ঘরে ঢুকল, সে সাহেব নয়। এক বুড়ি। শোনের নুড়ির মতো পাকা চুল। দাঁত নেই। চোপসানো গাল। খ্যানখেনে গলায় বুড়ি বলল, 'তা এতক্ষণে বুঝি নবাবের বিটির ঘুম ভাঙল?'

'সাহেব কোথায়? সেই আলুস সাহেব?' ভয়ে ভয়ে তবে একটু সাহস সঞ্চয় করে জিজ্ঞাসা করল নয়নতারা।

'কোথায় আবার? তিনি আছেন তেনার কুঠিতে। সময় হলেই তিনি আসবেন। তা আমাকে বুঝি তোমার পছন্দ হল না?'

'কিন্তু আমি আছি কার কুঠিতে? আর তুমিই বা কে?'

বুড়ি হাসল। ফোকলা দাঁতে বীভৎস হাসি। চোখদুটি কোটরের ভেতর ঢুকে গেছে। ভুরু দুটো ঝুলে পড়েছে। খ্যানখেনে গলায় বুড়ি বলল: 'তোমার কৈফিয়তের জ্বালায় তো গেনু। এখেনটা হল সাহেবের সখের বাড়ি। আরাম বাড়ি। আমি সাহেবের ঘর-দোর দেখি। আর আমার ছেলে কুঞ্জ দেখে সাহেবের বাগান। তা তোমার এত খোঁজ কেন বাপু! নবাবের বিটি হলে কি এমনি হয়?'

নয়নতারা এবার সত্যি সত্যি খানিকটা সাহস পেল। আলুস সাহেব নেই বলেই, সম্ভবত তার এই সাহস জাগল। একটু রাগতভাবেই সে বলল, 'আমাকে এই পাশ বালিশের খোল কে পরালে? আমার শাড়ি কোথায় গেল?'

মাছি তাড়ানোর মতো করে মুখের কাছে হাত নেড়ে বুড়ি বলল, 'তোমাকে বালিশের খোল পরাব কেন গা? ও যে সাহেবি পোশাক। ম্যামেরা পরে। তা

আমিই তোমাকে ওটা পরিয়ে দিন্। ভাবলাম, তুমি সাহেবের ঘরে ম্যাম হতে এয়েচ। তা এ পোশাক যদি তোমার অপছন্দ হয়, তোমাকে শাড়িই পরতে দেব।'

থপ্ থপ্ করে পা ফেলে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে একটা বাক্সের ডালা খুলে বুড়ি তার শাড়িটা বের করে আনল। বের করে এনে নয়নতারার হাতে তুলে দিল। তারপর সেই পুরনো খন্খনে গলায় বলল: 'সাহেব বলে গেছে তোমার জন্য দেশিখানা পাকিয়ে দিতে। তা তুমি কি খাবে বল? ভাত খাবে, না দই চিঁড়ে খাবে? যদি ভাত খাও তো রান্না করতে একটু সময় লাগবে। আর দই চিঁড়ে খেলে এখনই হয়ে যাবে। কেবল কলাটা হাট থেকে আমি কিনে আনব, এই যা! এখন বল, ভাত না ফলার, কোন্টা খাবে?'

বাইরে চন্মনে রোদ্দুর। বসন্তের এই সকালটা যত মনোরম, দুপুর ততটা নয়। বেলা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে রোদ্দুরের তাত বাড়ছে। এই রোদ্দুরের দিকে তাকিয়ে নয়নতারা বলল, 'ভাত খেতে এই সময় কারও আপত্তি হয় নাকি! চিঁড়ে-দইয়ের ফলার মন্দ নয়। তা তুমি কি খাও?'

'এখানে থাকলে আমি চিঁড়ে দইয়ের ফলার খাই। কেরেস্তান বাড়িতে ভাত খেয়ে আমি কি জাতটা দেব।'

'তাহলে আমিও জাত খোয়াতে রাজি নই। আমিও ফলার খাব। চিঁড়ে-দই ভাল।'

খ্যানখেনে গলায় বুড়ি নয়নতারাকে ধন্যবাদ জানাল। বলল, 'তাহলে যাই, হাট থেকে নিজের হাতেই এক ছড়া কলা নিয়ে আসি। ঘরে মণ্ডা আর দই চিঁড়ে আছে।'

বুড়ি কলা আনতে বেরিয়ে গেল। নয়নতারাও ব্যথা পায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে উঠে বুঝল যে, ব্যথা আছে পায়ে, কিন্তু তাতে খুঁড়িয়ে চলা আটকাবে না। বালিশের খোলের মত ম্যামসাহেবের পোশাকটা বদলে শাড়ি পরে নিল। মনে মনে সে চিত্তেশ্বরী মায়ের পুজো মানত করল। খুব রক্ষে, তার অঙ্গ থেকে সাহেব শাড়ি খুলে নেয়নি। বুড়িই নিয়েছে, আবার বুড়িই পরিয়ে দিয়েছে ঐ বালিশের খোলটা। কিন্তু বুড়ির মতলবটা কী? ও কি কুট্নী মাগী? আলুস সাহেবকে ছুঁড়ি ধরে দেয়। নয়নতারার বুকটা ধড়াস্ করে উঠল।

খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে নয়নতারা ঘর থেকে বাইরের দাওয়ায় বেরিয়ে এল। দাওয়ার নিচে অনেকখানি খোলামেলা জায়গা। চারদিকে ফুলের বাগান আর মাঝখানে ঘর। বাগানে নানান ধরনের ফুলের গাছ রয়েছে। ফুলের রংও নানা রকমের। বেশির ভাগ ফুলই সে চেনে না। কোনও কোনও গাছ বেশ বড়সড়। ঝাপড়ি-ঝুপড়ি। কোনও কোনওটি খুবই ছোট। নয়নতারা অবাক হয়ে দেখল, নানারঙের নয়নতারা গাছও আলুস সাহেবের বাগানে রয়েছে।

নয়নতারা বাগানে নামল। বুড়ির ছেলে কুঞ্জ কোথায় আছে খুঁজতে চেষ্টা

করল। কিন্তু কুঞ্জ নেই। কোথাও সে কুঞ্জকে দেখতে পেল না। নয়নতারা নির্বোধ নয়। সে বুঝল, এটাই পালাবার সুবর্ণ সুযোগ। সুতরাং খোঁড়াতে খোঁড়াতে সে সাহেবের বাংলো পেরিয়ে জঙ্গলের পথ ধরল। জঙ্গল ডিঙিয়ে নদীর ধার।

দুপুরে জাহাজের ভোঁ বাজল। এই ভোঁ বাজলেই আড়তের দরজা বন্ধ করে ফাগুলাল তার ঘরে ফিরে আসে খাবার জন্য। আজও যাবার জন্য সে প্রস্তুত হল। কিন্তু পরমুহূর্তেই তার মনে হল, বাসায় ফিরে তার কী লাভ? শুধুই খাওয়া? আগে হয়ত এই খাওয়ার জন্যেই যেত, কিন্তু নয়নতারার আকর্ষণ ঐ খাওয়াকে একেবারেই মাটি করে দিয়েছে। খাওয়া এখন গৌণ, নয়নতারার আকর্ষণই ফাগুলালের মনে প্রবল। গতকালও সে নয়নতারার কথা ভাবতে ভাবতেই বাসায় ফিরেছিল। নয়নতারার আকর্ষণ যে কী উত্তেজক এবং কি প্রবল, তা এই মুহূর্তে টের পাচ্ছে ফাগুলাল। অথচ এই নয়নতারাকে সে আবাহন করে ঘরে আনেনি। বিধাতার অযাচিত দান যেন এই নয়নতারা। বাতাসির জন্য যখন সে প্রায় পাগল হয়ে গিয়েছিল, তার বুকের ভিতরটা মরুভূমির মতো খাঁ-খাঁ করছিল, ভেতরের জ্বালা জুড়োবার জন্য ভগবান যেন তাকে পাঠিয়ে দিল। কাল রাত্তিরটা নয়নতারার ভাবনায় তার ভাল ঘুম হয়নি। আজও ফাগুলালের সেই একই চিন্তা। এলিস্ সাহেবের মুখোমুখি যদি ফাগুলাল গিয়ে দাঁড়াত, তাহলে বোধহয় এ ঘটনা ঘটত না। বেওয়ারিশ মেয়েছেলে ভেবে সাহেব তাকে তুলে নিয়ে গেল। অমন ডবকা মেয়েটাকে এলিস ভোগ করবে? ফাগুলাল যদি নয়নতারাকে বিয়ে করত, তাহলে কি গা ঢাকা দিয়ে বসে থাকতে পারত? বদ্রীদাস তাকে সন্দেহ করছে। ভাবছে সে বুঝি নয়নতারাকে কোথাও চালান করে দিয়েছে। আর তার মনে এই ধন্দটা ঢুকিয়ে দিয়েছে বাতাসি। তাহলে বাতাসি কি নয়নতারার ব্যাপার স্যাপার জানত? যদি বাতাসি ঐ সব খবর-টবর জেনে থাকে, তাহলে নয়নতারাই তাকে বলেছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে নয়নতারা ভেতরে ভেতরে তাকে ফাঁসিয়ে গেছে। বাতাসির কাছে তার ফিরে যাবার পথটা একেবারে বন্ধ করেই দিয়ে গেছে। একেই বলে মেয়েদের ঈর্ষা!

ফাগুলাল বুঝতে পারছে যে, তার ভাবনাগুলো এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। কখনও কখনও তার মনে হচ্ছে যে, সে নয়নতারাকে ভালবাসে। একেবারে সত্যি সত্যিই ভালবাসে। আবার কখনও মনে হচ্ছে যে, সে নয়নতারাকে ঘৃণা করে। তার কাছ থেকে অব্যাহতি পেলে বাঁচে। কখনও মনে হচ্ছে, সে যদি কোনওরকমে নয়নতারাকে ফিরে পায়, তাহলে এবার তাকে বিয়ে করবে। আর ছেড়ে দেবে না। নয়নতারাতেই তার মন মজবে। সুতানুটিতে তেমন জাতপাতের বিচার নেই। নয়নতারাকে কায়স্থকন্যা বলে চালিয়ে দেওয়া যাবে। মালিক বদ্রীদাস ছাড়া ওর পরিচয় আর কেউ জানে না। কেবল বদ্রীদাসকে লুকোতে পারলেই কেল্লা ফতে।

আর এটুকু কি সে পারবে না ?

সুতানুটির হাট থেকে বদ্রীদাসের কুঠি তেমন দূরের নয়। আগে ডাঙ্গা ডহর আর বন জঙ্গলের ভেতর দিয়ে অতি অল্প সময়ের ভেতর পৌঁছানো যেত। ইদানীং বন কেটে বসত উঠছে। জায়গা চৌরস করে রাস্তা তৈরি হচ্ছে। এসব বিষয়ে ফিরিঙ্গি ইংরেজদের উৎসাহই বেশি। দলে দলে ফিরিঙ্গিরা এসে হাটখোলা সুতানুটি আর কলকাতা-সুতানুটিতে কুঠি বানাচ্ছে। গোবিন্দপুরের দিকে বিশেষ কেউ যায় না, ভিড় যত উত্তরের গ্রামে। ডিহি কলকাতা দিনে দিনে সাফ-সুরুত হয়ে নগরের চেহারা নিচ্ছে।

হাটখোলা থেকে ডিহি কলকাতা পর্যন্ত একটি রাস্তা তৈরি হয়েছে। মাটির রাস্তা। এই রাস্তায় হরদম ঘোড়া ছুটছে। মাঝে মাঝে পালকিও চলছে। ঝাঁ ঝাঁ দুপুর। ফাগুলাল দেখল একজন অশ্বারোহী ফিরিঙ্গি দৌড়ে হাটখোলার দিকে আসছে। অশ্বারোহীর মাথায় ফিরিঙ্গি টুপি। পিছনে ধুলোর মেঘ। সামনেও ধুলো—সে কারণে অশ্বারোহীকে চেনা যায় না। ফাগুলালের সামনে এসে হঠাৎ থেমে গেল অশ্বারোহী। ফাগুলাল সবিস্ময়ে দেখল, সেই অশ্বারোহী আর কেউ নন, ইনিই সেই নয়নতারার অপহরণকারী এলিস। এলিসের হাতে চার্ণকের মতো চাবুক। চাবুকটা সাঁই সাঁই করে হাওয়ায় ঘুরিয়ে দিয়ে এলিস গাঁক গাঁক করে বলল, 'এই বঙ্গালিবাবু, তুমি বদলি দাসের কুঠিতে থাক না ?'

ফাগুলাল ঘাবড়ে গেল। সবিনয়ে বলল : 'জি।'

ঘোড়ার ওপর থেকে চিৎকার করে এলিস বলতে থাকল, 'বদলি দাসের কুঠির কাছ থেকে গতকাল এক জেনানা আমার সাথ এসেছিল, তুমি তাকে চেন ?'

ফাগুলালের গলা শুকিয়ে গেল। জোড় হাত করে বলল : 'হুজুর, আমি কিছু জানি না। আমার কোন জেনানা নেই।'

'অল রাইট। সে জেনানা আমার 'রেসট্ হাউস' থেকে চম্পট দিয়াছে। কেউ তাকে ভাগিয়ে নিয়ে গেছে। যদি সে আদমি ধরা পড়ে, আমি তাহাকে ক্ষমা করিব না। আর তোমরা যদি জানিতে পার, খবর দিও, আমি বকশিস্ করিব। আর সেই ভাগনেঅলা শয়তানটার জিব ছিঁড়িয়া লইব।'

এলিস সাহেব যেমন ঘোড়া ছুটিয়ে এসেছিল, তেমনি ঘোড়া ছুটিয়ে বেরিয়ে গেল। রাস্তা জুড়ে পড়ে রইল কেবল ধুলোর মেঘ।

ফাগুলালের সারা গা হিম হয়ে গেল। আর পাঁচরকম ব্যাপারে ফাগুলালের বুদ্ধি খেলে। সে সপ্রতিভ। কিন্তু এসব গোলমালে ফাগুলাল কেমন যেন বোমকে যায়। চাবুক খাওয়ার কিছু কিছু দৃশ্য সে চোখের ওপর দেখেছে। দেখেছে কয়েদ করে নিয়ে যাওয়ার ঘটনা। তাই ঐসব বিষয়ে জড়িয়ে পড়তে সে বেদম ভয় খায়। এত লোক থাকতে এলিস সাহেব তাকে হঠাৎ নয়নতারার কথা ডেকে বলল কেন ? তাহলে সাহেব কি তাকে সন্দেহ করছে ? নাকি নয়নতারা ঐ এলিসকে

আটখানা করে তার নামে বলেছে ? নাঃ, মেয়েদের বিশ্বাস করতে নেই। নয়নতারার পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়। ভাবতে ভাবতে ফাগুলালের সারা গা আবার হিম হয়ে গেল। চোখের সামনে সে যেন নানারকম আতঙ্ক দেখতে থাকল। যে ভয়ে আজ সে আর পীরপুকুর যায় না, সেই ভয় আবার এখানে ? এখানে মুঘল [illegible] ভয় নেই বটে, কিন্তু ভয় পাবার আছে জন্ হিলকে। এই জন্ হিলকে সুতানুটির কোতোয়ালি দিয়েছে চার্ণক সাহেব।

ঝাঁ ঝাঁ রোদ্দুর। পোয়াখানেক রাস্তাকে এখন ফাগুলালের কাছে ক্রোশ বলে মনে হচ্ছে। একশ জন সেপাই নিয়ে জন হিল দাপিয়ে বেড়াচ্ছে সুতানুটির নতুন বসত। লোকটাকে দেখেছে ফাগুলাল। গাট্টা গোট্টা। খুদে খুদে নীল চোখ। হিংস্রতায় চোখ জোড়া সর্বদা ধক্ ধক্ করছে। দয়া নেই, মায়া নেই, করুণা নেই। জাঁতিকলে ইঁদুর ধরার মত সে মানুষ ধরে। তারপর চাবুকে চাবুকে তাকে জর্জরিত করে। জন হিলের সে কী উল্লাস।

এই ভয়ংকর সাহেবটার সাগরেদ হয়েছে এলিস। এই এলিস যদি জন হিলের কাছে ফাগুলালকে ধরে দেয়, তাহলে তার অবস্থাটা কী হবে ?

বেচারি ফাগুলালের জন্য আরও একটি বড় আতঙ্ক যে তার ঘরেই অপেক্ষা করছে, তা রাস্তা চলতে চলতে সে আন্দাজ করতে পারেনি। সেটি টের পেল নিজের বাসার সামনে এসে। ফাগুলালের প্রথম খট্‌কা লাগল দরজার শেকলের দিকে তাকিয়ে। দেখল তালা ছুট। ঘরের তালাটা কোথায় গেল ? কে তালা ছোটালে ? জায়গাটা একটু নির্জন। সামনে জঙ্গল। তাহলে কি চোরের উৎপাত ? দরজা ঠেলল। বেশ জোরেই দরজা ঠেলল ফাগুলাল। কিন্তু দরজা ভেতর থেকে বন্ধ।

'ভেতরে কে আছ বাপা ? দরজা খুলে দাও। নইলে এখনই আমি কোটাল জন্ হিলকে খবর দিতে চললাম।' ফাগুলাল একটু তেজি হতে চেষ্টা করল।

ভেতর থেকে কোনও উত্তর এল না। তবে খুটখাট আওয়াজ শোনা গেল। তারপর দরজাটা হঠাৎ হাট করে খুলে দিয়ে ফাগুলালের সামনে যে দাঁড়াল, সে নয়নতারা। নয়নতারার চোখে উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি। এলোচুল ছড়িয়ে পড়েছে কাঁধের ওপর। আঁচল খসে ভুঁয়ে লুটোচ্ছে। ফাগুলাল এইরকম একটি সাক্ষাৎকারের জন্য প্রস্তুত ছিল না। সে যেন হঠাৎ সামনে একটা বাঘ দেখল। তার শিরদাঁড়া দিয়ে একটি হিমানি স্রোত ধীরে ধীরে নীচে নেমে গেল।

'ফাগুলাল, আমি এসেছি। এখন তুমি পরামর্শ দাও, আমি কী করব ? আমি কোথায় যাব ?'

ফাগুলাল সরাসরি কিছু বলতে পারল না। খোলা দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে ঘরের ভেতর ঢুকে এল। চৌকির ওপর বসল। মাথার চুলের ভেতর দিয়ে বাঁ হাতের আঙুল চালিয়ে একটু ভেবে নিয়ে বলল : 'তোমাকে কিন্তু এলিস সাহেব পাগলের মতো খুঁজছে। সন্দেহ করছে আমি বুঝি তোমার খবর জানি। খুঁজছে আমাদের

মালিক বদ্রীদাস। তাঁর ধারণা, তোমার সঙ্গে আমার গোপন সম্পর্ক আছে। তাই তোমাকে চালান করে দিয়েছি। তারা যদি এই অবস্থায় তোমার সঙ্গে আমাকে এই ঘরে দেখতে পায়, তাহলে কী হবে বুঝতে পারছ?'

নয়নতারা ফোঁস করে উঠল, 'তোমার সঙ্গে যে আমার পিরিতের সম্পর্ক, তা দাদাবাবু বদ্রীদাস জানল কী করে?'

'কী করে?' খিঁচিয়ে উঠল ফাগুলাল, 'কী করে জানল, তা তুমি নিজে জান না? নির্ঘাৎ তুমি বাতাসিকে কিছু বলেছ। সেই বাতাসিই আটখানা করে বলেছে। মালিক তো আমার ঘরে এসে ঐ বাতাসির নাম করল।'

দাঁত কিড়মিড় করল নয়নতারা। সে এক লহমার তরে কোনওদিন ফাগুলালের কথা বাতাসিকে বলেনি। তবু সে জানল কী করে? মেয়েটাকে সে হাবাগোবা সরল সাদাসিধে ভাবত। তা সেও কম সেয়ানা নয়! পেটে পেটে এত বুদ্ধি! সবই তাহলে সে দেখেছে। নয়নতারা দাঁত কিড়মিড় করে বলল, 'ও মাগীর তেজ আমি ভাঙব। ফিরিঙ্গিদের কাছে ছুঁড়ে দেব যাতে তারা ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায়। এ নয়ন নাপতিনীকে বাছাধন চেনে না?' কথা বলবার সঙ্গে সঙ্গে নয়নতারার চোখ দুটো আগুনের ভাঁটার মতো জ্বলতে থাকল।

কিছুই মাথায় আসে না। মাঝে মাঝে ফাগুলালের এমন হয়। নয়নতারাকে ফিরিয়ে দিতে তার মন চাইছে না। ছুঁড়িটা ভারি মায়াবী। ছুঁড়িটার সারা গায়ে চলকে উঠছে যৌবন। এমন যৌবন রাজকন্যাদের হয়। এমন যৌবনবতী মেয়েছেলে হাট সুতানুটির কোন ঘরেই মিলবে না। যদি ফাগুলাল তাকে ছেড়ে দেয়, তাহলে সে নির্ঘাৎ এলিস সাহেবের টোপ গিলবে, নয়তো হাটুরেরা তাকে লুটেপুটে খাবে। তা ফাগুলাল যখন নপুংসক নয়, তখন নয়নতারাকে বাঁচানো তার নৈতিক কর্তব্য। তাছাড়া নয়নতারা যখন তার আশ্রিত হয়ে থাকতে চাইছে, তখন ফাগুলালকেই দিতে হবে তার মাথার ছাউনি।

'বিপদের সময় বুদ্ধি হারালে চলবে না, নয়ন! কেবল বুদ্ধি নয়, একটু ডাকাবুকোও হতে হবে। চল, তোমাকে একটা গোপন জায়গায় রেখে আসি। কিছুদিন তুমি সেখানে গা-ঢাকা দিয়ে থাকবে। তারপর সুযোগ বুঝে ব্যবস্থা হবে।'

নয়নতারা একটু নরম হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'জায়গাটা কোথায়? তোমার চেনা তো?'

'হ্যাঁ, খুবই চেনা জায়গা। ধর্মতলার কাছে। বাদা যাবার খালের ধারে। লোকটা একসময় আমার সাগরেদ ছিল। থাকে গোলপাতার ঘরে। নতুন বে-থা করেছে। সংসারে বাড়তি কোনও ঝামেলা নেই। লোকটার নাম ভাঁডু। খালের ধারে মাছ ধরে বেচা-কেনা করে। ওদিকে সাহেবরা বিশেষ যায় না। ভয় নেই।'

'তা সেখানে তুমি মাঝে মাঝে যাবে তো? নাকি নির্বাসন দিয়ে চলে আসবে?'

'না না, নির্বাসন দেব কেন ? তোমাকে ছেড়ে কি আমি থাকতে পারি ?'

তা ফাগুলাল তার পরিকল্পনা মতো কাজ করল। জঙ্গলের ভেতর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে তারা গঙ্গার ধারে চলে এল। নয়নতারাকে যাতে কেউ বুঝতে না-পারে, তার জন্য তাকে একটি রেশমি শাড়ি পরিয়ে নিল। এই রেশমি শাড়িটা ফাগুলাল বছরখানেক আগে কিনেছিল বাতাসিকে দেবে মনে করে। কিন্তু দেওয়া হয়নি। দিতে পারেনি বলেই দেওয়া হয়নি। এখন সেই শাড়িটা কাজে লাগল। এই শাড়িতে নয়নতারাকে নতুন বৌয়ের মতো দেখতে লাগল। একটি ছোট্ট শালতি ভাড়া করে ফাগুলাল চলল কাঁচাগদির ঘাটের দিকে। লোনাবাদা হয়ে যে খাঁড়িটা এসে গঙ্গায় পড়েছে কাঁচাগদির ঘাটে, সেই খাঁড়ি ধরে নৌকো চলল ধর্মতলার দিকে। এদিকটা বেজায় জঙ্গল। লুলো হাজরা কাঁচাগদির ঘাটের শুল্ক নেয় দুটি কড়ি। কড়ি গুনে নিতে নিতে হাজরা বলল : 'নতুন বে করলে নাকি হে ? তা বৌটি তোমার বেশ ডাগর ডোগর ! খাসা হয়েছে।'

ফাগুলাল ঘাড় কাত করে বলল : 'আজ্ঞে হ্যাঁ। বে করেছিলাম এক যুগ আগে। আজ নে এলাম।'

খালের ধারে জঙ্গল। ধর্মতলার জঙ্গলে ভাঁড়ু কাঠ কাটতে গিয়েছিল। ফিরে এসে ফাগুলালের বৌ দেখে সে বেজায় খুশি।

ফাগুলাল বলল : 'ব্যামোতে আমার শ্বশুরটা পট করে মরে গেছে। তাই ঘরের ব্যবস্থা না করেই বৌটাকে ওর দেশ থেকে আনলাম। এখন দিন কয়েক তোর কাছে থাক। একটা ঘরের ব্যবস্থা করে বৌকে নিয়ে যাব। তুই ছাড়া আমার আর কে আছে বল। তাই এ ব্যবস্থা করলাম। তোর কোনও অসুবিধা হবে না তো ভাঁড়ু ?'

'না না, কিছু অসুবিধে হবে না। বৌঠানকে মাথায় করে রাখব। তাছাড়া আমার বৌটাও একটা সঙ্গী পাবে। এই জঙ্গলে বাস, প্রতিবেশী কম !'

ফাগুলাল কিছু টেপুয়া ভাঁড়ুর হাতে গুজে দিয়ে সেদিন বিকেলেই সুতানুটির আড়তে ফিরে এল। কেউ কিছু টের পেল না। ফাগুলাল নিশ্চিন্ত হল।

॥ সাত ॥

একেই বলে মা গঙ্গার কৃপা! একেই বলে সুপবন বয়ে যাওয়া। সুতানুটিতে এখন সুপবন বইছে।

নইলে সুতানুটির কি এমন বাড়-বাড়ন্ত হয়? দিনে দিনে জায়গাটা ফুলে ফেঁপে উঠছে। নানা দেশ থেকে এখানে লোক আসছে। আসছে নানা পেশার মানুষ। এক একটা টোলা, এক একটা পটি যেন লোক-জন আর ব্যবসা-বাণিজ্যে জমকিয়ে উঠছে। কসাইটোলা, ডোমটোলা, পটুয়াটোলাতে প্রায় প্রতিদিনই নতুন নতুন লোক এসে বসত ফেলছে। শাঁখারি পাড়া, কাঁসারি পাড়া বা মেছুয়া পাড়াতেও ঠিক একই অবস্থা। জঙ্গল সাফ হচ্ছে। আর নতুন নতুন ভিটে গজিয়ে উঠছে। কপালিটোলা ও বেনেটোলাতে অনেক অভিজ্ঞ ও পুরনো ব্যবসাদার এসেছেন। ইতিমধ্যে কয়েকটি ছোট ছোট হাট বা পটি বসেছে স্রেফ জিনিসপত্তর কেনা-বেচার জন্য। ময়রাহাটা, দরমাহাটা, সোনাপটি, তুলোপটি এইভাবে তৈরি হয়েছে। তবে এসব জায়গায় কেবল এক একটা জিনিসই পাওয়া যায়, হাটের মতো সব জিনিস মেলে না। বদ্রীদাস সেদিন একজন লোককে খ্যাংরা কাঠি কিনতে পাঠিয়েছিল হাটখোলার পুবদিকে। লোকটা ফিরে এসে বলল, 'হুজুর, ঐ জায়গাটার একটা নতুন নাম হয়েছে।'

'কী নাম রে? তা নতুন নামটা কী রকম?'

'আজ্ঞে, জায়গাটার নাম হয়েছে খ্যাংরাপটি।'

তা কেবল সওদার নামে নাম নয়, গাছতলা দিয়েও এক একটা পল্লীকে চেনানো হচ্ছে। বটতলা, নিমতলা, আমড়াতলার সঙ্গে যোগ হচ্ছে নারকেলডাঙ্গা। সিমলে আর ইটালিও নাকি গাছের নামের নাম! হোগল কুঁড়িয়ার জঙ্গল সাফ হচ্ছে। বাঘমারি-চৌবাঘা এখনও নির্জন, কিন্তু কতদিন এসব জায়গা নির্জন থাকবে তা বলা মুসকিল। সুতানুটি আর ডিহি কলকাতা যেন ভাঙা কাঁঠাল। ভন্‌ভনিয়ে মাছি আসছে দেশ-দেশান্তর থেকে। গহিন জঙ্গল আর জঙ্গল থাকছে না। দিন রাত্তির মাছির ভ্যানভ্যান।

ডিহি গোবিন্দপুর থেকে ঢাকাই মসলিনের আড়তদার রঘুনাথ এসেছিল সেদিন। গায়ে ছিল একটা মেরজাই। তবে কাঁধে পাটকরা গামছা। আর হাতে সেই থেলো হুঁকো। হুঁকো ছাড়া লোকটা এক মুহূর্তও থাকতে পারে না। কথাতে সেই ঢাকাই টান। তামাক খেতে খেতে বদ্রীদাসকে বলল: 'কর্তা আপনাকর সব কুশল তো! সেবার ঢাকাই মসলিন খোঁজতে গেছিলেন না! এবার অনেক ভাল জিনিস চালান আসছে। খাসা জিনিস। এবার অঢেল জিনিস দিতে পারুম। কবে যাবেন, কন্।'

বদ্রীদাস একগাল হেসে বলেছিল, 'এ কথাটা বলবার জন্য নিজে আসবার কী দরকার ছিল। লোক পাঠালেই তো হত।'

থেলো হুঁকোতে টান দিতে দিতে রঘু তাঁতি বলেছিল, 'তা ঠিক কইছ, বামুনের পো। কিন্তু ব্যাপারটা কী জান, আমাদের দ্যাশ থেকে অনেক তাঁতির পো আসতিছে। ঝাঁকে ঝাঁকে আসতিছে। ফিরিঙ্গিদের সাথে কেনাবেচা করতে চায়। সকলে কইছে সুতানুটি যামু। তা পাছে আপনাগোর কেনাকাটায় আমার সাথে কোনও গোলযোগ না লাগে তাই আস্‌ছি। ঐ হুমুন্দিদের আমার বিশ্বাস নাই। আমার খদ্দেরদের ভাঙানোর চেষ্টা হতি পারে।'

সুতানুটির ব্যবসাতে যে সুপবন বইতে শুরু করেছে, তা বদ্রীদাস ভালভাবেই টের পাচ্ছে। তাছাড়া কোম্পানিকে মাল কিনে দিয়ে তার যে বেশ দু'পয়সা আসছে, এ গোপন কথা তার থেকে আর বেশি কে জানে? কোম্পানির ব্যবসা যত বাড়ে, বদ্রীদাসের রোজগারে ততই সুপবন বইতে থাকে। বদ্রীদাসের আরেকখানা সিন্দুক লাগবে।

ওদিকে নিমতলায় বড় একটি চৌকির ওপর তুলোর গদিতে নকশিকাটা জাজিম বিছিয়ে বসে আছে চার্ণক সাহেব। চার্ণক সাহেবের গায়ে রেশমি কাবা। রেশমি কাপড়ের চুস্ত পাজামা। মাথায় তাজ। সারা গায়ে মিঠে আতরের গন্ধ। নিমগাছের নিবিড় ছায়া। সাহেব দেশবিদেশের ব্যাপারিদের সঙ্গে বসে নিজেই নানা জিনিসের দরদস্তুর করছে। আর নিজের নোটবুকে ব্যাপারিদের নামধাম এবং সেইসঙ্গে জিনিসপত্তরের দামের হিসেব লিখে রাখছে।

হঠাৎ সেখানে বিশজন সেপাই নিয়ে কুচ করতে করতে জন হিল এসে হাজির। হিল সাহেব কুচ থামিয়ে ইংরেজি কেতায় কুঠিয়াল চার্ণককে স্যালুট করে বলল: 'হিজ্ এক্‌সেলেন্সি জোব সাহেব আমাদের এতেলা দিয়েছেন, শুনলাম। হুজুরে হাজির হয়েছি হুকুম পালন করতে।'

'হ্যাঁ, শুনলাম গতকাল হাট সুতানুটির এক গস্তদারের ঘর থেকে অনেক জিনিস চুরি হয়ে গেছে। তারা তোমার থানায় রিপোর্ট করেনি?'

'না, আমি সেরকম অভিযোগ তো পাইনি। আমার কাছে কেবল একটাই অভিযোগ আছে, এলিস সাহেবের অভিযোগ।'

'এলিসের অভিযোগ?' চার্ণক ভ্রু কুঞ্চিত করল। 'তার আবার কী অভিযোগ?'

'তার রেস্‌ট-হাউস থেকে এক জেনানা চুরি হয়ে গেছে।'

'জেনানা? এলিসের তো বিবি নেই? জেনানা কোথা থেকে এল?'

'আছে স্যার। হি সাম্‌হাউ ম্যানেজ্‌ড এ লেডি'—

জন হিলের কথা ফুরোবার আগে বদ্রীদাস তাড়াতাড়ি বলল, 'হুজুর, আমারও একটা এইরকম ফরিয়াদ আছে। আমার বাড়ি থেকে ঝি মাগীটাকে কে দিনকতক আগে চুরি করে নিয়ে গেছে। অনেক চেষ্টা করেও তার খোঁজ খবর পাইনি।'

'স্প্রেঞ্জ!' মুষ্টিবদ্ধ হাত দুটি আকাশের দিকে ছুঁড়ে দিল জন হিল। বলল: 'বদলিদাসবাবু আপনার জেনানার বয়স কত?'

'তা ষোল-আঠারো তো হবেই!'

'দেখতে কেমন?'

'ঝিদের মতনই দেখতে। তবে তার চোখ দুটো তড়বড়ে।' একটু থেমে বদ্রীদাস বলল: 'মেয়েটা একটু চপলাও বটে।'

চার্ণক এবার জন হিলের দিকে তাকাল। চার্ণকের মুখ গম্ভীর। অপ্রসন্ন। ভুরু দুটি ঈষৎ কুঞ্চিত। এই ঘটনাগুলি যে খুবই বিরক্তিসূচক, তা তার মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছিল। চার্ণক বলল, 'জন হিল, আমার কাছে এ সব সংবাদ মোটেই কিন্তু প্লিজিং মনে হচ্ছে না। সুতানুটিতে শান্তি বজায় রাখবার জন্য কোম্পানি তোমাকে একশ সেপাই দিয়েছে। তাদের মেনটেনান্সে কোম্পানি দেদার খরচ করছে। অথচ নো রেজাল্ট? সুতানুটিতে শান্তি না থাকিলে ব্যাপারিরা আসিবে কেন? আমরা বড় বড় শহর গঞ্জ ছেড়ে দিয়ে কেন এখানে আসিয়াছি? হোয়াট ফর? কোম্পানির ব্যবসা বাড়াতে। তা এ রকম অশান্তি থাকিলে ব্যবসা বাড়িবে?'

জন হিল মুখ নিচু করে চার্ণকের কথাগুলি শুনল। কোনও তর্ক করল না। জবাবও দিল না। স্যালুট্ করে পিছু হেঁটে চলে এসে সামরিক কায়দায় আবার স্যালুট্ করে তার সেপাইদের কুচ করতে করতে থানায় ফিরে চলে গেল জন হিল।

চার্ণকের পাশে রুপোর গড়গড়া। এই গড়গড়াটা ইদানীং চার্ণক গড়িয়েছে শখ করে। তা সোনা দিয়েই গড়াতে পারত সাহেব। কিন্তু শৌখিনতার চূড়ান্ত হবে বলে নিজেই পিছিয়ে এসেছে সাহেব। রুপোর গড়গড়াতে মেজাজি কয়েকটা টান দিয়ে চার্ণক বলল, 'বদলিদাস, তোমাদের হুগলি নদীতে হার্মাদদের জাহাজ কবে প্রথম ঢুকেছিল বলতে পার?'

'আজ্ঞে, তারিখ-সন মিলিয়ে ঠিক ঠিক বলতে হয়ত পারব না। তবে আন্দাজি একটা কেরেস্তানি সন বলতে পারি। —তাও আবার সেটা গোবিন্দপুরের শেঠেদের মুখে শোনা।'

'সে তারিখটা কত?'

'আজ্ঞে, সে সনটা হল পনেরোশ তিরিশ। কেরেস্তানি সন। এর আগে হার্মাদরা আমাদের দেশে এসেছে বটে, কিন্তু অতবড় জাহাজ আমাদের গঙ্গাতে কখনও ঢোকাতে ভরসা পায়নি। এনারা এখানে এসে শেঠ বসাকদের কাছে গোবিন্দপুর সাকিনে কাপড় খরিদ করেছিল। হাজার হাজার টাকার কাপড়। ওনাদের সেরেস্তায় তার হিসেব আছে। সাহেব চুপচাপ। নিঃশব্দে গড়গড়ায় টান দিয়ে চলেছে। বদ্রীদাস সাহেবের ঠিক মেজাজটা বুঝতে পারল না। তাই হার্মাদদের প্রসঙ্গটা আবার শুরু করল, 'আজ্ঞে, হার্মাদরা নিজেদের বুদ্ধির দোষে সব সুযোগ হারাল। অত বড় জাহাজ এই নদীতে ঢুকিয়ে দিল বটে, কিন্তু সুবিধে করতে পারল কই? গোটা বাংলা

মুলুকটাই ওদের কবজাতে চলে আসত, কিন্তু বাদশা সাজাহানের বেগমের বাঁদি চুরি করাটাই ওদের কাল হয়ে দাঁড়াল। তাই জাহাজ ঢোকার বছর দুই পরেই ব্যাটাদের উচ্ছেদ ঘনিয়ে এল। হুজুরের বোধহয় তখন জন্ম হয়নি, তবে ইতিহাসটা হয়ত শুনে থাকবেন। বাদশার নির্দেশে কাশেম খাঁ দেড় লাখ সেপাই নিয়ে হুগলি শহর ঘেরাও করে পর্তুগিজদের কচুকাটা করেছিল। সেই থেকে হার্মাদরা বাংলা মুলুক ছাড়া। বেতড়ে এসে পরে হাট বসিয়ে মাঝে মধ্যে মাল কেনা-বেচা করত বটে, কিন্তু ভেতরে ঢুকতে আর ভরসা পায়নি।

চার্ণক সাহেব চুপচাপ। বদ্রীদাসের গল্প শুনতে শুনতে সাহেবের মন চলে যায় পাটনা মুলুকে। কিংবা কাশেম বাজারে। হুগলির ইতিহাসটা সাহেব ইচ্ছে করেই ভুলে থাকতে চায়। হুগলির কুঠিতে কয়েক মাসের জন্য থাকতে হয়েছিল কুঠিয়াল হয়ে। এই থাকাটা ঠিক থাকা নয়। ছিল কোনওরকমে টিকে। ফৌজদার আবদুল গনি তাকেও চেয়েছিল হার্মাদদের মতো কচুকাটা করতে। চেয়েছিল বাংলা মুলুক থেকে তাদের ব্যবসার পাট তুলে দিতে। তা চার্ণক সে সুযোগ তাদের নিতে দেয়নি। তাদের কাছা বাগানোর আগেই লড়াই ফতে করেছিল চার্ণক। হুগলি নদীর বুকে জাহাজ ভাসিয়ে এই জঙ্গলের দিকে পাড়ি দিয়েছিল। তবে আসবার আগে সে গোলা ছুঁড়ে গোটা শহরটাকে জ্বালিয়ে দিয়ে এসেছে। ফৌজদার গনি নিশ্চয় টের পেয়েছে, ইংরেজ কুঠির কুঠিয়াল কেমন ঢ্যাটা।

চার্ণকের গড়গড়াতে গুড়ুক গুড়ুক শব্দ উঠল।

'বদ্রিদাস, তুমি অনেক খবর রাখ দেখছি। তা আমাদের বড় জাহাজটি কবে এই হুগলিতে ঢুকেছিল বলতে পার? যদি বলতে পার, তাহলে বুঝবো যে, তুমি আমার যোগ্য সরকার। আমার কোম্পানির সাচ্চা কর্মচারী।'

বদ্রীদাস মজা পেল। কেননা, এ সব খবর সে বহুবার শুনেছে। এ সব খবর জানতে সে ছেলেবেলা থেকে কৌতূহলী। তাই যখন যার কাছ থেকে সে শোনে, তা আর কখনও ভোলে না। মণিমুক্তোর মতো সঞ্চয় করে রেখে দেয়। আর যদি সে আর কারোকে বলবার সুযোগ পায়, তা হলেও কথাই নেই। বর্তে যায়। হুর হুর করে সে সব খবর বলে যায়।

'তা হুজুর যখন শুনতে চান, তখন গুছিয়েই বলি। ইংরেজ কোম্পানির পেরথম বড় জাহাজ এই গঙ্গায় ঢুকেছিল কেরেস্তানি সনের হিসেবে ষোল উনআশিতে। তা হুজুর তখনও কাশেম বাজার কুঠির পয়লা কুঠিয়াল হতে পারেননি। তখনও পয়লা কুঠিয়াল হতে এক বছর দেরি। সেই বিরাট বড় জাহাজটা—পেল্লায় যেন একখানা গড়—ভাসতে ভাসতে চলে এল। বেতোড় থেকে ক্রোশ খানেক দক্ষিণে ঐ হোথা নদীর ওপারে নোঙ্গর ফেলল। জাহাজের নাম 'বাজপাখি'। সাহেবদের ভাষায়, 'ফালকন'। তবে জাহাজি সাহেব উচ্চারণ করতেন 'ফ্যাকন' বলে।'

'তা এতই যখন জান, তখন জাহাজি সাহেবের নামটা বল দেখি?' চার্ণক সাহেব

প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিয়ে গড়গড়ায় টান দিল।

'আজ্ঞে, তেনার নাম হলো, স্ট্যাফোর্ড'। এদেশের দরিয়ায় সাহেব সেই প্রথম। সাহেব বিপদে পড়লেন। ইংরেজি আর সামান্য একটু তামিল ভাষা ছাড়া সাহেব আর কোনও ভাষা জানেন না। বাংলা মুলুকে এসেছেন, অথচ এক ফোঁটা বাংলা জানেন না। তাই তাঁর একজন দোভাষির দরকার হল। জাহাজ থেকে নেমে এসে তিনি মাছধরা জেলেদের জানালেন যে, তার একজন 'দুবাস' দরকার। জেলেরা 'দুবাস' শব্দের জায়গায় শুনল 'ধোবা'। তা সাহেব একজন ধোবা চাইতেই পারেন। কুর্তা-কামিজ সাফা করার হয়ত জরুরি দরকার। খবরটা গড়াতে গড়াতে গিয়ে পেঁছুল কুমোরটুলি। পেঁছুল পোস্তার ধর মশায়ের বাড়িতে। তা লক্ষ্মীকান্ত ধর মশাই রাজার মতোই থাকেন। সপ্তগ্রামের বনেদি ব্যবসায়ী। বেতড়ের হাটে কাপড়ের আড়ত দিতেন। অঢেল পয়সা। চাকর-বাকর দাস-দাসীতে গম্‌গম্‌ করছে বাড়ি। জেলেরা গিয়ে বলল, কর্তামশাই ইংরেজ কোম্পানির এক জাহাজ এসে নদীর ওপারে দাঁড়িয়ে রয়েছে। একটা ধোবা দরকার। জাহাজি সাহেব আপনার কাছে একথা বলে পাঠিয়েছেন। তা কর্তামশায়ের বাড়ির পাশেই এক পোড়ো জায়গা ছিল। সে জায়গায় রতন ধোবা কাপড় শুকুতে দেয়। কর্তার সেই মুহূর্তে মনে পড়ে গেল রতনের কথা। ধরমশাই হাঁকার দিলেন, রতন। হাঁকার শুনে রতন এসে হাত জোড় করে দাঁড়াল। বাবু বললেন, 'রতন, তোকে জাহাজে যেতে হবে। কোম্পানির জাহাজ থেকে তোর তলব হয়েছে।' বাবুর আদেশ, তায় কোম্পানির তলব। রতন গেল জাহাজি স্ট্যাফোর্ডের কাছে।

চার্ণক খুব মজা পেল রতন ধোবার প্রসঙ্গে। চোখ-মুখ পাকিয়ে কৃত্রিম গাম্ভীর্য টেনে বদ্রীদাসকে কটাক্ষ করে সাহেব বলল: 'বল কী হে বদ্রীদাস! এমনও হয় নাকি? ধোবা করবে দোভাষির কাজ?'

'আজ্ঞে, তাতে কোন অসুবিধে হয়নি জাহাজি স্ট্যাফোর্ড সাহেবের। ধোবা হলে কী হয়, রতন দু'চারটে ইংরেজি জানত। তার ওপর ছিল বেজায় চট্‌পটে। সে ঐ সামান্য বিদ্যে নিয়েই কামাল করে দিয়েছে। সাহেবকে জিতে নিয়েছে। সে এখন জাহাজে জাহাজেই ঘোরে। এই কিছুদিন আগে দুবাস হয়ে বালেশ্বর গেছে, এবার এলে হুজুরের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব।'

প্রসঙ্গ বদল হয়। এক প্রসঙ্গ থেকে লাফিয়ে আর এক প্রসঙ্গে বদ্রীদাসের গল্প চলে যায়। হাটুরেরা আসে। ব্যাপারিরা আসে। বোসো। তামাক খাও। তামাক খাওয়ার ব্যবস্থা আছে। হুঁকোর মাথায় সাজা তামাকের আগুনভরা কলকে চাপে। ঘোষের পোর হাত থেকে হুঁকো বদল হয় পালেদের কর্তার হাতে। কোম্পানির এখন অনেক কর্মচারি। কোম্পানির খিদমত খাটছে নানা জাতের মানুষ। এদের ভেতর কেউ খানসামা। কেউ চোপদার। আর চৌকিদার তো আছেই। কোম্পানির জায়গায় জঙ্গল সাফ করবার দায়িত্বে আছে ঘেসেড়া। দরকার হলে এই ঘেসেড়া

আবার ঘোড়ার ঘাসও কাটে। নোংরা পরিষ্কার করবার জন্য রয়েছে জমাদার। বাগান সাজাচ্ছে মালি। আর বর্তন সাজাচ্ছে চাপরাশি। নাপিত, ধোপা, আয়া, বেহারা, সহিস ইত্যাদি মিলে নফর মহল। এ মহলে আরও অনেক নফর আছে। আছে পাল্কি বাহকের দল। আছে পেয়াদা ও সরকার। সন্ধ্যাবেলার আলো জ্বালাবার জন্য রয়েছে মশালচি। সুতরাং তামাক সেজে হাতে হাতে ধরিয়ে দেবার লোকও থাকবে না কেন? তা এজন্যও কোম্পানির লোক আছে, সে হল হুঁকা-বরদার। মাসিক মাইনে এক তঙ্কা! ঘেসেড়া পায় পাঁচসিকে, মশালচি পায় দু'টাকা। এমনকি বাগানের মালিও হয়েছে দু টাকা মাইনের চাকর, কিন্তু হুঁকা-বরদারের বেলাতেই ঐ একটাকা। কোম্পানি তখন কঞ্জুস। টাকা নেই। হুঁকা-বরদার নন্দলালের এ কারণে মাঝে মাঝেই মন খারাপ হয়। অভিমান হয়। মুষড়ে পড়ে। বেদম দুঃখ পায়। কিন্তু টিকেয় আগুন ধরালে সে একেবারে আলাদা মানুষ। তখন নন্দলালের মন খুশিতে টইটম্বুর। ফুঁ দিয়ে টিকে ধরায়।

নিমতলার আসরে ঘন ঘন ডাক পড়ে নন্দলালের। নন্দলাল সাড়া দেয়, 'যাই কর্তা—'। তারপরই কর্তাদের হাতে হুঁকো ওঠে। শব্দ ওঠে গুড়ুক গুড়ুক।

চার্ণক একদিন জিজ্ঞাসা করে বসল, 'এ জঙ্গল সুতানুটির একেবারে পুরনো বাসিন্দে কারা?'

হাটুরে আর ব্যাপারিরা এ ওর মুখের দিকে চায়। তাই তো। এখানকার জঙ্গল কেটে কে বসত প্রথম তৈরি করল? কে বসাল হাট?

বদ্রীদাস মাথা চুলকে বলল: 'হুজুর! এ ব্যাপারে কেবল সুতানুটির কথা তুলবেন না! আপনি কি এই মুহূর্তে হাটখোলা সুতানুটি আর কলকাতা সুতানুটির ফারাক করতে পারেন? কোম্পানির ব্যবসার আড়ত রয়েছে এই নিমতলায়, আর আপনি থাকেন ডিহি কলকাতায়। এক কদম দক্ষিণে এগোলেই গোবিন্দপুর। আজ্ঞে ঐ নোনা হ্রদের খাঁড়িটা মাঝামাঝি থেকেই যত গোল বাধিয়েছে, নইলে গোবিন্দপুর আর কী এমন দূর। সুতানুটি কেবল একা নয়, এ জায়গাটা বুঝতে হলে কলকাতা আর গোবিন্দপুরকেও ধরতে হবে।

হাটুরে পাল চোখ বড় বড় করে বলল, 'সে যে বেদম জঙ্গল গো!'

'কেবল জঙ্গলই তুমি দেখলে পাল? খানা-ডোবা আর ভয়ঙ্কর খাঁড়িগুলো দেখলে না? অমন গহিন বন তুমি কোথায় পাবে? খালে কুমির আর জঙ্গলে বাঘ। তোমরা যেখানটাকে চৌরঙ্গী বল, ওখানে বাঘের পেটে গত বছর ছ'টা জোয়ান চলে গেছে। আর বাদার খাঁড়িতে কুমিরের পেটে হামেশাই লোক মরছে। আজও সকালে একটা গেছে বলে শুনলাম।

চার্ণক বলল: 'বদ্রীদাস, এই তিনটে গেরামের ভেতর কোনটিকে তোমার বড় বলে মনে হয়?'

'আজ্ঞে, সাবর্ণ চৌধুরিদের কাছারিতে এই গ্রামগুলোর যে পরিমাণ দেওয়া আছে,

তার পরিমাণ কবুল করলেই বুঝবেন যে কার আকার বড়, আর কারই বা আকার ছোট। তা আমাদের এই হিসেবে বাজার-হাট বাদ দিয়ে বলছি। এগারোশ আটাত্তর বিঘে সাত কাঠা জমি নিয়ে হল গোবিন্দপুর। পাইকান এবং আমিরাবাদ পরগণার হিসেব ধরে ডিহি কলকাতার মোট ভুঁই হল সতেরোশ সাড়ে সতেরো কাঠা। আর সুতানুটি হল চার কাঠা কম ষোলশ তিরানব্বই বিঘের গ্রাম। এখন হুজুর বিচার করে দেখুন কোন্ গ্রামটা বড় আর কোন্‌টা ছোট! তবে ছোট-বড় দেখে আর কী করবেন? গোবিন্দপুরের চোদ্দো আনাই খাঁড়ি আর জঙ্গল। বসতের মানুষের থেকে জঙ্গলের জানোয়ার বেশি।'

কথার পিঠে কথা আসে। গল্পের কথাতেই আরও গল্প জমে। চার্ণক সাহেব হাটুরেদের সঙ্গে গল্প করে ভারি আরাম পায়। ভেতরে জমে থাকা অনেক গুমোটভাব কেটে যায়। তাছাড়া অনেক কথা জানা যায়। অনেক নদীনালা পেরিয়ে, অনেক সংকটের মোকাবিলা করে সাহেব আজ সুতানুটিতে কোম্পানির ব্যবসার ঘাঁটি তৈরি করতে চলেছে। সুতরাং এখানকার জায়গা ইত্যাদির সঙ্গে লোকজনের খবরাখবর নেওয়াটা তার কাছে জরুরি। জানা কথা আবার জানতে হয়। চেনা লোককে আরেকবার চিনতে হয়। এইভাবেই সকলের সঙ্গে মিশতে চেষ্টা করে চার্ণক। কাজকর্মের ফাঁকে ফাঁকে এসব গল্প তাই ফাঁদতে হয়। গল্প কখনও জমে ভাঙা হাটে দুপুরের দিকে। আবার কখনও বিকেলে। গঙ্গার ওপারে ঢলে পড়ে সূর্য। এদিকের গাছে গাছে দীর্ঘ ছায়া নামে। পাখির কাকলি যেন আর ফুরোয় না। মশালচিরা জ্বেলে দিয়ে যায় মশাল। গল্প জমে। নদীর ওপর দিয়ে হাওয়া বয়।

তা সেদিন বিকেলের দিবেই অতি পরিচিত ও বহু আলোচিত প্রসঙ্গটাই চার্ণক তুলল।

'কই হে বদ্রীদাস, সেদিনের কথাটার জবাব এড়িয়ে গেলে কেন বাপু। শেঠ-বসাকদের ব্যাপারটা খোলসা করে বল দেখি। ওঁরাই কি এখানকার প্রথম জঙ্গলকাটা মানুষ? ওঁরাই কি পয়লা হাট বসিয়েছেন এই সুতানুটিতে, নাকি মল্লিকবাবুরাও আছেন? সপ্তগ্রামের ধরমশায়রা হঠাৎ কুমোরটুলিতে গিয়ে বসলেন কেন?'

হাটুরে পাল আর সবজির আড়তের বলাই ঘোষ একসঙ্গে মাথা নাড়ল, 'আঃ, বড় জব্বর কথাটা সায়েব তুমি জিজ্ঞাসা করেছ! সরকার বদ্রীদাস এবার আর কোনও কথার জবাব দিতে পারবে না। হুঃ হুঃ ব্যাটা হালদার এবার জব্দ।'

বদ্রীদাস হাসল। বলল: 'হুজুর, হার্মাদদের সঙ্গে শেঠ-বসাকেরা যে কারবার করেছিল, সে কথা আগেই বলেছি। তা হলে হুজুর, আজ থেকে ষাট বছরেরও আগে ওঁরা এখানে এসেছিলেন। এ অনুমান মিথ্যে নয়। সপ্তগ্রামের থেকে ওঁরা তাহলে এখানে অন্তত আরও দশ-বিশ বছর আগে এসেছিলেন। ওঁদের কাছারিতে যে কুলচিনামা রয়েছে, সেটাতে একবার চোখ বুলোলেই দেখবেন ওঁদের পাঁচঘর গোবিন্দপুরে এসে জঙ্গল কেটে বসত তৈরি করেন। এই পাঁচের ভেতর চার ছিল

বসাকরা, আর বাকি একঘর শেঠ। ওনাদের কুলচিতে বলে যে, এই শেঠটি হলেন মুকুন্দরাম শেঠ, আর চার বসাক হলেন, কালিদাস, শিবদাস, বারপতি এবং বাসুদেব। তা এই পাঁচজনের ভেতর কে বা কারা আগে-পরে এসেছিলেন, তা বলা মুশকিল। ওনারাও জোর দিয়ে বলতে পারেন না। তবে এমন রটনাও আছে যে, শেঠ মুকুন্দরাম আগে এসে, পরে ডেকে নিয়ে এলেন চার বসাককে।'

গঙ্গার ওপর দিয়ে মিঠে বাতাস আসছে। নিমগাছের মাথায় ঝিরঝিরে হাওয়া। হুঁকাবরদার নন্দলাল এক ছিলিম করে তামাক হাতে হাতে ধরিয়ে দিয়ে গেল। হাটুরে আর আড়তদারদের সঙ্গে চার্ণকও হাঁ করে শুনতে থাকল বদ্রীদাসের কাহিনী। বদ্রীদাস একটু থেমে কাঁধের গামছা দিয়ে মুখটা মুছে নিয়ে আবার শুরু করল। পড়ন্ত বিকেলে তার মুখটা বেশ ঝকঝকে লাগছে। চার্ণক তার সরকার বদলিদাসের দিকে তাকিয়ে খুশি।

'তা হুজুর শেঠেরা, [illegible] সঙ্গে বসাকদের গোড়াতেই এনেছিলেন কিনা তা নিয়ে মতভেদ আছে। এ ম[illegible]বও। তবে যা নিয়ে তর্ক নেই, তা হল শ্যাম রায় ওঁদের সঙ্গে এসেছিলে[illegible] শেঠদের মতো আজও অনেকে এক বাক্যে স্বীকার করেন যে, শ্যাম রায় ওঁদের সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রথম থেকে গোবিন্দপুরে এসে অধিষ্ঠিত হয়েছেন।' এই পর্যন্ত বলে বদ্রীদাস একটু দম নিল। কাঁধের গামছা দিয়ে আবার মুখ মুছল। বলাই ঘোষ হুঁকোতে টান দিতে দিতে বলল: 'কই হে হালদার পো, থামলে কেন?

বদ্রীদাস আরম্ভ করল, 'তা হুজুর গোবিন্দপুরের শ্যাম রায়কে তো আপনি দেখেছেন। ইনিই মুরলিধর মদনমোহন, ইনিই গোবিন্দজী। এর নামেই নাকি গ্রামের নাম গোবিন্দপুর। গোবিন্দপুরে দিঘির ধারে শ্যাম রায়ের মন্দির। এখানে যেমন হোলি উৎসব হয়, এমনটি আর কোথাও পাবেন না। আশপাশের দশবিশখানা গ্রামের লোক আসে আমোদ করতে। আবিরে-কুঙ্কুমে লাল হয়ে ওঠে আকাশ। লাল হয়ে ওঠে দিঘির জল। আজ্ঞে, সে জন্যে ঐ জঙ্গলে দিঘির নামটাই বেবাক বদলে গেছে। নাম হয়েছে লালদিঘি। ইদানীং আবার পাশের সেই ছোট্ট বাজারটাকে শুনছি লোকে 'লালবাজার' বলে ডাকছে।

হাটুরে পাল মন্তব্য করল, 'তা লালবাজার বলে থামলে কেন হালদার। ঐ লালবাজারের পাশেই গজিয়ে উঠেছে আবার 'রাধাবাজার', সে খবরটাও দাও!'

হোলির কথা বলতেই চার্ণক অন্যমনস্ক হয়ে গেল। গত বারের হোলিতে এই সুতানুটিতে থাকতে হয়েছিল সাহেবকে। তা গতবার কী ঝকমারিই না হয়েছিল! কয়েকটি চালাঘরে ঠাসাঠাসি করে সকলের মাথা গুঁজে থাকা। এ ছাড়া কেউ থাকে তাঁবুতে। কেউ কেউ নদীর বুকে নোঙ্গর করা জাহাজে। সুতানুটি তখন তাদের চোখে অবাঞ্ছিত এক নতুন উপনিবেশ। নতুন দেশ। চারদিকে জঙ্গল আর জঙ্গল। শীতের শেষে হঠাৎ সেই জঙ্গলে বসন্ত এল। জঙ্গলের গাছে গাছে নানা রঙের ফুল।

রাতে পিন্‌পিনে মশার উৎপাত ছিল, কিন্তু সেই মশার কামড়ের ওপর স্নিগ্ধ প্রলেপ বুলিয়ে দিয়ে এল সাদা চন্দনের মতো মিঠে জ্যোৎস্না। নদীর ধারের বাতাসটুকুও ভারি মনোরম লাগল।

ক'দিন ধরেই ঐ বিদিকিচ্ছিরি শব্দটা জঙ্গলকে মাতিয়ে রেখেছে। ঠিক যেন পাখির কিচির মিচির। খচ্‌মচ্‌ খচ্‌মচ্‌। তালে তালে ঢোলক বাজছে। এর ভেতর কেমন যেন এক আদিম মাদকতা আছে। আদিম বৃত্তিকে খুঁচিয়ে জাগিয়ে তোলে। তা দিন দুই তিন ধরে তরুণ ইংরেজরা ঐ শব্দ শুনে কেঁপে উঠছে।

সকাল বেলায় ওরা জঙ্গলে ঢুকেছিল শিকারের প্রলোভনে। কিন্তু শিকারের থেকেও যা তাদের আরও বেশী করে টানছিল, সে হল ঐ বিদিকিচ্ছিরি শব্দটা। শেষে ঐ শব্দটা ধরেই তারা পায়ে পায়ে এগিয়ে গিয়েছিল। শব্দটার মোহিনী শক্তি আছে। শব্দটা ওদের টানতে টানতে একেবারে সর্বনাশের মাঝখানে টেনে নিয়ে গিয়েছিল।

দিঘির ধারে খাড়াই দুটি মঞ্চ। এক মঞ্চে শ্যাম রায়। গোবিন্দজী। অন্যদিকের মঞ্চে শ্রীরাধা। নারী দেবতা। ফিমেল গড। দুই দেব-দেবীকে দুপাশে রেখে চলেছে রঙের খেলা। এ খেলায় পুরুষদের রাখাল বেশ। তারা গোবিন্দজীর পক্ষে। আরেক দিকে পুরুষের নারী বেশ। তারা রাধিকাজীর পক্ষে। নারীরা ফাগ ছুঁড়ছে পুরুষদের দিকে, পুরুষরা ছুঁড়ছে কুঙ্কুম। নারীদের হাতে রঙের ঝারি। পুরুষদের হাতে পিচকারি। ফাগে-কুঙ্কুমে আকাশ লাল। দিঘি লাল। জঙ্গলের ভেতর নির্জন ভূমি চেহারা নিয়েছে লোকালয়ের। থেকে থেকে কেবল আওয়াজ উঠছে, 'হোরি হ্যায়! হোরি হ্যায়!' তালে তালে ঢোলক বাজছে। খচ্‌মচ্‌ খচ্‌মচ্‌।

তরুণ ইংরেজদের চোখে ব্যাপারটিকে 'স্যাটার নালিয়া' উৎসবের মতো লেগেছিল। ওরাও চাইল উৎসবে মেতে উঠতে। কিন্তু উৎসবে যোগ দিতে চাইলেই যোগ দেওয়া যায় না। উৎসব মত্ত এদেশীয়দের কাছ থেকে ঘোরতর আপত্তি উঠল। শ্যাম রায়ের দোলে ম্লেচ্ছ-যবনদের কিছুতেই নেওয়া যায় না। ফিরিঙ্গিরা দোল মঞ্চের কাছে এলে গোবিন্দজীর মন্দির অপবিত্র হবে। তাছাড়া ঘরের মেয়ে-বৌরা এসেছেন। তাঁরাও ফাগ ছুঁড়ে দিচ্ছেন। এঁরা কি শেষে যবনদের হাতে পবিত্রতা হারাবেন?

খিট্‌কেল বাধতে দেরি হল না। প্রথমে গালিগালাজ। সেই গালিগালাজ থেকে হাতাহাতি। ইংরেজদের হাতে বন্দুক ছিল, কেন না তারা শিকারে বেরিয়েছিল। সেই বন্দুক বাগিয়ে তারা তেড়ে এল। দেশি লোকেরা জঙ্গলের পথে এসেছিল বর্শা আর তীর-ধনুক নিয়ে। এরাও সেইসব অস্ত্র নিয়ে ইংরেজদের মোকাবিলা করতে এগোল। লালদিঘির জল সেদিন আরেকটু হলেই মানুষের খুনে লাল হয়ে উঠত। তবে ঘোড়া ছুটিয়ে চার্ণক সাহেব ঠিক চূড়ান্ত মুহূর্তে হাজির হয়ে

গিয়েছিল। তাই রক্ষে। বেসামাল পরিস্থিতি কোনওরকমে সামলানো গেল। অনেক কষ্টে যুযুধান ইংরেজদের ফিরিয়ে এনেছিল চার্ণক।

নতুন উপনিবেশ সুতানুটিতে ইংরেজ তরুণদের নিয়ে রীতিমত এক সমস্যা। রোজ গোলমাল। দিনে দিনে সমস্যা আরও জটিলতর হচ্ছে।

ইউরোপে ফরাসিদের সঙ্গে ইংল্যান্ডের যুদ্ধ বাধার ফলে সমস্যা আরও সংকটজনক হয়েছে। মহামান্য সম্রাটের যুদ্ধ ঘোষণার একটি প্রতিলিপি কোম্পানির কর্তারা চার্ণকের হাতে কয়েকমাস আগে ধরিয়ে দিয়েছে। অনুরোধ করেছে সতর্ক থাকতে। সাবধান। ফরাসিদের থেকে সর্বদাই যেন দূরে দূরে থাকা হয়। কেবল কি এইটুকু! নির্দেশ এসেছে, বাংলা মুলুকের সব ইংরেজদের নিয়ে চলে এস সুতানুটি। জঙ্গল ঘেরা দুর্গম সুতানুটিই এখন ইংরেজদের সর্বাধিক নিরাপদ জায়গা। এর ফলে, মেলা ইংরেজ এসে জড় হয়েছে এই একরত্তি জায়গায়। খালবিল আর ডাঙ্গা-ডহর ভরা এই সামান্য জমিনে ইংরেজরা থিক্ থিক্ করছে। সঙ্গে সঙ্গে সমস্যা জট পাকাচ্ছে।

ঘরবাড়ি নেই। মাথা গোঁজবার মতো চালা ঘরেরও অভাব। কেউ থাকে জাহাজে; কেউ তাঁবুতে। অনেকে নিজে নিজে বানিয়ে নিয়েছে নিজের কুঠি। মাটির দেওয়াল। মাথায় গোলপাতা কিংবা ছনের ছাউনি। এ অবস্থায় একজন সুসভ্য ইংরেজ কী করে দিনের পর দিন থাকতে পারে? হোটেল নেই, রেস্তোরাঁ নেই। টেনিস নেই, ক্লাব নেই। এমনকি মদ খাওয়ার পানশালা পর্যন্ত নেই। ধারে কাছে ইংরেজ মেয়েরা নেই যে, প্রেম করবে। দীর্ঘদিন ধরে দেশছাড়া। আবার কখনও দেশে যে ফিরে যেতে পারবে; তার কোনও সম্ভাবনাও নেই! এই নিরানন্দ প্রবাসে ইংরেজ তরুণেরা কী নিয়ে থাকবে? সামাজিক সুস্থ মানুষের স্বভাব তাই এই ইংরেজরা পেল না। বরং যা পেল, তা একেবারে বিপরীত। এরা হয়ে উঠল ঘোরতর অসামাজিক। নারী-লোভি। স্বার্থপর। হিংস্র। কখনও কখনও বিচার-বুদ্ধিহীন দানব বিশেষ। বেপরোয়া।

নতুন উপনিবেশে যে এমন সমস্যা হতে পারে, তা চার্ণক আগেই আশংকা করেছিল। হোলির দিনে ইংরেজ তরুণদের চোখে যে পাশবিক লুব্ধতা চার্ণক দেখেছিল, তা মনে গাঁথা রয়েছে। তাই এবারে সুতানুটিতে পা দিয়েই কতকগুলি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। এদের ভেতর পয়লা ব্যবস্থা যেটি ছিল, তা হল 'পান্চ হাউস।' এই পান্চ হাউসে ছিল অঢেল পানের ব্যবস্থা। এটি চালাবার দায়িত্ব দেওয়া হল জন হিলকে। এই পান্চ হাউসে অবসর বিনোদনের জন্য রাখা ছিল একটি বিলিয়ার্ড টেবিল। এই বিলিয়ার্ড খেলার জন্য খেলোয়াড়দের কোনও পয়সাকড়ি লাগত না। না একটা কানাকড়ি, না কোনও ঢেপুয়া। সুতানুটিতে শান্তি রক্ষা করবার জন্য একশ সেপাই দিয়ে একটি বাহিনী তৈরি করে, তার মাথাও করে দেওয়া হয়েছিল জন হিলকে। জন হিল থাকত নিজের কুঠিতে। সংগে থাকত

মিসেস্ হিল। হিল সাহেব বেশ শক্তপোক্ত লোক। সুতরাং শুরুটা সাহেব ভালভাবেই করতে পেরেছিল। তবে কিছুদিনের মধ্যে গোল পাকাতে দেরি হল না। গোল পাকানোর খবর প্রথম এলিসই নিয়ে এল।

'ওই নটোরিয়াস জন হিল কী করেছে জান, চার্ণক? হি ইজ্ ইন্‌টলারেব্‌ল।'

'কেন? কী হল? কী করল জন হিল? তোমাকে কি ড্রিংকস দেয়নি?'

'নো নো', ঘন ঘন মাথা নাড়তে থাকল এলিস, 'আই ডু নট্ কেয়ার ফর হিজ্ ড্রিংকস্। ওই বদমাসটা পান্‌চ হাউস আর বিলিয়ার্ড নিয়ে কী করছে জান? করছে বিজনেস। মেকিং লটস অফ প্রফিট্।'

'নাফা? জন হিল অত টাকা নিয়ে কী করবে? ওর তো ছেলেপুলে নেই!'

'তা না থাক। হি হ্যাজ্ব এ টেরিব্‌ল ওয়াইফ। আ শ্রু।'

'কেন, জন্ হিলের বিবি কি তোমাকে পাত্তা দেয়নি?'

এলিস জন হিলের বিবির কথায় ভীষণ উত্তেজিত হয়ে উঠল। উত্তেজিত হয়ে চিৎকার করে বলতে থাকল, 'ফর হেভেন্‌স সেক্ ঐ জেনেনার কথা তুমি আমার সামনে উচ্চারণ কোর না, জোব। সি ইজ এ উইচ্, আ শ্রু। ওই নরকের কাছে একমাত্র জন হিলই থাকতে পারে। নো আদার জেন্‌টল ম্যান।'

'তা হলে জন হিলের কথাই বলা যাক। তার সম্পর্কে তোমার অভিযোগটা কী?'

'ঐ লোকটাকে তুমি আমাদের ভ্যালি অব সুতানুটি থেকে তাড়াও। হি ইজ অ্যান্ ওপেন্ টেম্‌পারড্ ম্যান অ্যান্ড ডিবচ্‌ড ইন লাইফ।'

'ঠিক আছে এলিস। তোমার অভিযোগ আমি খতিয়ে দেখছি। কোনও গলতি পেলে আমি জন হিলকে ছাড়ব না, নিশ্চয় তাড়াব।'

যেমন নাটক করে এলিস সাহেবের আগমন বা প্রবেশ হয়েছিল, ঠিক সেই রকম নাটকীয় ভাবেই প্রস্থান হল এলিসের। জন হিলের সম্পর্কে ভেতরে ভেতরে খবর নেবার চেষ্টা করল চার্ণক। খবর সংগ্রহ করে দেখা গেল যে, এলিসের দেওয়া খবর সর্বৈব উড়িয়ে দেবার নয়। আবার তেমনভাবে রাখবার নয়। তবু এলিসের মুখ চেয়েই একটা ব্যবস্থা নেওয়ার দরকার ছিল। কেননা, কোম্পানির খাতায় চার্ণকের পরেই এলিসের স্থান। তার তো একটা সম্মান আছে! দিন কয়েক পরে যখন জন হিলকে ডেকে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে, তখন হঠাৎ দেখা গেল এলিস আর জন হিল দু'জনে ভাই ভাই! চৌরঙ্গির জঙ্গলে হামেশাই দু'জনে শিকার করতে যাচ্ছে। শিকার করে আনছে শামুকখোল আর বুনো মোরগ। কখনও কখনও বুনো শুওরও মিলছে। এইসব পাখি আর পশুর মাংস ঝল্‌সে নানারকম খাবার বানাচ্ছে মিসেস্ জন। এলিস আর জন হিল এই মাংস দিয়ে চাট বানিয়ে প্রচুর অ্যারাক পান্‌চ খাচ্ছে।

এবারের হোলি উৎসব পেরিয়ে গেল নির্ঝঞ্ঝাটে। চৈত্র মাসের গাজনও গেল। গেল চড়কও। চড়কডাঙ্গায় গিয়ে অনেকেই চড়ক দেখে এসেছে, কিন্তু কোনও

হাঙ্গামার সৃষ্টি হয়নি। চড়কের দিন একটা হাতি এসেছিল। মজা করে এবং পাল্লা করে সবাই হাতি চেপেছে।

ইতিমধ্যে কয়েকটি ডাকাতির রোমহর্ষক ঘটনা কানে এল। ধর্মতলার দিকে খাঁড়ির ওপরে যে সব ডাকাত আছে, এরা সে ডাকাত নয়। এ ডাকাতরা রয়েছে চিত্রেশ্বরীর মন্দিরের কাছে। এরা চিত্রেশ্বরীর মন্দিরে নরবলি দিয়ে ডাকাতি করতে গিয়েছিল। ডাকাতির সাফল্যে আবার পরের দিন নরবলি দিয়েছে। জন হিল এ সংবাদ পেয়ে চার্ণকের কাছে এসেছিল তার সেপাইদের নিয়ে। অনুমতি চাইছিল চিৎপুরে ঢুকতে ডাকাতদের তাড়িয়ে দেবার জন্য। চার্ণক সে অনুমতি দেয়নি।

গরম এসে গেল। দুরন্ত বৈশাখ। ঠা-ঠা গরম। আর এই বৈশাখেই সেই ভয়ংকর কাণ্ডটা হয়ে গেল।

দীর্ঘ বিকেল। এই বিকেলেও নিমতলার চৌকিতে হাটুরেদের সংগে বেশ গল্প জমে। তা সেদিনও গল্প চলছিল। চলছিল ব্যবসা-পত্তরের কথাও। হঠাৎ কিছুদূরে দেখা গেল কুণ্ডলি পাকানো ধোঁয়া। ধোঁয়া ঠেলে লাফিয়ে উঠল লকলকে আগুনের শিখা। চারদিক থেকে ভেসে আসতে থাকল আর্ত চিৎকার আর হাহাকার।

চার্ণককে ঘিরে যারা বসেছিল, তারা দৌড়ে চলে গেল আগুনের দিকে। চার্ণকও দৌড়ে গেল। আগুনের শিখা তখন লেলিহান। বদ্রীদাস পথ আটকাল, 'সাহেব তুমি এখানে দাঁড়াও। আমি দেখছি। আগুনের সংগে লড়াই আরম্ভ হয়ে গেছে। ঐ দেখ সাহেব, গঙ্গা থেকে হাঁড়ি কলসি করে লোক জল নিয়ে দৌড়চ্ছে। আগুন এখনই নিভে যাবে।'

'কিন্তু এ ভয়ংকর আগুন কে লাগুলে?'

'কেউ লাগায় না সাহেব, মাঝে মাঝে এমন আগুনের ঘটনা এমনিতেই হয়।'

'আমার বিশ্বাস হয় না। এর পিছনে নিশ্চিত 'সাবোতাজ' আছে। বেটুরাঁতে যেমন আগুন লাগাইয়া হার্মাদরা হাট তুলিয়া দিত, এখানে তাহাই করা হইতেছে। বদ্রিদাস তুমি খোঁজ নাও। ইট্ ইজ্ এ কন্সপিরেসি।'

দাউ দাউ করে তখনও একপাশ জ্বলছে। হাজার লোকের কলরোল! আর্ত চিৎকার। কান্না। জন হিল সাহেব তাঁর সেপাইদের নিয়ে চষে বেড়াচ্ছে এক প্রান্ত থেকে হাটের আর এক প্রান্ত। বেরিয়ে পড়েছে অশ্বারোহী সেপাইরাও। বদ্রীদাসের উদ্বেগও কিছু কম নয়। কেননা, যেখানে প্রথম ধোঁয়ার কুণ্ডলী দেখা গেল, সেখানেই তার নিজের আড়ত। সে আড়তে মালপত্তরও কিছু জমা আছে। সুতরাং তার অনেক টাকাই ছাই হয়ে গেছে। বদ্রীদাস অস্বস্তি বোধ করল। অস্বস্তি বাড়তে থাকল। সাহেবকে ফেলে যাওয়া সম্ভব নয়। তাই সে গেলও না।

সূর্য হেলে পড়ল পশ্চিমে। বেলা ফুরিয়ে আসছে। দীর্ঘ ছায়া দীর্ঘতর হতে থাকল। বাতাসে পোড়া গন্ধ। পায়চারি করছে চার্ণক সাহেব। আর বিড় বিড়

করছে সাহেব, 'ইট্ ইজ কন্‌স্‌পিরেসি—ইট্ ইজ্ এ সাবোতাজ্—আমি এ শয়তানি বরদাস্ত করিব না। ক্রিমিনালকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। বাট্ হু ইজ হি? হার্মাদরা কি আসিয়াছে?' বদ্রীদাস সাহেবকে বোঝাতে চেষ্টা করল, 'না সাহেব, এর পিছনে কিছুই হয়ত নেই! হয়ত কোনও আহম্মক তামাক খেতে গিয়ে এ কাণ্ড করেছে। তুমি এত সব ভেব না!' কিন্তু কিছু পরেই দেখা গেল বদ্রীদাসের ঐ অতি সরলীকৃত আগুন লাগার ব্যাখ্যা একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয়। বরং ঠিক উলটো। জন হিল আর তার সেপাইরা একটা লোককে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে নিয়ে এসে ফেলে দিল চার্ণকের পায়ের ওপর। সামরিক কায়দায় অভিবাদন করে জন হিল চার্ণকের পায়ের ওপর সামরিক কায়দায় অভিবাদন করে জন হিল চার্ণককে বলল: 'হিজ্ এক্‌সেলেন্সি জোব চার্ণক, হিয়ার ইজ্ দি নটোরিয়াস ম্যান হু ইজ্ রেসপনসিবল ফর দিস অ্যাক্ট অব ক্রাইম।'

লোকটি আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। অন্ধকারে চেনা যায় না। চার্ণক, হুংকার দিয়ে উঠল, 'লোকটা হার্মাদ নাকি?'

লোকটি কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'না। আমি এখানকার লোক। অসাবধানে আগুন লেগে গেছে।'

গলার স্বর শুনে বদ্রীদাস চিনতে পারল। লোকটির ওপর ঝুঁকে পড়ে বদ্রী বলল: 'কে ফাগুলাল! তোর এ দশা কেন? তুই আগুন লাগিয়েছিস্? তাহলে তো আমার সর্বনাশ করেছিস্ রে?' বদ্রীদাসের গলা কান্নায় যেন অবরুদ্ধ হয়ে গেল।

চার্ণক বলল, 'এ বদমাশ লোকটা তোমার সারভেন্‌ট?' বদ্রী বলল: 'জি।'

চার্ণক গম্ভীর হয়ে গেল। বেশ খানিকক্ষণ পায়চারি করল। তারপর জন হিলকে ডেকে নির্দেশ দিল, 'এই বদমাসটাকে বিশ ঘা বেত লাগিয়ে এই সুতানুটি মুলুক থেকে বের করে দাও। আর হুঁশিয়ার করে দাও যে, মুলুকের ধারে কাছে যেন না আসে! এলে কোতল হয়ে যাবে।'

ফাগুলাল কেঁদে উঠল। জন হিলের হাতেও চাবুক উঠল শাঁ শাঁ করে।

।। আট ।।

সুতানুটিতে বর্ষা আসন্ন। মেলা কালো কালো মেঘ দেখা দিয়েছে আকাশে। মাঝে মাঝেই সূর্য ঢাকা পড়ছে। ছায়া পড়ছে। তবে বৃষ্টি এখনও নামেনি।

কদম গাছে মৌমাছিদের ভন্‌ভনানি। কদম এখনও ফোটেনি। খড়কুটো দিয়ে পাখিরা বাসা বাঁধছে। শোনা যাচ্ছে, তাদের কিচির মিচির, কলরব। এদিকে

আসন্ন বর্ষার জন্য গৃহস্থদেরও মধ্যেও কম প্রস্তুতি চলছে না। জঙ্গল থেকে কাটিয়ে আনা হচ্ছে জ্বালানি কাঠ। সে কাঠ রাখা হচ্ছে সাজিয়ে গুছিয়ে। স্তূপাকার করে জমা করা হচ্ছে শুকনো ঘুঁটে। দাক্ষায়নী কেবল জ্বালানি সঞ্চয় করে ক্ষান্ত নন। তিনি থেকে থেকে ছেলের ওপর হুংকার ছাড়ছেন, 'তা জ্বালানি তো জোগাড় হয়েছে, কিন্তু জ্বালানি দিয়ে রান্না করবে কী? ফোটাবে কী? কেবল ভাত? তা শুধু ভাত গলা দিয়ে নামবে তো?'

ভাত যাতে গলা দিয়ে নামে, তার জন্য ব্যবস্থা করতে দাক্ষায়নী আজ সারা সকাল ডালের বড়ি দিয়েছেন কুলো উলটে। নয়নতারা চলে যাবার পরে বদ্রীদাস একটা বুড়ি-ঝি এনে দিয়েছে। সে বুড়ি খিদমত খাটবে কী, নিজেই নড়তে চড়তে পারে না। কোনও রকমে দু'বেলা বাসন মাজে, ঘর-দোর মোছে, এই পর্যন্ত। দুহাত ভরা হাজা। তাকে দিয়ে অন্য কোনও কাজ করতে ভরসা পান না দাক্ষায়নী। ইচ্ছেও করে না। তাই বড়ি তৈরির জন্য ডাল বেটে দিয়েছে বাতাসি। দাক্ষায়নী বড়ি দিয়েছেন।

কেবল ডাল বেটে দিয়ে কিন্তু বাতাসির দায় শেষ হয়নি। এখন তার ওপর ভার পড়েছে, বড়ি পাহারা দেবার। রোদ্দুরে শুকুতে দিয়েছে বড়ি, সেই বড়ি যাতে কাঠবেড়ালিতে না-খেয়ে যায়, তার পাহারাদারি করছে বাতাসি। ঠিক দুক্খুর বেলা। ঘরের ভেতর চৌকিতে শুয়ে আছেন দাক্ষায়নী। বাইরের দাওয়ায় ভিজে চুল শুকোতে শুকোতে পাহারাদারির কাজ সারছে বাতাসি। মাঝে মাঝে তাকিয়ে দেখছে আসন্ন বর্ষার আকাশ। খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকে গেছে। দাক্ষায়নীর আজ একাদশী।

চারদিক নিঝুম। কেবল পাখিদের কিচির মিচির। হঠাৎ দরজায় খঞ্জনির শব্দ উঠল।

'মা আছ নাকি গো, মা!'

'কে এল?—ব্রজগোপালের গলা মনে হচ্ছে?'

দাক্ষায়নী উঠে বসলেন চৌকির ওপর। বাতাসির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বাছা, দরজাটা খুলে দাও তো। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ব্রজগোল হাঁক পাড়ছে মনে হল। আহা, ব্রজ আমার কতকাল পরে এ বাড়িতে পা দিল।'

বাতাসি দাওয়া থেকে নেমে গিয়ে দরজাটা খুলে দিল। দেখল, এক দীর্ঘদেহী যুবক দরজার কাছে খঞ্জনি নিয়ে দাঁড়িয়ে, কাঁধে ঝোলা। মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল। চোখ দুটি দীপ্ত। প্রশস্ত কপাল। জোড়া ভুরু। সাদা কাপড়। সাদা উত্তরীয়। পুরুষোচিত চেহারা, অথচ ভারি মিষ্টি। বাতাসি অনেকদিন হল বাইরে বের হয় না। দাক্ষায়নীও চান না যে বাতাসি বাইরে যাক। কেননা, তাঁর ধারণা সুতানুটির চারদিকে চোর আর মাতাল থিক্‌থিক্ করছে। আগুন লাগার সেই ঘটনায় ফাগুলাল সুতানুটি থেকে বিতাড়িত হওয়ার পর থেকে তাঁর এই ধারণা

আরও দৃঢ় হয়েছে। দাক্ষায়নী বাতাসিকে বাইরে পাঠাতে অনিচ্ছুক। এর ফলে, বাতাসি বদ্রীদাস ছাড়া দীর্ঘদিন আর কোনও পুরুষের মুখ দেখেনি। আজ দেখল। ব্রজগোপালকে দেখে তার কেমন যেন ভালও লাগল। এদিকে বাতাসিকে ইতিপূর্বে ব্রজগোপাল দেখেনি। সুতরাং ব্রজ অবাক হল। বিনয়ের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করল, 'দাক্ষায়নী মা বাড়িতে আছেন তো!'

ভেতর থেকে হাঁক শোনা গেল, 'আছি, বাবা আছি। তুমি ভেতরে চলে এস। তা এতদিন পরে কি তোমার এই মাকে মনে পড়ল?'

ব্রজগোপাল হাত পা ধুয়ে এসে দাওয়ায় বসল। মাথা চুলকে কৈফিয়ত দিয়ে বলল, 'সঠিক বলেছ মা। অনেকদিন পরেই এলাম। বদ্রীদাদা নিশ্চয় হাটুরে সাহেবদের কাছে গিয়ে বসে আছে। আর তুমি একা, এটা আমি ধরেই নিয়েছিলাম। আর ভেবেছিলাম তুমি এখনও ছেলের বিয়ে দাওনি। কিন্তু এখানে এসে দেখি তোমার বাড়িতে দেবী দুর্গার মতো ঝক্‌ঝকে একখানি প্রতিমা। প্রতিমা দেখে থমকে গেলাম। প্রথমে ভাবলাম, বদ্রীদাদার সুমতি হয়েছে। বুঝি বিয়ে করেছে। আমার বৌদি এসেছে। কিন্তু ভাল করে তাকিয়ে দেখি ব্যাপারটা তা নয়। হতাশ হলাম। এখন এনার পরিচয়টা যে আমার জানতে ইচ্ছে করছে, ইনি কে মা?'

দাক্ষায়নী হেসে বললেন, 'তুই ঠিক একইরকম আছিস ব্রজ, ঠিক এক রকম। ভণিতা ছাড়া তোর কথা বেরোয় না। তুই যেমন আমার কুড়িয়ে পাওয়া ছেলে, এও তেমনি আমার কুড়িয়ে পাওয়া মেয়ে তো নয়, যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। বামুনের ঘরে এমন মেয়ে দেখা যায় না। বড় গুণের মেয়ে।'

'তাহলেও তোমার কপাল ভাল মা। হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলো না। যদি পছন্দ হয়ে থাকে, চট্‌পট্‌ সংসারে বেঁধে ফেল। মেয়েকে মন্ত্র পড়ে ছেলের বৌ করে নাও। অমন শেকল আর কোথাও পাবে না। বিয়ে দিয়ে আটকে দিলে চিরকাল বাঁধা থাকবে। পালাতে পারবে না।'

'তা মন্দ বলিস নি তুই ব্রজ। আমিও যে কথাটা ভাবিনি, তা নয়। হাজারবার ভেবেছি। কিন্তু যাকে বিয়ে দোব, সেই বদ্রীই আমাকে পাত্তা দিচ্ছে না। থিতু হয়ে দুটো কথা বলবার অবকাশ দেয় না। কেবল ব্যবসা আর ব্যবসা। টাকা আর টাকা। আমি বলি, আরে অ হাঁদারাম, টাকা যে কামাচ্ছিস্‌, গাদা গাদা টাকা জমাচ্ছিস, তোর এসব বৈভব ভোগ করবে কে? বিয়ে থা করছিস না, ছেলেপুলে হবে কবে? আমি কি নাতি-নাতনির মুখ দেখতে পাব না রে? তা আমি কেবল বকর বকর করেই যাই। বদ্রী কোনও কথাই কানে নেয় না। তুই একটু বুঝিয়ে বল দেখি ব্রজ।'

ব্রজ বলল, 'আমি তোমার এখানে দিন পনেরো কি মাস খানেক থাকব ভাবছি। একটু বিশ্রাম নেব। এই সময় কোনও এক ফাঁকে বদ্রীদাদাকে বুঝিয়ে বলব। দেখি বিয়ের পিঁড়িতে দাদাকে বসাতে রাজি করাতে পারি কিনা! বদ্রীদাদা লোকটা

সত্যিই যেন কেমন। বামুনের ঘরের কুলীনরা এই বয়সে দশ-বিশটা বিয়ে করে বসে থাকে। আর ঘুরঘুর করে শ্বশুরবাড়ি ঘুরে বেড়ায়। বদ্রীদাদা বিয়ে করল না, একদিনের তরে সুতানুটির বাইরে রাত কাটাল না। জানল না শ্বশুরবাড়ি কাকে বলে। একেই বলে কপাল।'

ব্রজগোপাল লোকটিকে দেখে বাতাসির প্রথমে ভালই লেগেছিল। ভারি মিষ্টি চেহারার মানুষ। শরীরের মধ্যে বেশ একটা পুরুষোচিত ভাব আছে। বাতাসির মনে হয়েছিল এই ব্রজগোপাল তার অনেক দিনের চেনা। যেন অনেকদিন আগে তাকে কোথাও-না-কোথাও দেখেছে বাতাসি। তাই বেশ খানিকটা আগ্রহ নিয়ে মনের ভেতর লুকিয়ে থাকা চেনা মানুষটিকে বাতাসি খুঁজতে চেষ্টা করেছিল ব্রজগোপালের মধ্যে। দাক্ষায়নীর সঙ্গে সহজভাবে মেলামেশাটাও তার বেশ পছন্দ হয়েছিল, কিন্তু দুজনের ভেতর বাতাসিকে নিয়ে আলোচনাটা তার একেবারেই খারাপ লাগল। মনের স্বচ্ছ দর্পণে ছায়া পড়ল আশঙ্কার।

সেই কবে বাতাসি চলে এসেছে পীরপুকুর থেকে। এসেছে সে একটি ঠিকানার খোঁজে। সে ঠিকানার খোঁজ বাতাসি আজও পায়নি। ফাগুলাল বলেছিল যে, সে হাতিদহের হদিশ জানে। তাকে একদিন হাতিদহে নিয়ে যাবে। কিন্তু ফাগুলাল নিয়ে যেতে পারেনি। কেননা, হাতিদহের থেকে তার উৎসাহ বেশি ছিল বাতাসির ওপর। হাতিদহের ছল করে সে বাতাসিকে টেনে এনেছে এই সুতানুটিতে। তার হয়ত খারাপ উদ্দেশ্য ছিল, হয়ত কেন, তাকে খারাপ ভাবেই ব্যবহার করতে চেয়েছিল সে। কিন্তু পারেনি। ফাগুলালের হাত থেকে তাকে উদ্ধার করেছেন দাক্ষায়নী। কেবল উদ্ধার কেন, বাতাসিকে আশ্রয় দিয়েছেন তিনি। দিয়েছেন নিরাপত্তা। আজ তিনি নিজের ছেলের সঙ্গে বাতাসির বিয়ে দিতেও চাইছেন। কিন্তু বাতাসি কি তা মেনে নেবে?

বাতাসির অবুঝ মনে তোলপাড় শুরু হল। হাতিদহে ঘোষাল বাড়ির খোঁজ তার জীবনে আজ বড় জরুরি। পিসিমার স্নেহের বন্ধন সে ছিঁড়েছে এক লহমায়। সে তীব্র ব্যাকুলতায় অসুস্থ পিসিমাকে ছেড়ে চলে এসেছে, সেই ব্যাকুলতা মাঝে মাঝেই তার মনকে উচাটন করে। আগে অনেককেই হাতিদহের কথা জিজ্ঞাসা করত, এখন করে না। কেননা, সুতানুটির লোকেরা এই হাতিদহের খবর রাখে না। হাতিদহের নাম শুনলে কেমন করে যেন তাকায়। ফাগুলালের ঘরে যে ছোকরাটা থাকত, সেই ঘনশ্যামকেও জিজ্ঞাসা করেছে বাতাসি। কিন্তু ঘনশ্যামও কোনও হদিশ দিতে পারেনি। উলটে সে আবার জিজ্ঞাসা করেছিল, 'এই হাতিদহের নামটা কোথা থেকে শুনলেন বলুন তো? সুতানুটির ধারে-কাছে এ গ্রাম নেই।'

'ফাগুলাল যে জানে বলেছিল।'

ঘনশ্যাম বাতাসির ওপর একটু চোখ বুলিয়ে নিয়ে একটা অদ্ভুত হাসি হেসেছিল।

বলেছিল, 'ও আপনাকে ভাঁওতা দিয়েছে। ওর কথায় ভরসা রাখবেন না।'

এ ঘটনার পর থেকেই বাতাসি নিজের জিজ্ঞাসা গুটিয়ে রেখে দিয়েছে। তেমন করে কারও কাছে হাতিদহের প্রসঙ্গ আর তুলতে পারেনি। অথচ এই হাতিদহের কথা তাকে জানতেই হবে। একবার যেতেই হবে ঘোষাল বাড়িতে। ব্রজগোপালকে দেখার পর থেকেই বাতাসি মনের গুমটটা হটাৎ যেন ফেঁসে গেছে। মনে হয়েছে, এই লোকটা তাকে সাহায্য করতে পারবে। কিন্তু দাক্ষায়নীর সঙ্গে ব্রজগোপাল যেভাবে কথা বলছে, তাতে বাতাসি মোটেই উৎসাহ বোধ করে না।

গাছের ছায়া পড়ছে বড়ির কুলোর ওপর। বাতাসি নেমে এল উঠোনে। ছায়া থেকে টেনে টেনে রোদের দিকে কুলোগুলোকে নিয়ে এল বাতাসি। আর সে দাওয়ার দিকে পা বাড়াল না। একটা কাঠের গুঁড়ি রাখা ছিল উঠোনের ওপর। তার ওপর বসে চুল শুকোতে থাকল। ব্রজগোপাল আর দাক্ষায়নীর সব কথা ঠিক কানে আসছে না, তবে কিছু কিছু কথা শোনা যায়। ছেঁড়া ছেঁড়া কথা।

'অনেকদিন পরে সুতানুটিতে এলাম মাগো! তা জায়গাটা বেশ গমগমে হয়েছে।'

'হ্যাঁ, যত হতচ্ছাড়া হাটুরেদের ভিড় হয়েছে। ভিড় হয়েছে মাতাল আর চোর-সিঁদ কাটার! এখানে জাত নেই। ধম্ম নেই। ছোঁয়াছুঁয়ির বিচার নেই। এমনকি ঠাকুর দেবতা নেই। আর জাত ভাঁড়িয়ে কত লোক যে এখানে পৈতে গলায় বামুন হয়ে গেল, তার ঠিক নেই।'

'তা এখানকার দোষ দাও কেন, মা! গোটা বাংলা মুলুকটার এইরকম অবস্থা। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা কেবল পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। তবু জাত বাঁচাতে পারছেন না। এক গ্রাম থেকে আরেক গ্রামে পালাচ্ছেন। মন্দির-দেবালয় সব ভেঙে পড়েছে। ফৌজদার-ডিহিদারের অত্যাচারে অনেক বড় বড় পরিবার উচ্ছন্নে গেল। নেউগি-চৌধুরি হলে তো আর কথাই নেই, তাদের সর্বনাশ হচ্ছে আগে। তার তুলনায় এই সুতানুটি তো সুখের জায়গা, এখানকার লোকে অনেক শান্তিতে আছে, মা! বেলেঘাটার চৌধুরিরা আমাকে এক টুকরো জমি ব্রহ্মত্ব করে দান করবে বলেছে। তা বুড়ো বয়সে, যখন চলতে পারব না, এখানে এসে বাস করব ভাবছি।'

শেষের কথাগুলিতে একেবারেই কান দিলেন না দাক্ষায়নী। কেননা সুতানুটির প্রশংসা তিনি একেবারেই সহ্য করতে পারেন না। তাই একদম পিছিয়ে গিয়ে তিনি পুরনো প্রসঙ্গে ফিরে এলেন। বললেন, 'হ্যারে অ ব্রজগোপাল, তা তুই এই 'সারা বাংলা মুলুকটা চষে বেড়াস? তাহলে তুই অনেক জায়গা দেখিস্ তো!'

'তা দেখি।'

'তোর মুখে আমি সব জায়গার খবর পাব?'

'পাবে। আমি এ ক'দিন ধরে তোমাদের কাছে সেসব গল্পই করব। দু'বছরের অনেক গল্প জমে আছে।'

বিকেলের দিকে ব্রজগোপাল বেড়াতে বের হল। বাতাসি এসে দাক্ষায়নীর কাছে বসল। দাক্ষায়নীর মনটা আজ প্রফুল্ল। বাতাসিকে ছেলের-বৌ করবার প্রস্তাবটা মনে ধরেছে তাঁর। বাতাসির ঠাণ্ডা স্বভাব ও নীরব সেবা গোড়া থেকেই তাঁর মন জয় করে বসে আছে। ছেলের বৌ হিসেবে এই মেয়েটিকে অনেকদিন ধরেই তিনি গ্রহণ করার কথা মনে মনে ভেবেছেন। কিন্তু সেটা ভরসা করে বাস্তবে রূপায়ণ করার কথা চিন্তা করেননি। ব্রজগোপালের কথায় তিনি মনে জোর পেলেন। ঠিক করলেন, আজ বদ্রী এলেই কথাটা পাকা করতে হবে। বাতাসি কাছে আসতেই দাক্ষায়নী সস্নেহে কাছে বসালেন। বাতাসী বলল: 'মা, ঐ যে ব্রজগোপাল সাধু এসেছে, ওঁর দেশ কোথায়?'

'দেশ? ব্রজগোপালের তো দেশ নাই বাছা! ব্রহ্মচারী। ঠাকুরের গান গেয়ে দেশে দেশে ঘুরে বেড়ায়।'

'উনি ব্রাহ্মণ?'

'হ্যাঁ, ব্রাহ্মণ বৈকি! গলায় ধবধবে সাদা এক গোছা পৈতে দেখনি?'

'উনি আপনাকে মায়ের মতন ভালবাসেন? কেমন করে ওঁকে পেলেন মা?'

'ওকে পেলাম কী করে? সে এক ইতিহাস মা! আমার ছেলে বদ্রীই ওকে নিয়ে এসেছিল এ বাড়িতে বছর দশ-বারো আগে। তখন ওরই-বা বয়স কত? বছর দশ-বারোর বেশি বয়স নয়। তখনও ঐ গোপাল গোপাল চেহারা। ভারি মিষ্টি স্বভাব আর গোপালের গানের গলাটাও ভারি মিষ্টি। আমাকে গান শুনিয়ে মন কেড়ে নিল। জিগ্যেস করলুম, 'বাছা তোমার নাম কী?' বলল, 'ব্রজগোপাল।' 'তোমার দেশ কোথায় বাবা!' তা দেশের নাম বলল। দেশ হল, বর্ধমান জেলার অম্বিকা কালনায়। আমি জিজ্ঞেস করলুম, 'হ্যারে, তুই কালনার ভট্চাজদের চিনিস?' বলল, 'চিনব না? আমি তাদের ছোট তরফের ছেলে। বাবার নাম নিত্যগোপাল।' আমি থ। অম্বিকা-কালনা হল আমার বাপের বাড়ি। আর নিত্যগোপাল হল আমার খুড়তুতো ভাই। তা হলে ব্রজগোপাল হল সম্পর্কে আমার ভাইপো! আমি ওকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললুম, বাছা তুই হলি আমার ভাইপো! আমি তোর পিসিমা! তা তোর এমন অবস্থা হল কেন বাছা? ব্রজ বলিল, 'ওলাউঠা রোগে মা-বাবা দুজনেই মারা গেছে। অনাথ ছেলে পেয়ে শরিকেরা সম্পত্তি কেড়ে নিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছে।' ছেলেটার তাতে কোনও ক্ষোভ নেই। ওর কোনও অভিযোগ নেই, ও কীর্তনের দলে ঢুকে গান গেয়ে বেড়ায়। সারা বাংলা মুলুক ওর চেনা। প্রতি বর্ষার আগে আসে। মাস দেড়-দুই থাকে। আবার বেরিয়ে যায়। আমি ওকে ধরে রাখতে চেয়েছিলাম। কিন্তু ও কিছুতেই কোন বাঁধন মানে না। তবে আমাকে 'মা' বলে ডাকে। ভক্তি করে। ভট্চায উপাধিটা ত্যাগ করে ব্রহ্মচারী হয়েছে। গত বছর আসতে পারেনি, এবার এল একেবারে বছর দুইয়ের মাথায়। ছেলেটার বড় মায়ায় পড়েছি রে।'

দাক্ষায়নীর মুখ থেকে সব ঘটনা শুনে বাতাসির ভারি অবাক লাগল। তার মন উচাটন হল। এরকম বাউণ্ডুলে মানুষের কথা সে নিজের পিসি দামিনীর মুখে বহুবার শুনেছে। সেও এমনি দেশে দেশে ঘুরে বেড়াত। তারপর ঘুরতে ঘুরতেই সে একদিন হারিয়ে গেল। বাতাসির এতদিনের নিস্তরঙ্গ জীবনে ঢেউ জাগল। আবার মন উচাটন হল।

এদিকে বদ্রীদাসের জীবনেও এসেছে প্রচণ্ড তরঙ্গ চাঞ্চল্য। তার মনেও এখন ঘোরতর অশান্তি। আড়তে আগুন লাগার পর থেকে বদ্রী বুঝেছে যে, সর্বভুকের কাছে সব কিছুই তুচ্ছ, অসহায়। তার সব সঞ্চয় এক মুহূর্তে পুড়ে ছাই হয়ে যেতে পারে। তিল তিল করে আজ যা সে জমিয়েছে, এই বছর পনেরোর সঞ্চয় ছাই হয়ে যেতে খুব একটা সময় লাগবে না। এই সর্বনাশা ভয়ংকরের হাত থেকে বাঁচবার উপায় কী? কীভাবে সে আগুনের হাত থেকে রেহাই পাবে?

হুঁকাবরদার নন্দলাল টিকের আগুন ধরাতে ধরাতে বলেছিল, 'কর্তা অত ক্ষেপে ওঠেন কেন? আগে বোঝবার চেষ্টা করেন আগুন জিনিসটা কী! ওটা কি জঙ্গলের বাঘ, নাজলের কুমির? আগুন কি ওনাদের মত আপনাকে দেখলেই তেড়ে আসবে? উনি হলেন দ্যাবতা। এই দ্যাবতাকে ঠিক মতো শুদ্ধাচারে ব্যবহার করতে হবে। আচারের গলতি হলেই দ্যাবতার রাগ। গলতি। গোলমাল। অগ্নিকাণ্ড। আর শত্রুতা করে যদি কেউ আপনার ভিটেতে আগুন লাগিয়ে দেয়, আলাদা কথা। তা ছাড়া আপনার ব্যাপারেও আগুনের দোষ নাই। দোষ আপনার। আপনার কর্মচারী আপনার দোকানের মাল চুরি করে সটকে পড়বার আগে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। তবে হ্যাঁ, আপনার আগুনে আরও পাঁচজনের সর্বনাশ হয়েছে। তেনাদের কোনও দোষ ছিল না। দোষ ধরতে গেলে, আপনারই ছিল।'

'ওমা, আমার কোনও দোষ ছিল নাকি? আমার সর্বনাশ করেছে ঐ শয়তান ফাগুলালটা। দোষ যদি কেউ করে থাকে, তাহলে সে করেছে। আমার কোনও দোষ নেই।' এই কথাগুলি প্রায় চীৎকার করে বলেছিল বদ্রীদাস।

নন্দলাল কলকের ওপর জ্বলন্ত টিকে সাবধানে বসাতে বসাতে বলেছিল, 'উঁহু, দোষ আপনারই। ষোলো আনার ওপর আঠারো আনা। একটা লোভি আর অসৎ লোককে ভার দিয়েছিলেন আপনি ব্যবসার। মাল বেচা-কেনার। লোক চিনতে পারেননি। এই লোক চিনতে না-পারার খেসারত আপনাকে দিতে হবে বৈকি! এই দ্যাখেন না কেন, আমার জীবনটা। এমন বিয়ে করলাম যে, বিয়ের পর ঘরছাড়া। বউটা এমনি দজ্জাল যে, এই গোঁফ-ওয়ালা নন্দলালকে বিন্দুমাত্র ভয় খায় না! বরং আমিই ভড়কে যাই! তা বিবেচনা করুন, এ দোষের খেসারত যদি কারোকে দিতে হয়, আমাকেই দিতে হবে। আর কারোকে না।'

হুঁকাবরদার নন্দ এরপর হাতে ধরিয়ে দিয়েছিল সদ্য সাজানো হুঁকো। মৃদু

মৃদু হেসেছিল সে। কৌতুকের হাসি।

বদ্রীদাস সে হাসিতে যোগ দিতে পারেনি বটে, কিন্তু নন্দের কথায় যুক্তি খুঁজে পেয়েছিল। তার মনে হয়েছিল নন্দ ঠিকই বলেছে। আগুন থেকে বাঁচতে হলে, আগুনের সাবধানে ব্যবহার দরকার। আর দরকার জীবনে চলার পথে খাঁটি মানুষ খুঁজে বের করা।

সুতানুটিতে টিকে থাকতে হলে এই দুটি সত্যকে নির্মমভাবে ধরে থাকতে হবে। একটু এদিক-ওদিক হলেই খেসারত দিতে হবে।

আগুন লাগার ঘটনা কেবল যে বদ্রীদাসের মনে আতঙ্ক সঞ্চার করল, তা নয়—এ আতঙ্ক সংক্রামক অসুখের মতো কোনও কোনও ফিরিঙ্গি সাহেবের মনেও ভয় জাগাল। বদ্রীদাসের মতন সাহেবরা কাছাখোলা নয়। এক কথা দশবার ভাবে না। যা ভাবে, তার তড়িঘড়ি সিদ্ধান্ত নেয়। কোনও কোনও ফিরিঙ্গি সাহেবের মনে হল আগুন থেকে বাঁচতে হলে গোলা-পাতা বা ছনের ছাউনি দেওয়া ঘর এখনই পরিত্যাগ করা উচিত। সুতানুটির উপনিবেশে আগুনের হাত থেকে রেহাই পেতে হলে পাকা ইমারত দরকার। কোনও কোনও ফিরিঙ্গি-সাহেব ইমারত তৈরির সিদ্ধান্ত সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে নিলেন। এঁরা চার্ণককেও সেইরকম পরামর্শ দিলেন। চার্ণক সাহেব বলল, 'কার জায়গায় বাড়ি করব? দুদিন বাদেই যদি নবাবের ফৌজদার এসে এই নয়া উপনিবেশ থেকে তাড়িয়ে দেয়, তখন কী হবে? কোম্পানির টাকা এতই সস্তা নাকি?'

কোনও কোনও সাহেব ভ্রূ কুঞ্চিত করে বললেন, 'তা বলে ঐ আগুলি হাটগুলোতে আপনি থাকবেন? আর চোখের সামনে আমাদের সেটেল্‌মেণ্ট পুড়ে যেতে দেখবেন?'

'দেখব! আর যেদিন এখানে বাড়ি তৈরির শাহি ফরমান পাব, সেইদিন পাকা ইমারত তৈরি করব। তার আগে নয়।'

তা চার্ণকের কথা শোনে কে? অনেক ফিরিঙ্গি সাহেব পাকা বাড়ি তৈরিতে নেমে পড়লেন। এক টাকা খরচ করলে সুতানুটিতে পাওয়া যায় দু'হাজার ইট। চার ঢেপুয়ায় মিলে যায় দেড় মণ চুন। কাঠের কোনও দর নেই। পয়সা লাগে না। গোবিন্দপুরের কোলে যে জঙ্গল, সেই জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে আনতে পারলেই হল। মিস্তিরির মজুরি দৈনিক দেড় থেকে দুই ঢেপুয়া। জোগাড়েদের মজুরি আরও কম। দেড়-দু'হাজার টাকা খরচ করতে পারলে খাসা একটি বাড়ি হয়ে যায়। আর পকেটে যখন সঙ্গতি রয়েছে, তখন না করাটাই বোকামি।

ফিরিঙ্গি সাহেবদের কান্ড-কারখানা দেখে বদ্রীদাস ঠিক করল যে, সেও একটা পাকা ইমারত করবে। এমনভাবে ইমারত তৈরি করবে যা তাকে আগুনের ভয় থেকে বাঁচাবে। আগুন কারোকে সমীহ করে না। কারোকে খাতির করে না। জলের কুমির আর জঙ্গলের বাঘের থেকেও সে ভয়ংকর।

'ইমারত ?—মানে পাকা বাড়ি ?'—বদ্রীদাসের দিকে তাকিয়ে রাগে গরগর করতে থাকলেন দাক্ষায়নী। 'তুই কি ফিরিঙ্গি সাহেব হয়েছিস—না বড়লোক হয়েছিস্ ? এ কুবুদ্ধি তার মাথায় দিল কে ? দেড়-দু'ছরের ছেলে কোলে আমি রাঁঢ় হয়েছি, এই জঙ্গলে বসে তোকে আমি সেই থেকে মানুষ করেছি, ঝড়-ঝাপটা কাকে বলে আমি জানি। দু'পয়সা হাতে জমিয়েই ভাবছিস্ ইমারত করব ; খুব বড় লোক হয়েছিস্ না ?' দাক্ষায়নীর কণ্ঠস্বরে ঝাঁঝ।

'বড় লোক হওয়ার ব্যাপার নয়। এখানে থাকতে হলে ইটের বাড়ি চাই ; হোগ্লার ছাউনি চলবে না ।' মিন্মিন করে বলল বদ্রীদাস।

'তোর এ বাড়ি ভোগ করবে কে, তার কথা ভেবেছিস্ ? আগে বে-থা কর, ছেলেপুলে হোক, তারপর বাড়ি করিস্। এখন নয়।'

মায়ের এমন প্রতিরোধ বদ্রী কখনও দেখেনি। মায়ের এই মূর্তির সঙ্গে সে পরিচিতও নয়। তাই বদ্রী বেশ খানিকটা অবাক হল। ঘাবড়ে গেল। তবে পিছু হটল না। আহ্নিক সেরে নীরবে সে রাতের খাবার খেয়ে নিল। রাতের খাওয়া-দাওয়া সেরে ঘুমোতে যাওয়ার আগে তামাক খাওয়া বদ্রীদাসের অনেকদিনের অভ্যাস। আজও সে দাওয়ায় মাদুর পেতে তাকিয়া ঠেস দিয়ে তামাক খেতে বসল। সুতানুটির আকাশ অন্ধকার। আকাশে অবিরাম মেঘেদের আনাগোনা। গাছে গাছে জোনাকি। আসন্ন বৃষ্টির ইশারা দিচ্ছে। হুঁকোতে মৃদু মৃদু টান দিতে দিতে বদ্রী কেবল মায়ের কথাই চিন্তা করতে থাকল। মা কী চায় ? বাড়ি তৈরিতে মা এতখানি বাধা দিচ্ছে কেন ? কেন এত ঝাঁঝ ?

ব্রজদুলাল পাশে এসে বসল।

'কী দাদা, তোমার বেজায় গোঁসা হয়েছে মনে হচ্ছে! তুমি মায়ের ওপর রাগ করেছ ?'

বদ্রীদাস ফোঁস করে উঠল, 'রাগ করব না ? হঠাৎ আগুনের থেকে বাঁচতে হলে একটা পাকা বাড়ি তৈরি করা এখনই দরকার নয় কি ?'

'তা বাড়ি না হয় তৈরি করলে, থাকবে কে ?'

'কেন, আমরা থাকব। আমাদের নিজেদের থাকবার জন্যই এ ব্যবস্থা। আর কারোর জন্যে নয়।'

'তা তুমি কি বে-থা করবে না ?'

'বে-থা ?—বে-থার সঙ্গে এই বাড়ি তৈরির যোগ কী ?' অবাক হল বদ্রীদাস।

'আছে গো, যোগ আছে, নাহলে কথাটা কি আমি শুধুশুধু বলছি !'

'তা বিয়েতে রাজি হলেই, মা আমাকে বাড়ি তৈরি করতে দেবে ?'

'দেবে গো, দেবে।'

অন্ধকার নিবিড় থেকে নিবিড়তর হচ্ছে। গাছপালাগুলি অন্ধকারের ভেতর আরও নিবিড় অন্ধকার। দূরের জঙ্গলে শেয়াল ডেকে উঠল। চাঁপা গাছের মাথায়

ঝট্‌পট করে উঠল রাতচরা পাখি। গাছে গাছে দপ্‌ দপ্‌ করছে জোনাকি। বদ্রীদাসের কাছে সুতানটির এই অন্ধকার রাত্রি অপরিচিত নয়। এই অন্ধকার রাত্রি সে দেখতে ভালবাসে। সুতানুটির এই রহস্যময় রাত্রি তাকে টানে। মুগ্ধ করে। থেলো হুঁকোতে বার কয়েক ঘন ঘন টান দিল বদ্রীদাস।

'বিয়ে করতে আমি না হয় রাজী হলাম, পাত্রী কোথায়? মনের মতো পাত্রী আছে?' পাত্রীর কথাটা এভাবে বদ্রী হয়ত বলত না। কিন্তু এই মুহূর্তে তার নন্দলালের কথা মনে পড়ে গেল। ঠিক মতো বউ না হলে সারা জীবন খেসারত দিতে হবে! মেয়েছেলের ব্যাপার-স্যাপারে কোনও দিনই তার উৎসাহ নেই। কোনও ঔৎসুক্যও নেই! কোনদিন সে এক ঢোক মদ খায়নি। তওফাওয়ালিদের আসরেও কখন সে যায়নি। কোন মেয়েকে সে কখনও কাছে টানতে চেষ্টা করেনি। তাই বিয়ে করাটা যে জরুরি, বদ্রীদাস কখনও ভাবেনি। অথচ আজ সে পাকা ও অভিজ্ঞ লোকেদের মতন বলে বসল, মনের মতো পাত্রী চাই! বলার সঙ্গে সঙ্গে বদ্রীদাস অবশ্য নিজেকে জিজ্ঞাসা করল, মনের মতো পাত্রী কাকে বলে তা কি জানো নাকি, হে বদ্রীদাস!

ব্রজগোপাল ফিস্‌ ফিস্‌ করে বলল: 'মনের মত পাত্রী আছে। মা সে পাত্রী ঠিক করে ফেলেছেন। এখন তুমি রাজী হলেই হয়।'

'পাত্রী ঠিক হয়ে গেছে?' হা হা করে হেসে উঠল বদ্রীদাস। দূরের জঙ্গলে শোনা গেল শেয়ালের কলরোল। 'তা পাত্রীটি কে ব্রজগোপাল? নিশ্চয় তুমিই ঠিক করেছ, সন্ধান নিয়ে এসেছ? নইলে মা কোথায় আর খবর পাবে?'

ব্রজগোপাল রসিকতা করল, 'মনের মানুষকে কি বাইরে খুঁজতে হয়? সে মানুষ মনেই থাকে। কাছেই থাকে। কেবল চিনে নিতে হয়। তা মা আমার মনের মতন বৌটিকে চিনে নিয়েছেন। বলতে পার চিনে ফেলেছেন। তুমি এখন সম্মতি দিলেই হয়। পাত্রীটি হল, তোমাদের বাতাসি।' ব্রজগোপাল গুন গুন করে গান ধরল, 'মনের মানুষ মনেই আছে, বৃথা কর অন্বেষণ।'

'বাতাসি!' বদ্রীদাস স্বগতোক্তির মতো বলে উঠল। তার চোখের সামনে সেই বৃষ্টিঝরা ভাদুরে রাত্তিরের ছবিটা ভেসে উঠল। সেই আবুইঝুটি বৃষ্টি। নিবিড় অন্ধকার। জঙ্গলের পাতায় বৃষ্টির চটরপটর শব্দ। পিছল পথ। হাটখোলার ঘাটে ফিরে এসেছে ফিরিঙ্গি সাহেবরা। খুশিতে ডগমগ হয়ে বাড়ি ফিরে এল বদ্রীদাস। রাতের অন্ধকারে হাতড়াতে হাতড়াতে। নিরালোক, নিঝুম বাড়ি। ডগমগ হয়ে বদ্রীদাস মাকে ডাকছে, মা-মা! মায়ের তখন অবস্থা খারাপ। সাড়াশব্দ নেই। ধুম জ্বর। একটি মেয়ে দরজার কাছে নিঃশব্দে এগিয়ে এল। ম্লান দীপালোকে বদ্রী দেখল একটি মিষ্টি মুখ। কী মায়াবি মুখ! অপ্রত্যাশিত চমক। কে তুমি? আমি বাতাসি। বাইরে বাতাস হা-হা করে উঠল। তুমুল বৃষ্টি। বদ্রী শুনল, 'আমি দাসী!' ছোট্ট একটি শব্দ। ছোট্ট একটু ভুল। ভুল, কিন্তু কী মিষ্টি!

অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে হুঁকোতে আরও কয়েকবার টান দিল বদ্রী। এই একটি মেয়ে যার নামে কিছু মন্তব্য করা কঠিন। কিন্তু এ মেয়েটিকে বদ্রীদাস বিয়ে করবার জন্য খুঁজে আনেনি। মা দাক্ষায়নীও তাকে আনেননি পুত্রবধূ করবার জন্য। ফাগুলাল সম্ভবত মেয়েটাকে ফুসলে বের করে এনেছিল। তা সে কিছু করতে পারেনি। ইচ্ছে থাকলেও মেয়েটার ধর্ম নাশ করতে সে সুযোগ পায়নি। সেই মেয়েকে বিয়ে?

আরও কয়েকবার হুঁকোতে টান দিল বদ্রী। বদ্রীদাস এখনও খাঁটি বামুন। আহ্নিক না-করে জল খায় না। কপালে ত্রিপুণ্ড্রক আঁকে। গমগমিয়ে স্তব-স্তোত্র পাঠ করে প্রতিদিন। ত্রিশূলে সিঁদুর পরায়। হাট সুতানুটিতে ইদানীং জাত-ধর্ম নেই! জাত-ধর্ম রাখবার জন্যে লোকের তেমন চেষ্টাও নেই। অথচ এই ব্রাহ্মণত্বই বদ্রীদাসের গর্ব। দেমাক। ফিরিঙ্গিদের সঙ্গে ওঠা-বসা করলেও সে এখনও খাঁটি বামুন।

'কই গো দাদা, রা কাড়ছ না কেন? বাতাসিকে কি মনে ধরছে না?' ব্রজগোপাল খোঁচা দিল।

'মেয়েটা ভাল। অনেক গুণ রয়েছে।' আরেকবার হুঁকোতে টান দিল বদ্রীদাস, 'কিন্তু মেয়েটার বংশ-পরিচয় জানো কি? যদি বংশাবলী জোগাড় করতে পার, যদি কুলে কলঙ্ক না থাকে, তাহলে বাতাসির কথা ভাবা যেতে পারে! তাছাড়া মেয়েটা আমাদের বাড়িতে রয়েছে, সেটাও যেন কেমন লাগে।'

রাত গভীর হল। নিশীথ রাতের সেই ঠান্ডা বাতাসটা উঠল। ব্রজ গুন্ গুন্ করে গান ধরল, 'মহাজন ঘরে, চোর চুরি করে, কিনারা কী হয় দেখি।'

কাঁচাগাদির ঘাট হয়ে ছোট একটা নৌকো করে খাঁড়ির ভিতর ঢুকল ভাঁড়ু। গতকাল শেষরাতে ভাঁড়ুর জালে নানারকম মাছ উঠেছিল। সেই মাছ কটা হাটখোলায় গিয়ে বিক্রি করে ভাল দাম পেয়েছে সে! এখন তার ট্যাঁক ভর্তি। টেঁপুয়া আর কড়িতে ভরা। মন খুশি। তবে মন খুশির আরও একটা কারণ আছে। কাঁচাগাদি ঢোকবার মুখে এক ভাঁড় ধেনো মদ সে খেয়ে নিয়েছে। মন এখন আনন্দে সাঁতার কাটছে। গলায় গান আসছে। হেঁড়ে গলায় একটা গানও ধরল। গানটি তার বড় প্রিয়, 'মাগো, মা—দে মা আমার বিয়ে/কালীঘাট দেখে এলাম ল্যাজ কাটা মেয়ে। / পায়ে গোদ চোখে ছানি, / মাথাতে ওল কামানি—/মন ভোলালে মনসাকানি / এক চোখে চেয়ে।'

ধর্মতলার জঙ্গলের দিকে নৌকোটা যত এগোয়, ততই তার হেঁড়ে গলা চড়ায় ওঠে। চৌরঙ্গির ঘাটে এসে নৌকো যখন সে থামাল তখন ভাঁড়ু গানে বিভোর। চিৎকার করে সে বলে চলেছে, 'মা গো মা, দে মা আমার বিয়ে—'

পাড়ের ওপরেই একটা খাটিয়ার ওপর বসেছিল ফাগুলাল। বর্ষা পড়া থেকে তার শরীর ভাল নেই। মন মেজাজও খিট্‌খিটে। ভাঁড়ুর হেঁড়ে গলার গান শুনে

তার চোখ মুখ কুঞ্চিত হল। বিরক্তিতে সারা গা রি রি করে উঠল।

'কী খবর ভাঁড়ু। সকাল থেকেই তোমার মেজাজ এমন শরিফ হল কেমন করে?'

'সবই ট্যাঁকের কল্যাণ ভাই!' ভাঁড়ু ট্যাঁকটা বাজিয়ে দেখাল। 'আমার ট্যাঁক ভর্তি থাকলেই আমি খুশি। আর খুশি হলেই আমার গলায় গান আসে।' কথা বলবার সঙ্গে সঙ্গে ভক্‌ভক করে উঠল মদের গন্ধ।

'তা টাকা কোথায় পেলে? নিশ্চয় সুতানুটিতে মাছ বেচতে গিয়েছিলে?'

'হ্যাঁ ভাই! এক ঝাঁকা ইলিশ ছিল। বেচে নগদ আট গণ্ডা পয়সা পেয়েছি। এক ট্যাঁক টেঁপুয়া। আর এক মুঠো কড়ি।'

'তা সুতানুটির অবস্থা কেমন? হালচাল কেমন দেখলে? তোমাকে বলেছিলাম না, যখনই ওখানে যাবে, পাঁচরকম খবর নিয়ে আসবে!'

ভাঁড়ু হাই তুলল। লম্বা হাই। শেষ রাত্তিরটা ঘুম হয়নি। মাছের পিছনে খরচ করতে হয়েছে। চোখ দুটোও ঘুমে জড়িয়ে আসছে! বলল, 'সুতানুটির খবর সেই একই রকম ভাই! সাদা সাহেবে জায়গাটা দিনে দিনে ভরে উঠছে। তোমাদের হিল সাহেবকে দেখলাম এক দঙ্গল সেপাই নিয়ে একটা উঁচু ডাঙ্গায় হা-ডুডু খেলছে।'

'আমার বাবুর কোনও খবর পেলি?'

'তোমার বাবু মানে, হালদার মশাই!—হ্যাঁ, তেনার বাড়িতে তো শেষের এক জোড়া দিয়ে এলাম। তা লোক খাসা বাপু! সঙ্গে সঙ্গে দাম মিটিয়ে দিয়েছেন! শুনলাম নাকি ওনার দালান কোটা হবে। মিস্তিরিদের সঙ্গে কথা বলেছিলেন।'

'ও বাড়িতে একটা মেয়ে থাকে, তাকে দেখলি নে? আমার দেশের মেয়ে। আমি এনে দিয়েছিলাম।'

'দেখেছি হয় তো। মনে করতে পারছি না। শুনলাম, হালদার মহাশয়ের বিয়েও লাগছে নাকি শিগগিরি!'

'কোথায় হচ্ছে জানিস?'

'তাতো খবর নিইনি ভাই!'

ফাগুলাল অধৈর্য হয়ে উঠল। কেননা, ভাঁড়ুকে সে অনেকবার শিখিয়ে রেখেছে। ও বাড়ির খবর যা শুনবে, যা জানবে, তা যেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে আসে। এই খাপছাড়া খবর শুনলে তার মেজাজ টং হয়ে যায়। আগেকার দিন হলে ফাগুলাল প্রলয়কাণ্ড করত। ভাঁড়ুকে ধরে ঠাস্‌ ঠাস্‌ করে চড়িয়ে দিতে দ্বিধা করত না। এখন সে অসহায়। সুতানুটিতে যেতে সে ভরসা পায় না। চাবুকের ব্যথা মরেছে, ঘা শুকিয়েছে বটে, কিন্তু ভেতরের জ্বালা কমেনি। বদ্রীদাসের আড়ত থেকে সে আগেই মালপত্র ঝেড়ে দিয়ে মোটা টাকা সরিয়ে ফেলেছিল। বাবু খবরাখবর নিচ্ছিলেন না। সুতরাং কাজটা সে ধীরে ধীরেই করেছিল। কিন্তু

গোল বেধে শেষ সিন্দুকটা নিয়ে গেল আগুনে লাগিয়ে দিল। আর লাগিয়ে দেবার পরেই ধরা পড়ে গেল। নইলে সে শেষ কাজটাও করত। বাতাসিকে আবার ফুসলিয়ে নিয়ে কেটে পড়ত। এবার ট্যাকে টাকা ছিল। সুতরাং বাতাসি আর ফসকাত না।

নয়নতারা উবু হয়ে মুখ নিচু করে কাঠের উনুন ধরাবার চেষ্টা করছিল। ফুঁ দিচ্ছিল কাঠের উনুনে। চোখ দুটো লাল।

'শুনেছ, আমার বাবুর বিয়ে লেগে গেল! ভাঁড়ু এইমাত্র খবর নিয়ে এসেছে।'

ফুঁ থামিয়ে নয়নতারা উঠে বসল। সকৌতুকে বলল, 'এতদিনে ঐ ধুমসো মিনসেটার কপালে তাহলে প্রজাপতি বসল! তা মিনসেটার কপালে কেমন মাগী জুটল গা? তোমার সেই বাতাসী মাগী নয়ত? তা মাগীটা যা ছেনালি জানে, হতেও পারে। হ্যাঁ গা, খবর পেলে নাকি?'

'খবর আর কী পাব? ঐ ভাঁড়ুকে জিজ্ঞাসা করে দেখ না!'

ভাঁড়ু তখন একটা দড়ির খাটিয়ায় নিজেকে এলিয়ে দিয়ে গান ধরেছে, 'মা গো, দেমা আমার বিয়ে—'। মুখে মদের গন্ধ। নয়নতারা খানিকটা এগিয়ে গিয়ে পিছিয়ে এল। ভাঁড়ু তখন একেবারে বেসামাল। পরনের কাপড়ের ঠিক নেই। নয়নতারা বলল, 'এ মিনসেটা যে একেবারে নেশায় ভোঁ। কিছুই জানা যাবে না এর মুখ থেকে। তুমি বরং একবার গা ঢাকা দিয়ে সুতানুটি চলে যাও। খবরাখবর নিয়ে এস।'

নয়নতারার এ প্রস্তাবে খেঁকিয়ে উঠল ফাগুলাল। বলল: 'বেশ বলেছ আর কি। গিয়ে ধরা পড়ি। সাহেব আমাকে আর আস্ত রাখবে না। বন্দুকের কুঁদো দিয়ে মাথা ফাটিয়ে জলে ফেলে দেবে, একটা গুলি খরচও করবে না! বরং তুমিই যাও না মেছুনি সেজে। এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরি করে পাকা খবরটা নিয়ে এস!'

চোখ দুটো বড় হয়ে গেল নয়নতারার। ছলছলিয়ে উঠল চোখ দুটো, 'হ্যাঁগা, তুমি এমন কথা বলতে পারলে! তোমাদের ঐ আলুস সাহেব আমাকে ধরবার জন্য সারা সুতানুটি চুঁড়ে বেড়াচ্ছে। ফৌজ বসিয়ে দিয়েছে জঙ্গলের ভেতর! গেলেই আমাকে ক্যাঁক করে ধরবে! তারপর কী করবে, তা তুমি জান। আমাকে ছিঁড়ে খুঁড়ে খাবে। তুমি কি তা চাও!' কথা বলতে বলতে ফোঁস ফোঁস করে খানিকটা কেঁদেই ফেলল নয়নতারা! কাঁদলে নয়নতারাকে কেমন অসহায় দেখতে লাগে। তখন ওর ওপর ভারি মায়া হয়। এই মায়াটাই ফাগুলালের সর্বনাশ করেছে। এই মায়ার জন্যেই নয়নতারার সঙ্গে সে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছে। এর ওপর আছে নয়নতারার এই তরতাজা ডবকা যৌবন! নয়নতারার এ যৌবন যেন কাঁঠালের মতো চিটচিটে। ঐ চিটচিটে আঠায় যে একবার আটকে গেছে, সে আর কখনও বেরুতে পারবে না। নয়নতারার একটা বিয়ে হয়েছিল। কিছুদিন বরের কাছেও ছিল সে।

কিন্তু বরটা তাকে একদিন ছেড়ে পালিয়ে গেল। কেন পালাল কে জানে? সে কি নয়নতারার এই যৌবনের স্বাদ নেয়নি? নাকি নয়নতারার এই যৌবনের ভয়েই পালিয়ে গেল! ফাগ্‌লালের কাছে এটা একটা রীতিমত রহস্য! এ রহস্য মীমাংসার জন্যে ফাগ্‌লাল কৌশলে কথা বের করবার চেষ্টা করেছে নয়নতারার কাছ থেকে। নয়নতারা কবুল করেনি। তার পেট থেকে একটি কথাও বের করা যায়নি। বলেছে, 'সে সোয়ামির মাথায় ঝাড়ু। লোকটা ছিল হেঁপো কেসো। না ছিল গতর, না ক্ষ্যামতা। কেবল জ্বল জ্বল করে আমাকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখত। আর গায়ে হাত বুলুত। হাতের চেটোগুলো ছিল গরম। সে হাত গায়ে লাগলে আমার ভয় ভয় করত, মনে হত ভূতের হাত। আমি একদিন রেগেমেগে বলেছিলাম, তোমার ঐ হাতের গরম কাটাও, তারপর গায়ে হাত দিও। নইলে নয়। লোকটা আমার ধমক খেয়ে হঠাৎ একদিন কেটে পড়ল। আর আসেনি।'

নয়নতারার স্বামী তাকে ফেলে রেখে কাটতে পেরেছিল। প্রকৃত স্বামী হয়ে সে লোকটি যা পেরেছিল, নকল স্বামী হয়ে ফাগ্‌লাল তা পারছে না। চেষ্টা করেও পারছে না। নয়নতারাকে ভেতরে ভেতরে ফাগ্‌লাল ভীষণ অপছন্দ করে, তবু নয়নতারার আকর্ষণ তার জীবনে দুর্বার। ফিরিঙ্গিদের চাবুক খেয়ে ফাগ্‌লাল ভেবেছিল যে, সে কালীঘাটের দিকে চলে যাবে। সেখানে গা-ঢাকা দিয়ে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেবে। কিন্তু কোনওরকমেই তা সে পারল না। মায়াবি নয়নতারা তাকে ঠিক টেনে আনল ভাঁড়ুর কাছে। এখানে আর কোনও লুকোছাপা নেই। এখানে একটা ঘরে দু-জনে স্বামী-স্ত্রীর মতো থাকে। এক হেঁসেলে খায়। এক বিছানায় শোয়। এক সঙ্গে ঘুমোয়। ঘরের কোনে রাত্তির বেলা একটা মোমবাতি জ্বালিয়ে রাখে। কেননা, এই জঙ্গলের দেশে অন্ধকার ঘরে ঘুমোতে ফাগ্‌লালের ভয় ভয় লাগে।

এক একদিন রাতে ফাগ্‌লালের হঠাৎ হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায়। খুব কাছ থেকে যেন শেয়াল ডেকে ওঠে। মাঝে মাঝে দূর জঙ্গলে শোনা যায় বাঘের গর্জন। উঃ, সে কী ভয়ংকর! কী আতঙ্কজনক! ফাগ্‌লালের আর ঘুম আসে না। সে নিজের ভাগ্যের কথা চিন্তা করে। নয়নতারার ভেতর কিন্তু এ সব কোনও চিন্তা নেই। সে নিশ্চিন্ত হয়ে ভোঁস্ ভোঁস্ করে ঘুমোয়। তার গায়ের কাপড় সরে যায় খেয়াল থাকে না। তার যৌবনের ঐশ্বর্যগুলি মোমবাতির ক্ষীণ আলোতে দপ্ দপ্ করে। পাশবিক ক্রূরতায় কোনও কোনদিন ফাগ্‌লাল ঘুমন্ত নয়নতারার কাপড় কেড়ে নিয়ে পরিপূর্ণ নগ্ন করে দেয়। ঘুমন্ত নয়নতারার মধ্যে সে খোঁজে সেই চিট্‌চিটে কাঁঠালের আঠাটা। সেটা কোন্‌খানে! আর কী এমন সে আঠা, যা সে ছাড়িয়ে কিছুতেই বেরিয়ে আসতে পারছে না।

ফাগ্‌লালের জীবনের সঙ্গে নয়নতারা এখন সেঁটে গেছে। নয়নতারাকে ফেলে রেখে কেটে পড়ার চিন্তা ফাগ্‌লাল আর করে না। কিন্তু বাতাসির কথা ভাবলেই

সে বেসামাল হয়ে যায়। বাতাসি হল তার প্রথম ভালবাসা। গাছ থেকে তোলা প্রথম ফুল। সুতানুটির নতুন বসতিতে বাতাসিকে সে পীরপুকুর থেকে এনেছিল নিজের সুখের জন্য, অপর কারো ভোগের জন্য নয়। পাকেচক্রে সে বাতাসি হাত ছাড়া। বাতাসি সুতানুটিতে বসত করছে, ফাগুলাল কিন্তু সুতানুটি ছাড়া, তার বসত সেখানে হল না। এইরকম পাঁচ-সাত ভাবতে ভাবতে ফাগুলালের কপালের শিরা ফুলে ওঠে। দপ্ দপ্ করে। আর মনে মনে সংকল্প করে, যে ভাবেই হোক বাতাসিকে নিশ্চিন্ত আরামে থাকতে সে দেবে না। তার সর্বনাশ করতেই হবে। এখন সর্বনাশের প্রথম ধাপ্‌টা হল, বদ্রীদাসের বাড়ি থেকে বাতাসিকে বের করে দেওয়া। কিন্তু সেটা কীভাবে হবে? কেমন করে? ফাগুলাল চিন্তা করতে থাকল।

নয়নতারারও সেই একই মত। ও ছেনালটার দেমাক ভাঙতে হবে। ওর সতীপনা ঘোচাতে হবে। আলুস সাহেব যদি ওকে তুলে নিয়ে গিয়ে ছিঁড়েখুঁড়ে খায়, তাহলে নয়নতারার থেকে সুখী এ পৃথিবীতে আর কেউ হবে না। বদ্রীদাসের পাকা দালান হচ্ছে। সেখানে ও আবাগী রানি হয়ে বসবে? নয়নতারার ছটফটানি বেড়ে যাচ্ছে।

দিন তিনেক পরে কালীঘাটের দিকে গেল ফাগুলাল। গোবিন্দপুরের জঙ্গলের ভেতর দিয়ে যে খাঁড়িটা বরাবর কালীঘাটে আদি গঙ্গায় মিশেছে, সেই খাঁড়ি দিয়ে চলে গেল। সকালে গেল। ফিরে এল শেষ দুপুরে। ফিরে এসে ধপাস করে নিজের খাটিয়ায় বসে পড়ল।

'হ্যাঁ গো, অমন ধপাস্ করে বসে পড়লে কেন? খবর সুবিধে নয় মনে হচ্ছে।' ফাগুলাল ফ্যাসফেঁসে গলায় বলল, 'ঠিকই বলেছ। খবর সুবিধের নয়। দুঃসংবাদ। আমার বাবুর পাকা দালান হচ্ছে, বিয়ে হচ্ছে—এসব খবর পাকা। কোনও ভুলচুক নেই। আর বাবুর যে মেয়েটির সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে, সে যে বাতাসি, সে খবরও পাকা।'

'বলো কী!' গালে হাত দিয়ে নয়নতারাও বসে পড়ল, 'ও ছেনালটা এভাবে জিতে যাবে? রানি হবে?'

ফাগুলাল ওপরের দিকে হাত তুলে দিয়ে বলল, 'ভগবান যদি চায়, তাহলে তাই হবে। তবে শুনেছি আমার বাবুর মনে এখনও একটু খট্‌কা আছে। উনি বাতাসির বংশ-পরিচয় জানতে চান। খোঁজ-খবর নিচ্ছেন। দেখি, সেদিক থেকে কিছু করা যায় কিনা। তাহলে হাটের মাঝেই হাঁড়ি ভাঙা যাবে।'

এক মাসের কড়ারে থাকতে এসেছিল ব্রজগোপাল। দেখতে দেখতে তিনমাস পেরিয়ে গেল। আসন্ন বর্ষার মেঘ মাথায় করে সে বাড়ি ঢুকেছিল। দেখতে দেখতে বর্ষা কেটে গেল। মেঘ সরে গেল। শরৎকাল এসে গেল। সুতানুটিতে এখন শরৎকাল। নিচু জায়গাগুলি এখন জলে টই-টম্বুর। পদ্মদিঘিতে অজস্র পদ্ম ফুটেছে। পোড়ো জমিতে ফুটেছে রাশি রাশি কাশফুল। বাড়ির সামনের শিউলি

গাছে এসেছে অজস্র শিউলি। সুতানুটির এই চেহারা ব্রজগোপাল বিস্ময়ভরে তাকিয়ে দেখে। সুতানুটির চেহারা দিনে দিনে বদলে যাচ্ছে। এইভাবে যদি বদলাতে থাকে, তাহলে অল্পদিনেই এক নতুন বসত বড় বড় গাঁ-গঞ্জের সঙ্গে টেক্কা দেবে। একথা ভাবতে ব্রজগোপালের ভাল লাগে।

তবে বর্ষার সময়টা সুতানুটি সুখের নয়। নোনা জলে সকলেরই অল্প-বিস্তর অসুখ। সকলেই কাহিল হয়ে পড়ে। তবু দেশি লোকেরা কোনও রকমে টিকে থাকে, কিন্তু বিদেশি ফিরিঙ্গিগুলো একেবারেই কাঁচা। টপ্‌টপ্‌ মরছে। শোনা গেল, চার্ণক সাহেবের বিবির নাকি বড় অসুখ। সুতানুটির নোনা লেগেছে তেনার শরীরে। টেকেন কিনা সন্দেহ।

ব্রজগোপালও কাহিল। তবে এ সবের ব্যাপারে ব্রজগোপালের টোটকা আছে। কালমেঘ আর নিমপাতার রস সে নিয়মিত খায়। খাওয়া-দাওয়া সম্পর্কে ভারি সতর্ক। বদ্রীদাসের মতন একেবারেই সে ভোজন রসিক নয়। বরং একেবারে বিপরীত। না-খেলে সে ভাল থাকে। উপবাসেই তার আনন্দ। মা দাক্ষায়নীর সঙ্গে সে নিয়মিত একাদশী করে। করে অমাবস্যা আর পূর্ণিমার নিশিপালন। এতদ্‌সত্ত্বেও ব্রজগোপাল কিঞ্চিৎ কাহিল। গা ঢিস্‌ ঢিস্‌! খিদে কম। তা শরীর কাবু হোক, মনটা তার চরিত্রের মতোই নির্মল আছে।

এদিকে বর্ষা শেষ হতে-না-হতে তেড়েফুঁড়ে শুরু হয়ে গেছে বদ্রীদাসের দালান তৈরির কাজ। দিন-রাত্তির লোক খাটছে। খট্‌খট্‌ গম্‌গম্‌ শব্দে লোকের কানে তালা লাগার মতন অবস্থা। চারদিকে অব্যবস্থা। এই অব্যবস্থার মধ্যে যে পরিবর্তনটা হয়েছে, তাহল বদ্রীদাসের খাওয়া দাওয়া আর জোব চার্ণকের কোম্পানিতে যাওয়ার সময় পরিবর্তন। সকালের পুজো-পাট সেরে সামান্য একটু জল-খাবার মুখে গুঁজে চলে যেতে হয় কোম্পানির সেরেস্তায়। দুপুরে আবার আসতে হয় ভাত খাওয়ার জন্য। ব্রজগোপাল আর বদ্রীদাস একসঙ্গে বসে খাওয়া-দাওয়া করে। খাবার পরিবেশন করে বাতাসি। আর মা দাক্ষায়নী চৌকির ওপর বসে তদারকী করেন।

খেতে বসলেই ব্রজগোপালের যত গল্প। নানা গ্রাম-গঞ্জের গল্প। নানা চরিত্রের মানুষের কথা। মুঘল-পাঠানদের লড়াই। অলৌকিক কাহিনী। কিছুই বাদ যায় না। ব্রজগোপালের কথকতায় বাঁধুনি আছে। বদ্রীদাসের মতন নিরস লোকও ব্রজর কথায় ঘায়েল হয়ে যায়। বাতাসির মতো নীরব ও লাজুক মেয়েও উৎসুক হয়ে জিজ্ঞাসা করে, 'তারপর কী হল, গোঁসাই?'

ব্রজগোপাল এ বাড়িতে আসার কিছুদিনের ভেতরেই বাতাসির কাছে গোঁসাই হয়েছে। দাক্ষায়নী তাঁর স্নেহের ব্রজগোপালকে বাতাসির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে এক সময় বলেছিলেন, 'দ্যাখ্‌তো ব্রজ, এ মেয়েটার নামটা যেন কেমন-কেমন। ডেকে সুখ পাই না। ঠাকুর-দেবতার নাম হলে কেমন হত বল দেখি।'

'ঠাকুর-দেবতার নাম! একগাল হেসেছিল ব্রজ। 'ঠাকুর-দেবতার নাম তোমার মেয়েকেও মানাবে না মা!' ও যে তোমার শ্রীরাধা ঠাকুরাণী। রাইকিশোরী। বদ্রীদাদাকে সংসারী করবে। তুমি ওকে 'রাধা' বলে ডাকতে পার। আমি ডাকব 'রাই' বলে। এরপর গুন্‌গুন্‌ করে গান ধরেছিল,

শুন গো মরম, সই!
যখন আমার জনম হইল,
নয়ন মুদিয়া রই।

রাই কিশোরী! চমকে উঠেছিল বাতাসি! শৈশবের একটি বিস্মৃত চরিত্র হঠাৎ ঝিলিক দিয়ে উঠেছিল তার ভেতরে। একটি হারানো মানুষের গলার স্বর বাতাসিকে উচাটন করে তুলল। মুহূর্তের জন্য বাতাসি নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু চকিতে সে নিজেকে সামলে নিয়ে একটা কথা বলে ফেলেছিল। বলেছিল, 'মা, তাহলে আপনার এই ছেলেকে কিন্তু আমি, 'গোঁসাই' বলে ডাকব, দাদা বলব না।'

'ঠিক বলেছ মা! ব্রজর মুখের মতো জবাব হয়েছে। তুমি ওকে গোঁসাই বলেই ডেক।' সেই থেকে ব্রজগোপাল ব্রহ্মচারী গোঁসাই হয়েছে বাতাসির কাছে। আর বাতাসি হয়েছে ব্রজর কাছে 'রাধা' বা 'রাই'।

বড় বড় গরাস করে মুখে ভাত তুলছিল বদ্রীদাস। বর্ষার পর তার একটু খিদে বেড়েছে। তার ওপর সকালবেলা খাটুনিটাও আজকাল কম হয় না।

ব্রজগোপালের স্বভাবটা ঠিক বিপরীত। খিদে কম। আর মুখে খাবার তোলে ছোট ছোট গরাসে। ওই গরাস তোলার ফাঁকে ফাঁকেই যত গল্প। খাবার সময় একটা হাত-পাখা নিয়ে মাছি তাড়ায় বাতাসি। মাছি তাড়াতে তাড়াতে গল্প শোনে। ব্রজগোপাল বলছিল তার বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা।

'সেবার গিয়েছি এক অজ পাড়া গাঁয়ে। গাঁয়ের মাঝখানে একটা পুকুর। পুকুরের চার পাড় তালগাছে ঘেরা। তাই পুকুরের নাম তালপুকুর। পুকুরের চার পাড়েই হিন্দুদের বাস। পুরুষানুক্রমেই চলে আসছে। তা কিছুটা দূরেই থাকে ক'ঘর মুসলমান। মুসলমানরাও নিজের নিজের নিয়েই থাকে। নিজেদের পরিধির বাইরে হিন্দুরাও যায় না, যায় না মুসলমানরাও। তাই কখনও কোনও গোল বাধেনি। মোটামুটি সব শান্তিতেই ছিল। পুকুরের একদিকে ছিল বিরাট এক হিন্দু পণ্ডিতের টোল। টুলো পণ্ডিতমশাইয়ের যেমন পাণ্ডিত্য ছিল, তেমনি দাপটেরও কিছু কমতি ছিল না। কিন্তু লোকটা বে-থা করেনি। সংসারি নয়। তার ওপর বাউণ্ডুলে। মাঝে মাঝেই বেরিয়ে পড়ত দেশ-দেশান্তরে তীর্থ করতে। চলে যেত মথুরা-বৃন্দাবন। উনি যখন চলে যেতেন, তখন ওঁর যজমান আর টুলো ছাত্ররা বাড়িটা দেখাশোনা করত। এরকমই বরাবরই চলে আসছিল, কিন্তু গোল বাধল সেবার, যখন উনি মাস ছয়েকের মতো নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন। ছ'মাস পরে

নিজের ভিটেয় ফিরে এসে দেখেন যে, তাঁর গোটা ভিটেটা উধাও। একেবারে ভোজবাজির মতো অদৃশ্য হয়ে গেছে। ভিটের বদলে সেখানে তৈরি হয়েছে শৌখিন বাগান।

বদ্রীদাস খাওয়া থামিয়ে বলল, 'মামদোবাজি নাকি? এরকম ঘটনা বাপু আমাদের সুতানটিতে কখনও হয় না। আজ পর্যন্ত হয়নি। হবেও না।'

বাতাসি উৎসুক হয়ে বলল, 'তারপর? তারপর কী হল গোঁসাই।'

'ভিটের ঐ অবস্থা দেখে টুলো-পণ্ডিতের মাথায় রক্ত চড়ে গেল। পুকুরের ওপারেই ছিল ওঁর যজমানের বাড়ি। ওখানে গিয়ে তিনি উঠলেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'আমার ভিটেটাকে কে এভাবে বে-দখল করল হে?' যজমান বলল, 'ঠাকুরমশাই এ এক বেয়াদপ যবনের কাণ্ড। যবনটার নাম আক্রাম খাঁ। লোকটা যেমন দাঙ্গাবাজ তেমনি উদ্ধত। তলে তলে ওর ফৌজদার আর ডিহিদারদের সঙ্গে যোগসাজস আছে। ভিটের আশা ত্যাগ করুন ঠাকুর। ওই দাঙ্গাবাজদের সঙ্গে কি আপনি পারেন?' বামুনঠাকুর ফোঁস করে উঠলেন। বললেন, 'আমাকে তোমরা নপুংসক ভাবছ নাকি হে? ওই 'অনডডান'টাকে আমি উপযুক্ত শিক্ষা দেব। তা বামুন ঠাকুরের এলেম ছিল। নবাব শায়েস্তা খাঁর সেরেস্তায় ওনার আদর ছিল পণ্ডিত আর বড় জ্যোতিষী বলে। বামুন ঠাকুর সেখানে গিয়ে ফরিয়াদ জানালেন। ব্যস, ফরিয়াদ পেশ করবার সঙ্গে সঙ্গে কাজ শুরু হয়ে গেল। কেল্লা ফতে। ফৌজদারের লোকেরা এসে বেঁধে নিয়ে গেল আক্রামকে। তবে এই বাঁধাবাঁধির খবরটা আগাম পেয়ে গিয়েছিল আক্রাম। তাই সে যাবার আগে ঠাকুর মশায়ের যজমানের বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিল।'

'কী ভয়ঙ্কর!' ককিয়ে উঠল বদ্রীদাস। বদ্রীদাসের দিকে না তাকিয়ে ব্রজগোপাল বলতে লাগল, 'এখানেই এ ঘটনার শেষ নয়, দাদা। অত চমকে উঠ না। ব্রাহ্মণের তেজ যে ওই দাঙ্গাবাজ আক্রাম খাঁয়ের থেকেও কতখানি ভয়ঙ্কর হতে পারে, সেটা এবার শোনো। নবাবের সেরেস্তা থেকে ঠাকুর যখন নিজের গাঁয়ে ফিরে এলেন, তখন সন্ধ্যার আঁধার নেমেছে। অন্ধকার হাতড়াতে হাতড়াতে তিনি এসে দাঁড়ালেন তালপুকুরের পাড়ে। এসে দেখলেন, তাঁর যজমানের বাড়ি দাউ দাউ করে জ্বলছে। দুশমনকে জব্দ করতে গিয়ে তাঁর প্রিয়জনের যে এমন ক্ষতি হবে, তা তিনি আশঙ্কা করেননি। তিনি আর দাঁড়ালেন না। নিজের ভিটের দিকে তাকিয়ে তিনি কেবল একটু দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তারপর চলে গেলেন নিরুদ্দেশ হয়ে।'

'তা হলে তোমার ঠাকুরের হার হল? তিনি নিজের যজমানের ওই ক্ষতি আর সর্বনাশ মেনে নিলেন?'

'তা মেনে নিলেন। তবে হার-জিতের ব্যাপারটা টের পাওয়া গেল আরও কিছুদিন পরে। মাস ছয়েক পরে আক্রাম খাঁ দেশে ফিরে এল বটে, কিন্তু ঠাকুরের ভিটেয় ঢুকতে হল না। ঢোকার আগে রক্তবমি করে মারা গেল। আক্রামের

ছেলেগুলোও পট্‌ পট্‌ করে মরতে থাকল। গোটা মুসলমান পাড়ায় ছড়িয়ে পড়ল আতঙ্ক। সবাই দৌড়ে এল ঠাকুরের যজমানের কাছে। নিজেরা গাঁটের পয়সা খরচ করে যজমানের বাড়ি বানিয়ে দিল। আর ঠাকুরের ভিটেতে মুসলমানরাই বানিয়ে দিল এক মন্দির। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের দীর্ঘশ্বাস কি চাট্টিখানি কথা!'

বদ্রীদাস বলল, 'তুমি আমাকে একবার সেখানে নিয়ে যেতে পারবে? আমি যাব।'

বাতাসি এই কাহিনী চোখ বড় বড় করে গিলছিল। ব্রজগোপালের দিকে স্থির দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে বলল, 'আমি এ ঘটনার কথা জানি। তবে শেষটা নয় প্রথমটা।'

'জানো?' কৌতুক বোধ করল ব্রজগোপাল, 'তা বলো ত গ্রামের নাম কী?'

'গ্রামের নাম তালসোনাপুর। নদীয়া জেলায় এ গ্রাম। ওখানেই আমাদের সাত পুরুষের ভিটে। আর ওই যে ব্রাহ্মণ ঠাকুরের কথা বললেন, ওঁর নাম কুলদাচরণ। শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ। কুলিন। সাত পুরুষের টোল ছিল ও বাড়িতে।'

কথাগুলি এক নিঃশ্বাসে বলে গেল বাতাসি। যেন বহুদিনের মুখস্থ করা কথা। বলবার সময় তার চোখ দুটি উৎসাহে ঝলমল করতে থাকল। বাতাসির এমন সজীব সতেজ মূর্তি এ বাড়িতে কেউ দেখেনি। বদ্রীদাস এবং দাক্ষায়নী দু'জনেই অবাক হয়ে দেখতে থাকলেন বাতাসিকে।

ব্রজগোপাল তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে বাতাসির দিকে তাকিয়ে বলল: 'ঠাকুর কুলদাচরণ আপনার কে হন?'

'আমার বাবা'।' বাতাসির চোখ দুটি ছলছলিয়ে উঠল, 'উনি গ্রাম তালসোনাপুর থেকে বেরিয়ে পড়েছিলেন তীর্থযাত্রায়। বহু তীর্থ ঘুরে শেষ বয়সে এসেছিলেন গঙ্গাসাগরে। গঙ্গাসাগর থেকে ফেরার পথে আমার পিসিমার বাড়িতে ওঠেন। পিসিমা বাবাকে আটকে দেন, সংসারি করেন। আর তার পরেই আমার জন্ম।'

'জয় শ্রীরাধা! জয় রাধা বল্লভ!' হুঙ্কার ছাড়ল ব্রজগোপাল। খাওয়ার পর দাওয়ায় বসে গান ধরল, 'মনের মানুষ মনেই আছে, বৃথা কর অন্বেষণ!'

তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে তামাক খেতে খেতে বদ্রীদাস বলল, 'মেয়েটা যে বড় ঘরের মেয়ে, তা চোখ-মুখ দেখলেই বোঝা যায়। কিন্তু এমনই আমাদের চোখের ভ্রম, চিনতে পারিনি। ঠাকুর কুলদাচরণের যে কাহিনী তুমি আমাকে শোনালে, এ কাহিনী না জানলে মেয়েটার ওপর আমরা অবিচার করতাম হে। অত বড় পুণ্যবান মানুষ ছিলেন ঠাকুর কুলদাচরণ, আর তাঁর মেয়েকে দিয়ে কিনা আমি ঘরের কাজ করিয়েছি! বাসন মাজিয়েছি। রান্না করিয়েছি। বড় আফশোস্‌ হচ্ছে হে!' বদ্রীদাস আরও কয়েকবার হুঁকোতে টান দিল।

'তা আফশোস্‌ করে আর কী করবে গো দাদা! বিয়েটা করে ফেলে প্রায়শ্চিত্ত

করে ফেল।' ব্রজ টিপ্‌পনি কাটল।

বদ্রীদাস তেমন একটা ঘোর-প্যাঁচের মানুষ নয়। বরং তাকে সাদাসিধে চরিত্রের মানুষই বলা যায়। ভারি কথা বা জ্ঞানের কথা সে সহজে মাথায় নিতে চায় না, কিন্তু নিলে তা সহজে ছাড়তেও পারে না। সেই ভারি কথাটা তার মাথাকে ভার করে রেখে দেয়। থেকে থেকে তার মনের ভেতর বুড়বুড়ি কাটে। কুলদাপ্রসাদের অলৌকিক জীবন বদ্রীর মাথায় চাপ হয়ে বসে রইল।

কোম্পানির সেরেস্তায় বসেও একথা থেকে থেকে মনে পড়ে যায়। শীত আসন্ন। সুতানুটির চেহারা বদলাতে আরম্ভ করেছে। বর্ষার পর হাট আবার জমকিয়ে উঠেছে। গঙ্গার বুকে বড় বড় জাহাজ এসে লাগছে। বিলেতের বাজার থেকে মাল আসছে হাজার হাজার টাকার। আবার হাটখোলার বাজার থেকেও মাল বোঝাই হচ্ছে জাহাজে। তার দামও হাজার হাজার টাকার। এইভাবে মাল দেওয়া-নেওয়া নিয়ে লাখ লাখ টাকা, কোটি কোটি টাকার ব্যবসা চলেছে। অনেক রকমের সাহেবও আসছে। এইসব সাহেবদের থাকবার জন্য চার্ণক সাহেব তৈরি করে দিয়েছে চারটে 'ডিক্‌চুয়ানিং হাউস।' সাহেবদের সরাইখানা। জন ছিল এই সরাইখানা চালবার লাইসেন্স চেয়েছিল। চার্ণক তা দেয়নি। দেওয়া হয়েছে আরেক সাহেবকে। বছরে পঞ্চাশ টাকা খাজনা। আর লাভ হাজার হাজার টাকার। চার্ণক সাহেব বলেছিল, 'বদ্‌লিদাস, তুমি এই হৌস্‌ চালাইতে ইচ্ছুক হও, তোমাকে লাইসেন্স দিব। লইবে? বদ্রী বিনয়ের সঙ্গে সাহেবের এই দাক্ষিণ্য প্রত্যাখ্যান করে বলেছে, 'না সাহেব। একজন ব্রাহ্মণ হয়ে এ হৌস চালাতে পারব না। তোমাদের খানা আমার লোক পাকাতে পারবে না।' কেবল খানা নয়, ওই হেসৌ অটেল 'পিনার'ও ব্যবস্থা আছে। সে সব রাখা কি তার পক্ষে সম্ভব?

গঙ্গার জল বেশ খানিকটা নীচে নেমে গেছে। বেশি নৌকোগুলি নীচেই বাঁধা হচ্ছে। নৌকো থেকে নেমে খাড়াই পাড় বেয়ে উঠে আসছে মহাজনেরা।

নদীয়া থেকে একজন মহাজন এসেছেন। বিপদতারণ রক্ষিত। বয়স্ক লোক। মাথায় পাগড়ি। নৌকো ভরে এনেছেন ভাল মিছরি আর বাছাই গোলমরিচ। কিছু চন্দনকাঠও সঙ্গে আছে। লোকটি এর আগেও কয়েকবার এসেছেন। এঁকে বিশ্বস্ত বলেই মনে করে বদ্রী।

'আপনার নিবাস কোন খানে রক্ষিত মশাই?'

'আজ্ঞে নবদ্বীপের কাছে—অগ্রদ্বীপে।'

'আপনারা গ্রাম তালসোনাপুরের নাম শুনেছেন?'

'শুনিনি আবার?'

'শুনেছেন? তা জায়গাটা কোথায়?'

'আমাদের অগ্রদ্বীপ থেকে ক্রোশ তিনেক উত্তরে। এটা কেশবপুর পরগণার ভেতর।'

'তাহলেও অনেক জানেন আপনি দেখছি। গ্রাম তালসোনাপুরের ঠাকুর কুলদাপ্রসাদের নাম নিশ্চয় শুনেছেন ?'

বদ্রীদাসের প্রশ্নটা শুনে বিপদতারণ রক্ষিত একটু গদ গদ হয়ে গেলেন। চোখ বুজে হাত তুলে রক্ষিতমশাই ঠাকুরের উদ্দেশ্যে প্রণাম করে বললেন, 'তিনি মহাপুরুষ, তাঁর কথা কে না জানে ? তিনি সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী। অকৃতদার।'

'না. মশাই অকৃতদার তিনি হবেন কেন ? শেষ জীবনে ভগ্নীর কাছে গিয়ে তিনি বিবাহ করেছিলেন। তাঁর একটি কন্যাও হয়। তার নাম বাতাসি। সেই বাতাসির সঙ্গে তো আসছে মাসে আমার বিবাহ। আমার গৃহনির্মাণ চলছে, গৃহপ্রবেশ হলেই শুভকাজ।'

রক্ষিত মহাশয়ের মুখের চেহারাটা কেমন যেন বদলে গেল। তিনি কেমন যেন অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে বলেন ঃ 'ঠাকুর কুলদাচরণ আবার বিবাহ করেছিলেন নাকি! কই শুনিনি তো, তা আপনি যখন তাঁর মেয়েকে বিবাহ করছেন, আরও বেশি খবর রাখেন। আমরা জানি না।'

সুতানুটির আকাশে ক'দিন ধরেই মেঘের আনাগোনা চলছে। কোণে কোণে মেঘ জমছে। বদ্রীদাসের মনের আকাশেও কিঞ্চিৎ মেঘ জমল।

ব্রজগোপালকে গানে পেয়েছে। গুন্ গুন্ করে সে একটার পর একটা গান গেয়ে চলেছে। তার মনে বেশ ফুর্তি এসেছে বলে মনে হয়। দাক্ষায়নী ঘরের ভেতর চৌকিতে শুয়ে ঝিমোচ্ছেন। অল্প অল্প শীত। গায়ে একটা পশমি চাদর টেনে দিয়ে এসেছে বাতাসি। চাঁপা গাছের মাথায় কয়েকটা শালিক ঝগড়া বাধিয়েছে। চলছে তাদের কিচিরমিচির। এই সময় হাট সুতানুটিও কেমন যেন ঝিমিয়ে রয়েছে। ঈষৎ পশ্চিমে ঢলে পড়েছে সূর্য।

'অ গোঁসাই তোমার কাছে একটা জায়গার হদিশ চাইব। দিতে পারবে ?'

গান থামিয়ে ব্রজ বলল, 'কোন্ জায়গা গো রাই কিশোরী!' এ দেশের সব জায়গায় তো আমার জানা। জানলে হদিশ দিতে পারব না?'

ভয়ে ভয়ে বাতাসি বলল, 'তুমি হাতিদহের নাম শুনেছ ? এই গ্রাম সুতানুটি থেকে জায়গাটা নাকি বেশি দূরে নয়।'

'হাতিদহ ? ব্রজগোপাল ভ্রু দুটি ঈষৎ কুঞ্চিত করল। তারপর হঠাৎ দৃঢ়কণ্ঠে বলল, 'চিনি। কিন্তু এখন তো বাপু জায়গাটার নাম বদল হয়েছে।'

'তুমি হাতিদহ চেন, গোঁসাই! তুমি ওখানে গেছ নিশ্চয়।'

'গেছি। বহুবার গেছি। গতবার গান গেয়ে এসেছি।'

'তাহলে তুমি ওখানকার ঘোষালদের বাড়িঘর চেন নিশ্চয়! ওদের লোকজনকেও চেন।'

'চিনি। ঘোষালদের ছোট তরফ্ বড় তরফ—সবাইকে চিনি।'

'চেন ?' বাতাসি কেমন যেন উত্তেজিত হয়ে পড়ল। বাতাসি নিজেও বুঝতে

পারল তার উত্তেজনা। তার বুকের ভেতর দাপাদাপি সে স্পষ্ট অনুভব করতে পারছিল। 'আমাকে হাতিদহের সেই ঘোষালবাড়ি একবার নিয়ে যাবে গোঁসাই? আমি একবারটির জন্য সেখানে যেতে চাই।'

'সেখানে গিয়ে কী করবে রাইকিশোরী? ঘোষালবাড়ি হল আমার মামার বাড়ি। ওখানকার সব খবর আমি জানি। তুমি কী জানতে চাও বল। আমি জেনে দেব। আর যদি কারও সঙ্গে দেখা করতে চাও, তাকে গিয়ে ধরে আনব। তোমাকে ওখানে যেতেই হবে না।'

'ও বাড়ির একজন—ঠিক তোমার মতো যাত্রার দলে গান গেয়ে বেড়াত, তাকে চেন?'

'উঁহু, ঠিক বললে না রাই। একজন নয়, অন্তত জনা পাঁচেক ও বাড়ি থেকে যাত্রায় নাম লিখিয়েছিল।'

উদ্‌বেগ বাড়ছে। উদ্‌বেগ সারা শরীরটাকে ধরে ঝাঁকাচ্ছে। তীরের কাছে নৌকো প্রায় এসে গেছে। কিন্তু ঢেউগুলি বারবার সে নৌকোকে ঠেলে দিচ্ছে নদীর দিকে। দক্ষ মাঝি নৌকো ভেড়াচ্ছে তীরে। ঢেউগুলি কাটিয়ে কাটিয়ে সে ঠিক তীরে নিয়ে আসবে।

'বিষ্টু অধিকারী বলে কেষ্টঠাকুর সাজত যে ছেলেটি, তাকে চেন তুমি?'

'তা আর চিনব না? সনাতনদা। সনাতন ঘোষাল। ভারি মিষ্টি গলা ছিল তাঁর। অধিকারীর দলটাও ওঁর জন্য জাকিয়ে উঠেছিল। নইলে বিষ্টু অধিকারীর দলকে কে পুঁছত। সনাতনদা ছিলেন আমার থেকে তিন বছরের বড়। ভারি সত্যবাদী আর সৎ প্রকৃতির লোক ছিলেন তিনি।'

ফুঁসে উঠল বাতাসি, 'সত্যবাদী না হাতি! আমার পিসিমাকে উনি কথা দিয়েছিলেন,—বর্ষার আগে যাবেন। কই, আজও যাননি তো।'

'তার আর যাবার উপায় নেই রাই। কথা দিয়ে থাকলে সে নিশ্চয় যেত।'

এরপর ব্রজগোপাল যা বলল, তা এইরকম : আট দশ বছর আগে কিংবা আরও বছর দুই আগে বিষ্টু অধিকারীর দল 'কৃষ্ণযাত্রা'র পালা নিয়ে গিয়েছিল বহরমপুরে খাঁ বাবুদের বাড়ি। বর্ষার আগে বিষ্ণু অধিকারীর এটাই ছিল শেষ গান। তিন রাত্তির গান হয়েছিল। আর ভালই হয়েছিল সে গান। খাঁ বাবুরা অধিকারীকে দিয়েছিলেনও প্রচুর। কিন্তু শেষ রাত্তিরে যখন সবাই ঘুমে অচেতন, হঠাৎ ডাকাত পড়ল খাঁ বাবুদের বাড়ি। নর পিশাচের দল সব বাড়িটাকে তচনচ করল। শেষে বাড়ির একটা নতুন বৌকে ওরা টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছিল। সে দৃশ্য দেখে সনাতনদা আর স্থির থাকতে পারলেন না। ঝাঁপিয়ে পড়লেন ডাকাতদের ওপর। তা শেষ পর্যন্ত বৌটা বাঁচল বটে। কিন্তু দাদা বাঁচলেন না। ডাকাতের দল দাদা সনাতন ঘোষালকে খুন করে দিয়ে গেল।'

'খুন!' কাঁরিয়ে উঠল বাতাসি। 'গোঁসাই? তুমি ঠিক বলছ, তিনি খুন

হয়ে গেছেন? দীপ নিবে যাবার মতন বাতাসি কেমন যেন নিষ্প্রভ হয়ে পড়ল।

'হ্যাঁ, ঠিক জানি। শুধু দাদা নন, বিষ্টু অধিকারীও খুন হয়ে গেল। তারপরেই দল উঠে গেল।

ব্যাথাটা কোথায় ব্রজগোপাল ঠিক ধরতে পারেনি। কিন্তু সে চোখের ওপর দেখল বাতাসির দু'চোখ ভরে টলটলিয়ে উঠল জল। আরও পরে দু'চোখ ঝাপসা করে দিয়ে হু হু করে বান ডাকার মতন নেমে এল জলের ধারা। সনাতন ঘোষাল বলতেন, আমার কোনও কুলে কাঁদবার জন্য কেউ নেই। তাহলে এ মেয়েটা কাঁদে কেন? এ কি কোনও কুলের নয়? বিষয়টা ব্রজর কাছে রীতিমত রহস্যময় হয়ে উঠল। বাতাসি দু'হাতে মুখ চাপা দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে ঘরে চলে গেল। ব্রজ নিথর। তার গলার গান হারিয়ে গেল।

সুতানুটির আকাশে মেঘ জমছে। শীতের মুখে মেঘ? এত মেঘ কোথা থেকে আসে কে জানে?

সব মেঘে বৃষ্টি হয় না। কিন্তু ব্যাপারিরা তা বোঝে না। তারা পাওনা-গণ্ডা বুঝে বাড়ি ফেরার জন্য উন্মুখ। ভয় হঠাৎ যদি বাদল নামে। ক'দিন হল চার্ণক সাহেব আড়তে বসছে না। বিবির অসুখ বেড়েছে। চন্দ্রশেখর কবিরাজ বসে আছে নাড়ি ধরে। ঘণ্টায় ঘণ্টায় বদল হচ্ছে দাওয়াই। কিন্তু রোগের উপশম নেই। চার্ণক সাহেব কুঠির প্রাঙ্গণে অবিরাম পায়চারি করছে। বড় চিন্তা। মাঝে মাঝে সুতানুটির গাছপালা আকাশ ইত্যাদির দিকে তাকিয়ে দেখছে। আর থেকে থেকে উদবিগ্ন হয়ে দৌড়ে যাচ্ছে বিবির রোগশয্যার পাশে। কারোকেই ছাড়তে চাইছে না চার্ণক। না সুতানুটি, না বিবি। সাহেবের মানসিক অবস্থা বিধ্বস্ত, বিপর্যস্ত। সুতরাং নিমতলার আড়তে বসে বাধ্য হয়েই ব্যাপারিদের ঠেকা দিতে হচ্ছে বদ্রীদাসকে। কেনা-কাটার জন্যে কোম্পানির আলাদা লোক আছে। ওসব ঝামেলা তার নয়। সুতরাং সে সব কিছু না। এ কেবল দর-দস্তুর কেমন যাচ্ছে, কোন্ মাল কোথায় কতখানি পাওয়া যাবে, এইসব বৃত্তান্ত খাতায় লিখে রাখা।

লোকটা নিমতলার ওপাশে উঁচু হয়ে বসে আছে। পাকা একঘণ্টা। অপেক্ষা করছে। শিকারি বেড়ালের মতো। সাধারণ ব্যাপারি বলে মনে হয় না। লোকটার একজোড়া গোঁফ আছে। গোঁফের দু'পাশ সরু। ছুঁচাল। থেকে থেকে গোঁফে লোকটা তা দিচ্ছে। গোঁফে তা দেবার সময় তার প্রতীক্ষার অসহিষ্ণুতা বোঝা যায়। লোকটা চালাক, তবে ধৈর্য কম।

একে একে ব্যাপারিরা বিদায় নেওয়ার পর লোকটা এগিয়ে এল। পাকা অভিনেতার মতো কাছে এসে দাঁড়াল।

'আমি কোনও মহাজন নই বাবুমশায়। আমি এসেছি আপনার কাছে একটা ব্যক্তিগত কাজে।'

'বলুন আপনার কী কাজ? আপনার দেশ কোথায়? নাম কী আপনার?'

সৌজন্য দেখাল বদ্রীদাস।

লোকটি ঘাড় চুলকে নিয়ে বলল, 'আজ্ঞে আমাকে চিনতে আপনার অসুবিধে হবে না। আমি হলাম বাতাসির বাবা।'

'বাতাসির বাবা?' লোকটির দিকে তাকিয়ে মজা পেল বদ্রীদাস।—'বাতাসির বাবার নাম কি?'

'আমার নাম নেতাইচরণ। বাড়ি আমার পীরপুকুর। আমার বোনের নাম দামিনী।'

'বটে? তা আপনি কী চান?'

'আমার মেয়েকে ফেরত চাই বাবুমশায়। ব্যাটা ফাগুলাল ওকে ফুসলে বের করে নিয়ে এসেছে। আমার কুলে কলঙ্ক দিয়েছে।'

'মেয়েকে ফেরত নিয়ে গিয়ে কী করবেন?'

'বিয়ে দোব। আর কীর করব? আর কী করার আছে বলুন।'

'পাত্র ঠিক আছে? বিয়ে দেবার টাকা আছে? তার ওপর বিয়ে দেবার ব্যাপারে কলঙ্কিনী মেয়ের কেচ্ছা বাধা হবে না?'

লোকটা ঘাড় নেড়ে বলল, 'না'—সংক্ষিপ্ত কিন্তু স্পষ্ট। নেতাইচরণ নির্বিকার। মানুষ যে কত সহজে মিথ্যে কথা বলতে পারে, তা চোখের ওপর দেখে বদ্রীদাস যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না। তাই সে অবাক হল লোকটির দুঃসাহস দেখে। কেবল অবাক হওয়া নয়, ভেতর ভেতরে উত্তেজনাও বোধ করতে থাকল বদ্রী। কেননা, ওই লোকটার পিছনে একটি ষড়যন্ত্রের ছক সে হঠাৎ আবিষ্কার করল। স্পষ্ট বোঝা গেল লোকটাকে—অর্থাৎ নেতাইচরণকে কেউ শিখিয়ে-পড়িয়ে এখানে পাঠিয়েছে। যে শিখিয়ে-পড়িয়ে পাঠিয়েছে, সে বাতাসিকে দখল পেতে চায়। সে লোকটা কে? বদ্রীদাস সেটাও বুঝতে পারল। ওই পিছনের লোকটা ফাগুলাল ছাড়া আর কেউ নয়। তারই শেখানো বুলি হুড় হুড় করে বলে গেল।

'তা বাবা নেতাইচরণ, তোমার হাতে বাতাসিকে তো দিতে পারব না। বাতাসির বাবাকে আমি জানি। সে তো তুমি নও।'

'মাইরি; সে লোকটাই আমি। বাতাসির কি দুটো বাবা হয়?'

বদ্রীদাস ধমক দিয়ে বলল, 'খবরদার, খারাপ কথা বলবে না। তোমাকে আমি এখনই জন হিলের থানাতে চালান দিচ্ছি। হিল সাহেবের চাবুক পিঠে পড়লেই হুড় হুড় করে সত্যি কথা বেরিয়ে আসবে।' কথা বলা শেষ করেই সেপাই ডাকতে খিদমতগারকে ইশারা করল বদ্রী।

কিন্তু তার আগেই ভোজবাজির মতো একটা ঘটনা ঘটে গেল। লোকটা মুহূর্তমাত্র দেরি না করে দৌড়ে নেমে গেল গঙ্গার গাবায়। তারপর সেখান থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ল গঙ্গার জলে। ঠাণ্ডা জল। বাতাসে শীতলতা। লোকটা প্রাণের দায়ে

কিছুই যেন পরোয়া করল না। হায়রে, ছিলের নামের কী জাদু!

সুতানুটির আকাশে মেঘ জমেছে। মেঘ জমেছে বদ্রীদাসের মনেও। মেয়েদের সম্পর্কে বদ্রীদাসের কখনও কোনও আকর্ষণ নেই। মেয়ের দেহের রহস্য সম্পর্কে যে একেবারেই কৌতূহলী নয়। ভালবাসার ব্যাপার সম্পর্কেও তার তেমন কোনও সূক্ষ্ম অনুভূতি নেই। বিবাহের জন্য বদ্রী কেবল ভাল বংশের একটি মেয়ে চায়। শুধু ভাল বংশ। সু-সন্তানের মা হবার মতন সে একটি পতিব্রতা ভক্তিমতী স্ত্রী চায়। এর বেশি কিছু নয়। কিন্তু বাতাসি কি সেই মেয়ে? ঠাকুর কুলদাপ্রাসাদের মেয়ে জেনে বাতাসির ওপর তার একটু শ্রদ্ধাবোধ জেগেছিল। কিন্তু অগ্রদ্বীপের বিপদতারণ রক্ষিতের কথায় বাতাসি সম্পর্কে তার কেন যেন এক সংশয় দেখা দিচ্ছে। তাছাড়া বাতাসির ওপর ফাগুলালেরই এত ঝোঁক কেন? নোংরা জায়গায় মাছি বসে। মেয়েটার ভেতর নিশ্চয় কিছু গোলমাল আছে, নাইলে চারদিক থেকে তাকে ঘিরে এমন বদমাসগুলো ফোঁস্ ফোঁস্ করে কেন?

বদ্রীদাসের মনে একটা ধন্দ ঢুকে গেল। কাঠের ভেতর যেন ঘুণ পোকা। কেমন যেন একটা সন্দেহ। এই অস্বস্তিকর সন্দেহটা বেচারি বদ্রীকে কুরেকুরে খেতে থাকল। তার বিশ্বাসে ঘুন ধরল।

গঙ্গার ওপর জাহাজের ভোঁ বেজে উঠল। দীর্ঘ প্রলম্বিত ভোঁ।

আকাশে মেঘ জমেছে। তাহলে কি সত্যি বৃষ্টি হবে? গাছ-গাছালির ভেতর দিয়ে শীতের হাওয়া বইছে। বেশ ঠাণ্ডা হাওয়া।

বদ্রীদাস বাড়ির পথে পা বাড়াল।

।। নয় ।।

যা আশঙ্কা করা গিয়েছিল, শেষ পর্যন্ত তা বাস্তবে পরিণত হল।

সুতানুটি কলকাতার আকাশে এক সর্বনাশা দুর্যোগ ঘন হয়ে নামল। শীতের মাঝখানে এমন প্রলয় কাণ্ড কখনও দেখা যায়নি। যে ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘগুলি এলোমেলো ঘুরে বেড়াচ্ছিল, তারা হঠাৎ এক হয়ে বিশাল এক দৈত্যের মতো তামাম আকাশটাকে গিলে ফেলল। দিনের বেলাতেও আকাশ নিশ্ছিদ্র কালো। থেকে থেকে বুক কাঁপানো গর্জন। আর বিদ্যুতের ঝিলিক। গোবিন্দপুর আর চৌরঙ্গির জঙ্গলে কড়কড় করে বেশ কয়েকটা বাজ পড়ল। হাট সুতানুটি কেঁপে উঠল ভূমিকম্পে।

আরম্ভটা এইভাবেই হয়েছিল। অনেকটা কালবৈশাখীর ঘরানায়। কিন্তু

কয়েক ঘন্টার ব্যবধানে দৈত্যের চেহারা বদল হতে দেরি হল না। কেননা, তারা বহুরূপী। কালো মেঘ সরিয়ে দিয়ে দক্ষিণের সমুদ্র থেকে আসতে থাকল অজস্র জলভরা সাদা মেঘ। তাদের সাথী হয়ে এল দস্যুর মতো ঝড়। উঃ! সে কী প্রচণ্ড ঝড়! ঝড়ের সঙ্গে বৃষ্টি। বৃষ্টি আর ঝড়ে কাঁপিয়ে দিতে থাকল নদীতীরের এই ছোট্ট গ্রামগুলি। মাঝে মাঝে শিলাবৃষ্টি হল। ঝড়ের দাপটে রাশি রাশি গাছ ভূমি শয্যা নিল। বদ্রীদাসের বাড়ির সামনের চাঁপা গাছটা মড়মড় শব্দে ভেঙে পড়ল। ছন আর গোলপাতার ছাউনি পেঁজা তুলোর মত হাওয়ায় উড়ে বেড়াতে থাকল। এলিস্ সাহেবের 'রেসট্ হাউসে'র একটি চালা উড়ে গিয়ে পড়ল গঙ্গার গর্ভে। গঙ্গার ওপর ঘন ঘন নৌকা ডুবি হতে থাকল। কাঁচা গদির ঘাটে নুলো হাজরার চালায় এক শালতি নৌকো ঝড়ের দাপটে উড়ে গিয়ে আঠার মতো আটকে গেল। খাঁড়ির ভেতরেও কয়েকটা নৌকো ডুবি হল। বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে নদীর জলও হু হু করে বাড়তে থাকল। জঙ্গলে জন্তুদের ভেতর ত্রাস সঞ্চার হল। ডোবা নৌকোর খোলের ভেতরে ঢুকে পড়ল কুমির। গাছের কুঁড়েতে আশ্রয় নিল বাঘ।

এমন দুর্যোগ সুতানুটি-কলকাতা-গোবিন্দপুরে কখনও আসেনি। একটানা তিনদিন ধরে এই প্রলয় সুতানুটি-কলকাতাকে হাতে তুলে লোফালুফি করতে থাকল।

তিনদিন চার্ণকের চোখে-ঘুম নেই। তিনদিন ধরে সাহেব সুতানুটি-কলকাতার এই সর্বনাশা পরিস্থিতি দেখে চলেছে। বাতাসে বরফের ছোঁয়া। জলে তুষারের কামড়—হিমশীতল। বাইরে চলেছে তুষার ঝড়। ছেলেবেলায় এরকম তুষারঝড় জোব অনেকবার দেখেছে। তবে সে ওইসব দেখেছে সুরক্ষিত বাড়িতে। এখানে তা নেই। বরং একেবারে বিপরীত। আশঙ্কা হচ্ছে, যে কোন মুহূর্তে ছনের চাল মাথার টুপির মতন ভাসতে ভাসতে উড়ে যেতে পারে। ঘরে অসুস্থ স্ত্রী। তার আর্ত চিৎকার। মেয়ে তিনটি নীরবে মায়ের রোগশয্যার পাশে বসে আছে। তারা জানে, তাদের মা যে-কোনও মুহূর্তে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে পারে। ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ। এক কোণের কাঠের একটি বাতিদানে জ্বলছে একটি বাতি। এই বাতিতে যা আলো হচ্ছে, তার থেকে ছায়া হচ্ছে আরও বেশি। দীর্ঘ ছায়া কাঁপছে দেওয়ালে। ছায়া দেখলে ভয় হয়।

একটির পর একটি দুঃসংবাদ এসে পৌঁছুচ্ছে। প্রথমে খবর এসে পৌঁছুল যে, হাটখোলার ঘাটে কয়েকটি নৌকো বোঝাই ছিল মালে, তারা স্রোতের টানে মাঝ দরিয়ায় ভেসে চলে গেছে। শোনা গেল, ঢাকাই কাপড় বোঝাই নৌকা আসছিল খোদ ঢাকা থেকে কাঁচাগদির খাল দিয়ে, ধর্মতলার ঘাটের কাছে ডাকাতেরা তার সবটাই লুট করে নিয়েছে। হাটখোলার গুদামে সোরা রাখবার ঘরটির চালা হঠাৎ একসময় উড়ে গেল! তৃতীয় দিনের দিন আরও খবর এল, মাদ্রাজের দিকে 'মেরি' বলে পয়েণ্টে যে জাহাজটি রওনা দিয়েছিল বন্দর সুতানুটি থেকে সেই জাহাজটি তাম্বোনী

পৌঁছে বালিতে আটকে যায় তারপর ঝড়ে সেটি ধাক্কা খায় চড়ায় এবং শেষে ফেঁসে গেছে। গোলমরিচ, মিছরি এবং সোরা ছিল জাহাজ-ভর্তি। প্রায় সব মালটাই তলিয়ে গেছে জলের নীচে। নোনা জলে জাহাজের খোল টইটম্বুর।

চার্ণক অবিচল। বাতাসে বরফের ধার। একের পর এক দুঃসংবাদ আসছে। অসুস্থ বিবি ক্ষীণ চীৎকার করে চলেছে, 'জোব, তুমি এই সর্বনাশা জায়গাটা এখনই ত্যাগ কর। এখানে আমাদের ভরাডুবি নিশ্চিত। তোমার জেদ বজায় রাখতে গিয়ে সব হারাবে।'

'ভয় নেই ডার্লিং। দুর্যোগ সারা বছর থাকে না। মনে হচ্ছে ঝড়টা থেমে গেছে। কাল সকাল নাগাদ বৃষ্টিটাও ধরে যাবে।' বিবির মাথায় ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে দিল চার্ণক। 'দুর্যোগকে কাটিয়ে তুলতে হলে ধৈর্য দরকার। ভগবান আমার সেই ধৈর্যের পরীক্ষা নিচ্ছেন।'

'দোহাই তোমাকে জোব। তোমার এই সর্বনাশা জেদ ছাড়।'

চার্ণক হাসল। মৃদু হেসে বলল 'দেখি।'

'দেখি? আমি মরে গেলে কি তুমি দেখবে?' স্ত্রীর এই কথা শুনে চার্ণক শুধু হাসল।

পরের দিন সকালবেলা মেঘ কেটে গিয়ে সত্যি সত্যিই সূর্য উঠল। দেখা দিল ঝকঝকে রোদ। বিধ্বস্ত সুতানুটিতে স্বস্তি এল। চারদিকে ভগ্নস্তূপ। মাঝে মাঝে লোকেদের হাহাকার আর কান্না। জলে-কাদায় জায়গাটা একেবারে নরক। পচা জলে গা গুলোয়।

পুজোর ঘরে স্তব পাঠ করে আহ্নিক সাঙ্গ করল বদ্রীদাস। ত্রিশূলে সিঁদুর লাগাল। নবোদিত সূর্যের দিকে তাকিয়ে নমস্কার করল। নমস্কার করে মুখ তুলতেই দেখল, একটু দূরে নিঃশব্দে এসে বসল বাতাসি। বাতাসি সচরাচর ঘোমটা দেয় না। আজও নেই। কুমারী মেয়ের মতই সে থাকে। বদ্রীদাসের সঙ্গে সে কথা বলেছে কদাচিৎ। ইদানীং বিবাহের কথা শুরু হতে সে বদ্রীদাস থেকে দূরে থাকে। মুখোমুখি কোনও কথাই হয় না। বদ্রীদাস এ ব্যবস্থা মেনে নিয়েছে। দূরে দূরেই থাকে সে।

'আমাকে কোনও কথা বলা হবে নাকি?' কথাটা আলগোছে ছুঁড়ে দিল বদ্রী।

'হ্যাঁ, আপনার কাছে একটা কথা নিবেদন করতেই আমি এসেছি। যদি অনুগ্রহ করে শোনেন।'

'কী কথা?' ব্যাকুল হল বদ্রীদাস 'শুনব বৈকি, নিশ্চয় শুনব। কী কথা শুনি।'

'আপনি কি মানসিকভাবে আমাকে বিবাহ করতে প্রস্তুত?'

'তা মায়ের যখন ইচ্ছে। না প্রস্তুত হয়ে থাকি কী করে?'

'আপনার নিজের কোনও ইচ্ছে নেই?'

'আছে। তা না হলে সম্মতি দিলাম কেন?'

'তাহলে একটি গোপন কথা বলি। এই কথাটি শোনবার পরে যদি আপনার ইচ্ছে বজায় থাকে, তা আমাকে জানান।'

'কী গোপন কথা?'

'আমি বিবাহিত।'

'বিবাহিত!' বদ্রীদাস কেমন বেকুব হয়ে গেল। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল বাতাসির মুখের দিকে। এ মেয়েটি বলে কী? পাগল নাকি?

বাতাসি কিন্তু অবিচল। আরও ধার অথচ স্পষ্ট উচ্চারণে সে জানাল, 'কেবল বিবাহিত নয়। আমি যখন ছ'বছরের মেয়ে, তখন আমার বিবাহ হয়। সেই বিবাহ আমার ভাল করে মনেও পড়ে না। বিয়ের পর আমার স্বামী আর কখনও পীরপুকুরে আমাদের কাছে যাননি। দেখা-সাক্ষাৎ হয়নি। আমার পিসিমা রেগে গিয়ে আমার মাথার সিঁদুর তুলে দিয়েছেন। তাই আমি আজও কুমারী মেয়ের মতো দেখতে। গত সপ্তাহে আমার নিরুদ্দেশ স্বামীর মৃত্যুর খবর শুনলাম। এখন আমি বিধবা। সেই ছ'বছর বয়স থেকেই বিধবা। এখন বলুন, এরপরেও কি আপনি আমাকে বিয়ে করবেন?'

বদ্রীদাস একটু থমকে গেল। বলল: 'ভাবি।'

বাতাসি ঠাকুরকে প্রণাম করে নীরবে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। দেখল, বাইরের দাওয়ায় বসে ব্রজগোপাল গুন্‌গুন্‌ করে গান গাইছে।

রৌদ্রে ঝলমল হয়ে যে-সকালটি বদ্রীদাসের কাছে নিষ্কলুষ প্রসন্নতায় ধরা দিয়েছিল, মুহূর্তে সে সকাল কেমন যেন ঘোলাটে হয়ে গেল। তার মাথা ঝিম্‌ঝিম্‌ করছে। বদ্রী বুঝতে পারছে না, ঠিক এই মুহূর্তে তার কী করা উচিত। এমন জটিল সমস্যায় কখনও সে পড়েনি। অনাথা বাতাসিকে সে দয়া করে বিয়ে করতে রাজি হয়েছিল। নইলে তার কি কোনও পাত্রীর অভাব আছে? ঘটকের সঙ্গে যোগাযোগ করলে এখনই এক ঝুড়ি পাত্রীর সন্ধান পাওয়া যায়। তা বদ্রী কি তাই করবে? বিবাহে যখন সে মতি স্থির করেছে, তখন বিবাহ তাকে করতেই হবে। যথাসময়েই সে বিয়ে করবে। কেবল পাত্রী বদল হবে, এই যা।

কিন্তু কী আশ্চর্য, পাত্রী বদলের সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরেও মন শান্ত হয় কই? তাহলে বদ্রী কি ভেতরে ভেতরে ভালবাসে বাতাসিকে? বাতাসির রূপ-যৌবন তাকে কি বশ করেছে? প্রথম দর্শন থেকেই কি সে বাতাসির রূপে মুগ্ধ? বাতাসিকে মায়ের কাছে সমর্পণ করেই কি সে বলতে চেয়েছিল, 'মা, এই তোমার দাসী এনেছি।' নিজের মনকে এইভাবে কয়েকটি প্রশ্ন করবার পরেই বেচারি বদ্রী বড় সংকোচে পড়ল। বাতাসি বিবাহিতা, বাতাসি বিধবা। একটি বিধবা মেয়েকে বিবাহ করে

সে কি নিজের বংশকে কলঙ্কিত করবে? হয়ত ব্যাপারটা গোপনেই সারা যাবে। কিন্তু গোপনে করলেও সেটা পাপ। এ পাপ কাজ করা কি ঠিক হবে।

বদ্রীদাস বড় দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে গেল। বাতাসিকে ছেড়ে দিতে পারছে না। অথচ গ্রহণ করতে গেলেও অজস্র বাধা। বড় জটিল অবস্থা। বড় দ্বন্দ্ব।

বাড়ি তৈরির কাজ প্রায় শেষ। জঙ্গলের ভেতর খাড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে ভারি আর ঝকঝকে একটি বাড়ি। বাড়ি তৈরির ব্যাপারে দাক্ষায়নীর ঘোর বিরোধিতা ছিল। বিধবার ছেলে বদ্রীদাস। গরীব। এই এতটুকু ছেলে কোলে নিয়ে রাঢ় হয়েছেন তিনি। তিনি এসব আদিখ্যেতা পছন্দ করেন না। টাকা-পয়সা নিয়ে বড়লোকি দেখানোতে তাঁর ঘোরতর অপছন্দ। মানসিকতার জন্যেই ছিল তাঁর আপত্তি নইলে আপত্তি কিসের? এখন বাড়িটিকে দেখে তিনিই বাড়ির প্রেমে পড়ে গেছেন। এখন মনে হচ্ছে, এরকম একটি বাড়ির বাসনা দীর্ঘদিন ধরে তাঁর মনের গহনে স্বপ্ন হয়ে লুকিয়েছিল। ছেলেকে এখন তিনি দু'হাত তুলে আশীর্বাদ করছেন। ইতিমধ্যে কুল পুরোহিত এসেছেন কালীঘাট থেকে। পাঁজিপুঁথি দেখে তিনি ছেলের বিয়ের দিনও দেখে দিয়ে গেছেন। মাঘ মাসের প্রথমেই দিন ধরা হয়েছে। সুতরাং সেই বিয়ের জোগাড়-যন্তরের হ্যাপাও সামলাতে হচ্ছে দাক্ষায়নীকে। এদিকে ব্রজগোপালের মন অস্থির হয়ে উঠেছে। সেই বর্ষার আগে সে সুতানুটিতে এসেছে। এখনও বেচারি সুতানুটির বাঁধন ছিঁড়ে বের হতে পারল না। দাক্ষায়নী তাকে আটকে দিয়েছেন, বিয়ের পর্ব না মেটা পর্যন্ত ব্রজকে তিনি ছাড়তে রাজি নন।

ঘরের ভেতর চৌকিতে শুয়েছিলেন দাক্ষায়নী। গায়ে চাদর টানা। জানালা দিয়ে এক ফালি রোদ্দুর এসে পড়েছে পায়ের ওপর। পোষা বেড়ালের মতো। রোদ্দুরটুকু গুটিয়ে রয়েছে পায়ের ওপর। দাক্ষায়নী ওর ওম্ নিচ্ছেন। পাতলা একটু ঘুম জড়িয়ে রয়েছে চোখে। ভারি আরাম লাগছে দাক্ষায়নীর।

'মা, আমার একটা কথা তোমাকে রাখতে হবে। সে কথাটাই বলতে এসেছি।' বদ্রী কাঁচুমাচু হয়ে দাঁড়াল।

'কী কথা! তা তোর কথা না রাখবার কী আছে?'

'আমার বিয়েটা তুমি পিছিয়ে দাও অন্ততঃ দু'মাস। আমি এখনও ঠিক মনস্থির করতে পারিনি।'

দাক্ষায়নী উঠে বসলেন চৌকির ওপর। রুক্ষ স্বরে বললেন, 'বিয়ে পিছনো হবে কেন? কী এমন কারণ ঘটল যে, বিয়ে পিছুতে হবে? আর রাখ তোর মনস্থিরতা।'

'কারণটা তোমাকে বলা যাবে না, মা! আমার একটাই অনুরোধ বৈশাখের আগে বিয়ের দিন স্থির কোর না। কথা শেষ করে বদ্রী আর দাঁড়াল না। যেমন এসেছিল, তেমনি চলে গেল। দাক্ষায়নী কিন্তু ছাড়বার পাত্র নন। তিনি ঝঙ্কার

৮

দিয়ে উঠলেন, 'হ্যারে, অ হতভাগা, তোকে এসব কুবুদ্ধি কে দিচ্ছে বল তো। আমি তাকে ছাড়ব না, সেই কোটনার ঘাড় ভাঙব।'

পুত্র বদ্রীকে দাক্ষায়নী ধরতে পারলেন না। বদ্রী বাড়ি থেকে বেরিয়ে ধীর পায়ে চলে গেল কোম্পানির সেরেস্তায়। তার এই নীরব প্রস্থান দাক্ষায়নীকে আরও ক্ষেপিয়ে তুলল। তিনি তীরবিদ্ধ পশুর মতো গজরাতে থাকলেন। চিৎকার করে বলতে থাকলেন, 'ব্যাটার আমার দেমাক হয়েছে! গুমোর! কেবল দেমাক নয়, টাকার দেমাক নয়, টাকার গরমও হয়েছে। এই গরমে নিজের মাকেও পুঁচছে না।' বুড়ি দৌড়ে গেলেন ব্রজগোপালের কাছে। বললেন, 'হ্যারে ব্রজ, হতভাগাটার মতিভ্রমের কোনও কারণ জানিস্?'

ব্রজগোপাল বলল, 'কই, তেমন তো কিছু শুনিনি! রাধাগোবিন্দ ওকে নিয়ে কী খেলা খেলাচ্ছে কে জানে।'

দাক্ষায়নী হয়ত বাতাসিকেও কিছু জিজ্ঞাসা করতেন। কিন্তু বাতাসির কঠিন-শীতল মুখের দিকে তাকিয়ে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করতে ভরসা পেলেন না। ব্রজগোপালের সামনেই ধপ করে বসে পড়লেন। বললেন, 'ব্রজ, এই হতভাগার সংসারে আমি একদিনের তরেও আর থাকতে চাই না। তুই আমাকে কাশী-মথুরা-বৃন্দাবন যেখানে খুশি নিয়ে চ। আমি তোর সঙ্গে যাব।'

'তা মন্দ বলোনি গো মা, তোমাকে নিয়ে যেতে পারলে আমার ভারি সুখ হবে। তবে একটা সমস্যা আছে। তোমাকে যত্ন করবে কে? বাতাসি তো আর তোমার সঙ্গে যাবে না। আমাকে একটা বৈষ্ণবী জোগাড় করতে হবে। মালা বদল করে একটা বৈষ্ণবী জোগাড় করে আনি। তারপর একসময় এসে তোমাকে নিয়ে যাব।

দাক্ষায়নী কোনও রা কাড়লেন না। ধীরে ধীরে উঠে গিয়ে নিজের চৌকিতে শুয়ে পড়লেন। অনেক রাতে বদ্রী ফিরল, দাক্ষায়নী ফিরেও তাকালেন না। গোটা বাড়িটা থমথম করতে থাকল। একটি ভয়ংকর নীরবতা গ্রাস করল বাড়িটাকে। কয়েক ঘণ্টা আগেও যে বাড়িটা আসন্ন একটা বিবাহ-উৎসবে উদ্‌বেল হয়েছিল, সে বাড়িতে শ্মশানের স্তব্ধতা নেমে এল। দাক্ষায়নী রাতে সামান্য একটু মুড়ি খেতেন। খেতেন এক বাটি দুধ। না মুড়ি না দুধ—কোনটাকেই তিনি স্পর্শ করলেন না। বদ্রীদাস সেরেস্তা থেকে ফিরে এসে খেতে বসল বটে, কিন্তু সে খেতে বসাই, কোনও খাবার তার গলা দিয়ে নামল না। বাতাসির খবর কেউ রাখে না, সুতরাং সে খেল কিনা জানা গেল না।

ব্রজগোপালই কেবলই খেল। যেমন রোজ খায়, তেমনি খেল। তার কোনও বিকার দেখা গেল না। খাওয়ার পর দাওয়ায় বসে গান ধরল 'কমলিনী কোমল কলেবর, তুঁহু সে ভখিল মধুকর।'

পরের দিনের সকালটাও হল ঝক্‌ঝকে রোদ্দুরের ভেতর দিয়ে। গত কয়েক দিন

ঘরে যে ভয়ঙ্কর দুর্যোগ গেছে, তা আকাশের দিকে তাকিয়ে বোঝা যায় না। আকাশ মেঘমুক্ত। নির্মল সুন্দর আকাশ। দাক্ষায়নী গত রাতে ভাল করে ঘুমোতে পারেননি। এখনও তাঁর মন ভার। বিছানার উপরে উঠে বসলেন। মুখের ভেতরটা তেতো-তেতো।

'মা, আমি আসি গো!' একগাল হেসে ব্রজগোপাল এসে দাঁড়াল দাক্ষায়নীর দরজার সামনে। কিন্তু কিন্তু হয়ে বলল, 'অনেকদিন আটকা পড়ে আছি। এবার আমি আসি মা। তবে কথা দিচ্ছি, বদ্রীদাসের বিয়ের আগেই আবার এসে হাজির হয়ে যাব। তুমি আমাকে যাবার জন্য অনুমতি দাও গো মা!'

দাক্ষায়নী ক্ষীণ হেসে অনুমতি দিলেন। বললেন, 'যতদিন এ বুড়িটা বেঁচে থাকে, একবার করে এসে দেখে যাস্।'

দাক্ষায়নীকে প্রণাম করে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে এল ব্রজগোপল। বদ্রীদাদার সঙ্গে সে ইচ্ছে করেই দেখা করল না। দাদা এখন পুজোর ঘরে। গম্‌গমে গলায় দাদা দরাজ মনে মন্ত্র পড়ছেন। এ মন্ত্রের স্বর বাড়ি পাছ দুয়ার থেকে শোনা যায়। বাতাসির কাছ থেকে বিদায় নেবার ইচ্ছে ছিল ব্রজগোপালের। কিন্তু কোথায় যেন সে লুকিয়ে বসে আছে। দেখা হল না।

বাইরে বেরিয়েই বোঝা গেল শীত পড়েছে। বাতাস তো নয়, যেন বরফের ছুরি। পোশাক ভেদ করে ভেতর পর্যন্ত অবাধে এ ছুরি ঢুকে যায়। তিনদিনের দুর্যোগে সুতানুটি যে কতখানি বিধ্বস্ত, তা পথে না বের হলে টের পাওয়া যেত না। অনেক গাছপালা গোড়া উপড়ে পড়ে আছে। যে সব গাছ খাড়া আছে, তাদের ডালপালা ভাঙা। ঝড়ে অনেক পাখি মরেছে। একটা বেড়াল মরে গিয়ে ফুলে ফেঁপে ঢোল হয়ে রাস্তার পাশে পড়ে রয়েছে। হাটের চালাঘরগুলিও ছিন্নভিন্ন। গাছের উঁচুতে কোম্পনির একটা নিশান টাঙানো ছিল। সেটা ছিঁড়ে ফর্দাফাই। চারদিক ঘিরে কেমন যেন পচা গন্ধ। ব্রজগোপাল দ্রুত পা চালাল নদীর খেয়া ঘাটের দিকে। তার বড় তাড়া।

'অ গোঁসাই ঠাকুর! দাঁড়াও গো! আমি কি তোমার সঙ্গে অত জোরে হাঁটতে পারি।'

পরিচিত স্বর।

পরিচিত গলার স্বর পেয়ে ফিরে দাঁড়াল ব্রজ। সে যেন নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না। সবিস্ময়ে বলল, 'একি, রাইকিশোরী, তুমি! তোমাকে এখানে কে পাঠালে? নিশ্চয় আমার মা বলেছে, যা বাতাসি, আমার ছেলেটাকে ডেকে নিয়ে আয়? কী জানি, মায়ের মনে কিসের আবার ঢেউ জাগল!'

ঠোঁট ওলটালো বাতাসি। বলল: 'তোমার রাইকিশোরীকে কেউ পাঠায়নি। সে নিজেই এসেছে। তুমি তো ডাকলে না, তাই সে নিজেই চলে এল!'

ব্রজগোপালের মনে ধন্দ।—'কোথায় যাবে গো তুমি?'—সে ফিসফিসিয়ে

জিজ্ঞাসা করল।

'কোথায় আবার। তোমার সঙ্গে। তুমি আমাকে যেখানে নিয়ে যাবে, সেখানে। এক গোঁসাইকে হারিয়েছি বলে, এ গোঁসাইকে হারাতে এবার আমি রাজি নই। এই দেখ মালা নিয়ে এসেছি। তোমার সঙ্গে মালা বদল করে বোষ্টুমি হব।' এই বলে কোনও উত্তরের অপেক্ষা না রেখে ঝপ করে মালাটি বাতাসি পরিয়ে দিল ব্রজর গলায়। বাতাসির চোখে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল এক স্বর্গীয় বিভা। ব্রজর চোখে চিকচিক করে উঠল জল। সে মালাটি ঘুরিয়ে পরিয়ে দিল বাতাসির গলায়। 'কী খুশি তো?'

দু'জনে গিয়ে উঠে বসল একটি নৌকোয়। ছোট্ট সালতি নৌকোয়। সে নৌকোয় আর কেউ না, কেবল দুজন। গঙ্গার জলে সকালের রোদ্দুর ঝলসাচ্ছে। দু'জনের মুখে ভারি এক পরিতৃপ্তির আনন্দ। নতুন আলোর ঝলসানি। ঢেউয়ে ঢেউয়ে নৌকো ভাসতে ভাসতে সুতানুটির ঘাট ছেড়ে পশ্চিমে চলল। হঠাৎ বিকট আওয়াজ করে সকলকে চমকে দিয়ে বেজে উঠল জাহাজের ভোঁ। বাতাসি দেখল, সেই বিরাট জাহাজটা। এই জাহাজটাকেই যেন পীরপুকুর থেকে আসবার দিন দেখেছিল। জাহাজ না তিনমহলা বাড়ি। জাহাজের ছাদে পা-জামা কামিজ-পরা এক সাহেব। সেই সাহেব? লম্বা একটা চোঙা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সাহেব কী যেন দেখছে। ব্রজ বলল, 'ও সাহেবটাকে চেন নাকি?' বাতাসি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল সাহেবটাকে। দেখে ঠোঁট ওলটাল।

'না।'

'ওর নাম জোব চার্ণক। পাগলা সাহেব। কাল রাত্তিরে ঐ সাহেবের বিবি মারা গেছে। শেষ রাতে গোর দিয়ে সকালেই জাহাজে চলে এসেছে। এখন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ওই নল দিয়ে সুতানুটির ক্ষয়ক্ষতি দেখছে। লোকটা এই সুতানুটিকে বেজায় ভালোবেসে ফেলেছে। কীরকম পাগল বোঝ।'

বাতাসি কৌতুক করে বলল, 'হ্যাঁ অনেকটা আমার মতন।' মিষ্টি হাসল।

বাতাস তো নয়, বরফের ছুরি, নদীর ওপরে ঠান্ডা বড় বেশি হাড়ভেদী। চাদরটা গায়ে ভাল করে জড়িয়ে নিল বাতাসি। এই মুহূর্তে বাতাসিকে ঠিক কিশোরী বলা যায় না। বরং তার চোখে যৌবনের ঝলকানিটাই বেশি। চোখে যৌবনের ভাষা নিবিড় হয়ে ফুটে উঠেছে। ব্রজগোপাল নৌকোর ওপর একটু নড়ে চড়ে বসল। গায়ে জড়ানো চাদরটা বরং সে একটু আলগা করল। জড়াল না। চোখে লাগছে রোদ্দুরের ঝলসানি। মনটা বড় চঞ্চল হয়ে উঠল। কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে ব্রজগোপাল গান ধরল গুন্‌গুন্‌ করে।

শুন গো মরম্‌ সই!
যখন আমার জনম হইল
নয়ন মুদিয়া রই।

সমাপ্ত